অন্যায়ের নয় উদারতায়

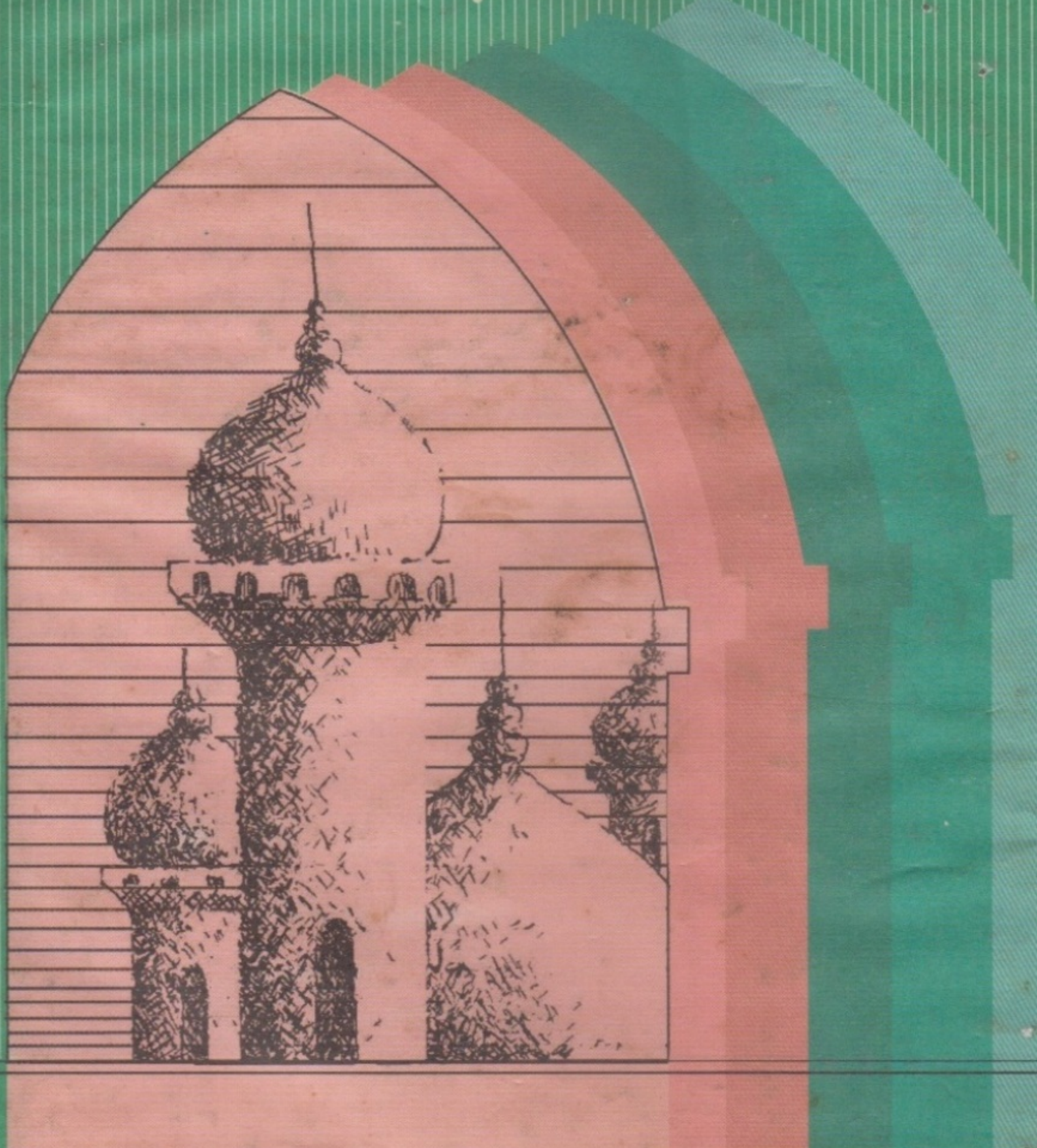

www.nagorikpathagar.org

তলোয়ারে নয় উদারতায়

মাওলানা আবদুল জলিল মাযাহেরী (রঃ)

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

মোঃ আবদুল হামিদ ও মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চতুর্থ মুদ্রণ
অক্টোবর, ১৯৯৬ ইং

হাদিয়াঃ ১০৫·০০ টাকা মাত্র

এমদাদিয়া প্রেস, ৫/১ নং গিরদে উর্দু রোড, ঢাকা হইতে
এম, এ, হামিদ কর্তৃক মুদ্রিত

www.nagorikpathagar.org

পূর্বাভাষ

মুসলমানদিগকে নিজেদের ও ইসলাম ধর্মের নিরাপত্তার জন্য বহু যুদ্ধাভিযান করিতে হইয়াছে এবং প্রায় সর্বত্রই তাঁহাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসরে তাঁহারা ভূ-পৃষ্ঠে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই কারণে অনেকেই এরূপ ধারণা করিয়া থাকে যে, মুসলমানদের তলোয়ারের ভয়েই লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামের প্রচার ও প্রসার নিজস্ব সৌন্দর্যের দ্বারাই হইয়াছে—বল প্রয়োগে নহে। উল্লিখিত অলীক ধারণার মূলে রহিয়াছে—ইসলামী ধর্ম-যুদ্ধের মৌলিক বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ইসলাম প্রচারের উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রচুরতা।

মুসলমানদের ইতিহাসের ভিতরেই ইসলাম-প্রচারের মূল উপাদান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের এই দিকটা পৃথকভাবে আলোচিত হইলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক হইবে—সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস, ইসলাম প্রচারের মৌলিক উপকরণসমূহ জ্ঞাত না হইলে ইসলামী ইতিহাস শিক্ষা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

হাই স্কুল, হাই মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাহাতে এই পুস্তক পাঠে ইসলামের সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে, পুস্তকটি তদুপযোগী করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যাহাতে ছেলেদের ইতিহাস-জ্ঞানের মূলভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া তাহাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষমতা জন্মে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। অমুসলিম প্রতিবেশীদের মনে ইসলামী শাসন, ইসলামী ধর্ম-যুদ্ধ, জিযিয়া-কর ইত্যাদি সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ও অযথা আতঙ্ক রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত করার মত যথেষ্ট উপকরণ অত্র পুস্তকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। পুস্তককে ঘটনাবহুল করিতে আদৌ চেষ্টা করি নাই; তত্ত্বানুসন্ধানই ইহার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যাঁহারা ইহা গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পাঠ করিবেন, তাঁহাদের মনঃপূত হওয়ার আশাই বেশী করিয়া করিতে পারি।

এই পুস্তক কোন গ্রন্থবিশেষের হুবহু অনুবাদ নহে। ইহার বিষয়বস্তু হাদীস, তফসীর, তাওয়ারিখ ইত্যাদি বহু আরবী, পারসী ও উরদু কিতাবাদি হইতে আহরণ করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোহ্তামেম মাওলানা হাবিবুর রহমান মরহুম কৃত উরদু 'এশাআতে-ইসলাম' ইহার মূল উৎস। সাময়িক রুচির খাতিরে অনেক নূতন গবেষণামূলক আলোচনা সংযোজিত করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু পুস্তকের সর্বত্র 'এশাআতে-ইসলাম' প্রণেতার বর্ণনা পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

পুস্তক প্রনয়ণ ও মুদ্রনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শোক্‌রিয়া জানাইতেছি। এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে আমাদের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় নাই, তাহা বলা চলে না। আশা করি, পাঠকবর্গ আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন এবং পুস্তকের উন্নতি ও নগণ্য লেখকের উৎসাহ বর্ধনের জন্য ভুল সংশোধনার্থ পরামর্শ দানে উপকৃত করিবেন। বারান্তরে তৎপ্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখা হইবে। শিক্ষানবীশ মহলে এই ক্ষুদ্র দান সমাদৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। আল্লাহ্ এই পুস্তকের ওসিলায় আমাদের সকলকে নাজাত দিন।

বিনীত ঃ

গ্রন্থকার

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পা... ...িক গ্রন্থাগার
...মা... ...িনতে মুজাহিদ

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

উপক্রমণিকা

ইসলামী জেহাদ — ৪
জেহাদের কতিপয় ধারা — ৬
জেহাদ শান্তির উপকরণ—অশান্তির নহে — ৬
জিযিয়া কর — ৯
জিযিয়ার কতিপয় ধারা — ৯
'মোরতাদ'-এর প্রতি ব্যবস্থা — ১০
ইসলাম প্রচারের মৌলিক উপকরণ — ১২

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের সূচনা পর্ব ১৩
রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রথম প্রচার-জীবন — ১৩
অন্ধকার যুগের মক্কা ও কুরাইশ বংশ ১৩
হযরত (দঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও প্রাথমিক প্রচার — ১৬
সর্বপ্রথম মুসলমান—হযরত খাদিজা (রাঃ) — ১৭
কতিপয় সূক্ষ্মতত্ত্ব — ১৯
মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার — ২১
হাবশা রাজ্যে হিজরত — ২২
কতিপয় সূক্ষ্মতত্ত্ব — ২৫
হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ — ২৮
কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্ব ৩০
হযরত হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ — ৩৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

মদীনায় ইসলাম — ৩৫
মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার — ৩৫
মদীনার দুই সরদারের ইসলাম গ্রহণ — ৩৫
মদীনাবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস — ৩৮
ইহুদী সম্প্রদায় — ৩৮
কওমে সাবা — ৩৯
আওস ও খাযরাজ — ৪০
ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ সংজ্ঞা — ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

সত্যের সাক্ষ্য — ৪৪

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিজরতের পরে	৪৪
আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ	৪৫
কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্ব	৪৭
নবুওয়ত সম্বন্ধে সাক্ষ্য	৪৮
আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম	৪৮
কা'ব আহ্বার	৪৮
আবু আমের রাহেব	৪৯
হযরত হান্যালা (রাঃ)	৫১
তওরাত কিতাবে শেষ নবীর উল্লেখ	৫১
ইন্জীল কিতাবে শেষ নবীর উল্লেখ	৫২
সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	৫৪
কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়	৫৭
খৃষ্টান ধর্মের অবস্থা	৫৭
মো'জেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা	৫৮
মো'জেযা সম্পর্কে যুক্তিতর্ক	৫৮
চতুর্থ অধ্যায়	
সাফল্য ও অগ্রযাত্রা	৬১
বদরের যুদ্ধ ও ফেরেশ্তার সাহায্য	৬১
হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	৬৩
সোলহে হোদায়বিয়াহ্	৬৫
কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়	৬৭
মুনাফেক দলের কু-কীর্তি	৬৯
উদারতার সুফল	৭১
দ্বীন ইসলামের জন্য অপূর্ব আত্মত্যাগ	৭২
কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয়	৭৪
পঞ্চম অধ্যায়	
সমকালীন শাসকবর্গের নামে পত্র	৭৬
রোম সম্রাটের নিকট পত্র	৭৭
কায়সর ও আবুসুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর	৭৯
পয়গম্বরগণের প্রতিকৃতি	৮০
এক পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যুবরণ	৮১
হাবশী রাজ 'নাজ্জাশী'র নিকট পত্র	৮১
পারস্য রাজ 'কেসরার' নিকট পত্র	৮২
বাহ্রাইনের শাসনকর্তার নিকট পত্র	৮৪
মিসর রাজ মুকাওকাসের নিকট পত্র	৮৪
গাস্সান রাজ হারেসের নিকট পত্র	৮৪
বুসরায় পত্র ও মূতা যুদ্ধ	৮৫

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মহান বিজয় পর্ব	৯১
তিন বন্ধুর ইসলাম গ্রহণ	৯১
মক্কা বিজয় ও ক্ষমার ঘোষণা	৯৪
হারেস-পুত্র আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	৯৮
হরব-পুত্র আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	৯৯
ইকরিমা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	১০৪
সাফওয়ান ইব্‌নে উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ	১০৫
ওয়াহ্‌শীর ইসলাম গ্রহণ	১০৫
হেন্দা বিনতে-ওতবার ইসলাম গ্রহণ	১০৬
মক্কা বিজয় পরিশিষ্ট	১১০
কা'বা শরীফ পবিত্রকরণ	১১০
ওয্‌যা প্রতিমা ধ্বংস	১১১
সুওয়া' দেবতা বিনাশ ও পূজারীর ইসলাম গ্রহণ	১১১
মনাত দেবীর পরিণাম	১১২
প্রতিমা ধ্বংসের সূক্ষ্মতত্ত্ব	১১২
হযরত খালেদ ও বনী খুযায়মা	১১৩
একটি সমস্যা ও উহার সমাধান	১১৫
সপ্তম অধ্যায়	
'সানাতুল-ওফুদ'	১১৭
বনী তামীমের প্রতিনিধিদল	১১৭
বনী আসাদের প্রতিনিধিদল	১২০
নাজরানবাসী নাসারা প্রতিনিধিদল	১২১
হামদানের প্রতিনিধিদল	১২৫
বনী ত্বাই প্রতিনিধিদল ও আদি ইব্‌নে হাতেম	১২৬
বনী আমের প্রতিনিধিদল	১২৮
ফারওয়া প্রতিনিধি	১২৯
বনী সা'দের প্রতিনিধিদল	১৩০
বনী-হানীফা ও মোসায়লামা কায্‌যাব	১৩২
অষ্টম অধ্যায়	
অপূর্ব আত্মত্যাগ	১৩৬
তবুক যুদ্ধে সাহাবাগণের আত্মোৎসর্গের নমুনা	১৩৬
প্রত্যুৎপন্নমতি	১৩৬
দীর্ঘসূত্র	১৩৮
আবু যর গেফারী (রাঃ)	১৩৮
আবু খায়সামা (রাঃ)	১৪০
কা'ব ইব্‌নে মালেক (রাঃ)-এর তওবা	১৪০

www.nagorikpathagar.org

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনাফেক দল ও মসজিদে যেরার	১৪২
নবম অধ্যায়	
খেলাফত ও ফেৎনা প্রতিরোধ	১৪৮
হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত প্রাপ্তি	১৪৮
নবুওয়ত ও বাদশাহত	১৪৮
খলীফায়ে রাশেদের কর্মধারার নমুনা	১৫১
আর একটি উপমা	১৫৩
ফেৎনায়ে এর্তেদাদ ও ভণ্ড নবীদের পরিণাম	১৫৩
মুসায়লামা কায্যাব	১৫৩
আরব ললনা সাজার নবুওয়ত দাবী এবং পরে ইসলাম গ্রহণ	১৫৫
তোলায়হা আসাদী	১৫৬
বাহরাইনবাসীদের 'এর্তেদাদ' এবং মুসলমানদের প্রতি গায়েবী মদদ	১৫৬
মালেক ইব্নে নবিরার এর্তেদাদ	১৫৯
এর্তেদাদের কারণসমূহ	১৫৯
দশম অধ্যায়	
ইসলামের প্রচার, বিজয়াভিযান ও গায়েবী মদদ	১৬২
উসামা (রাঃ)-এর যুদ্ধযাত্রা	১৬২
কতিপয় রহস্য উদ্ধার	১৬৩
সাহাবাগণের প্রচারাভিযান	১৬৪
দারবুন বিজয় এবং সাগর শুষ্ক হওয়ার অলৌকিক ঘটনা	১৬৫
হযরত খালেদ (রাঃ)-এর ইরাক প্রবেশ	১৬৭
সন্ধি-সূত্রে হিরা বিজয়	১৬৭
আজনাদীনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা	১৬৯
ইয়ারমুক যুদ্ধে জর্জার ইসলাম গ্রহণ	১৭০
দজলা নদী পার হওয়ার অলৌকিক ঘটনা এবং মাদায়েন বিজয়	১৭২
লোভহীনতার অপূর্ব আদর্শ	১৭৫
সারদিনিয়া বিজয় ও মুসলমানদের বিপদ	১৭৭
রোম সম্রাটের পত্র	১৭৮
কায়রোওয়ান শহরের পত্তন ও হাজার হাজার লোকের ইসলাম গ্রহণ	১৮০
'মা-উল ফারাস' বা অশ্ব-নির্ঝরিণী	১৮২
'ইয়াওমুল আবাকের' বা গো-দিবস	১৮২
উস্তুনে হান্নানা	১৮৪
মো'জেযা সম্পর্কে সূক্ষ্মতত্ত্ব	১৮৬
মুসলিম বাহিনী কর্তৃক হেমস শহর অবরোধ	১৮৬

— ■ —

www.nagorikpathagar.org

بسم الله الرحمن الرحيم ○

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ○

তলোয়ারে নয় উদারতায়

■

উপক্রমণিকা

ইসলাম ধর্ম আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে যে রকম দ্রুতগতিতে দুনিয়ার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অন্য কোন ধর্মেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। ইসলামের প্রসার ও পরিব্যাপ্তির দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শাখা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, একটি ধর্ম প্রচার, অপরটি রাজ্য বিস্তার। এতদুভয়ের সমন্বয়ের প্রতি দৃকপাত করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ের অবধি থাকে না এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ইসলামের সত্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। মুসলমানদের রাজ্য জয়ের প্রতি যখন লক্ষ্য করি তখন দেখিতে পাই যে, মাত্র কয়েক বৎসরের ভিতর ইহা পর্বতগাত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নিম্ন-ভূমিতে প্রবাহিত জলস্রোতের মত দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। ধর্মপ্রচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও মনে হয়, যেন ইহা উষার নবোদিত দিবাকরের তরুণ আলোর মতই পলকের মধ্যে দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে।

বস্তুতঃ রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচার দুইটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কিন্তু অনেকে অজ্ঞতার দরুন অথবা অন্যায় যিদের বশে দুইটি স্বতন্ত্র জিনিসকে এক পর্যায়ে রাখিয়া ইসলাম প্রচারকে মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারের ফল বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের দাবী—ইসলাম নিজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণী শক্তি দ্বারা লোকদিগকে নিজের দিকে টানিয়া আনে নাই; বরং লোকেরা তলোয়ারের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণের মায়ায় ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে; পরে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে এই নূতন ধর্ম তাহাদের মনঃপূত ও গা-সহা হইয়া গিয়াছে।

আমরা এই পুস্তকে প্রমাণাদিসহ সুস্পষ্টভাবে দেখাইতে প্রয়াস পাইব যে, তাহাদের এই ধারণা ও দাবী সম্পূর্ণ অমূলক। জগতে ইসলাম ধর্ম প্রচার তলোয়ারের দ্বারাও হয় নাই, অন্য কোন প্রকার ভয় প্রদর্শনেও হয় নাই। অমানিশির ঘনান্ধকারে যেমন পতঙ্গরাজি কোন অজানিত টানে প্রজ্বলিত দীপালোকের দিকে ছুটিয়া আসে, তেমনি সত্য-সনাতন ইসলামের জ্যোতিঃ ও উদারতা ধর্মান্বেষী মানব মাত্রেরই প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অবশ্য একথা সত্য যে, ঘটনাচক্রের আবর্তনে মুসলমানগণকে বহু যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ আক্রমণমূলক ছিল, কি আত্মরক্ষামূলক ছিল, সে কথার বিচার করা

www.nagorikpathagar.org

এখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহা স্থিরনিশ্চিত যে, কাহাকেও বলপূর্বক মুসলমান করা এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না। মুসলমানগণ কার্যতঃ কোন স্থলে যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, অথবা অন্য কোথাও হউক, এমন আচরণ প্রকাশ করে নাই। যাহাতে ইসলাম প্রচারে বলপ্রয়োগের আভাষ মাত্রও পাওয়া যাইবে।

আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত দাবী করিতেছি যে, ইসলামের মূলনীতিসমূহের নিজস্ব সৌন্দর্যই ইসলাম প্রচারের প্রকৃত সহায়। ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ, ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর আচরণ ও প্রচার আদর্শ, মুসলমানদের চরিত্রমাধুর্য ও মহানুভবতা প্রভৃতি আলোচনা করিলে আমাদের দাবীর বাস্তবতা দিবাকর সম-সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ইসলামী শরীঅতে কাহাকেও বলপ্রয়োগে মুসলমান করার প্রতি কঠিন নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান আছে। কোরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ج

"ধর্ম সম্পর্কে (ইসলাম গ্রহণে) বলপ্রয়োগের বিধান নাই; যেহেতু সুপথ কুপথ হইতে পৃথক হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" (সূরা-বাকারাঃ রুকূ ৩৪) সুতরাং সকলেই নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সহজে সুপথ চিনিয়া লইতে পারিবে। অতএব, বলপ্রয়োগের কি আবশ্যক?

আর এক স্থলে আছেঃ

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

"মুহাম্মদ (দঃ)! তুমি কি লোকদের ধার্মিক হওয়ার জন্য তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিবে?" অর্থাৎ, এরূপ করা কখনও বিধেয় নহে। —সূরা-ইউনুসঃ রুকূ ১০

একথা জ্বলন্ত সত্য যে, মুসলমানগণ কোরআনের এই আদেশ সর্বত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছে। তাহারা আরবের বাহিরে পদার্পণ পূর্বক পারস্য, সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন ও শক্তিশালী রাজ্যগুলিকে অত্যল্প কালের মধ্যে পদানত করত এই সমস্ত রাজ্যে ইসলামের বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিল; কিন্তু বিজয় গর্বে গর্বিত হইয়া কোন সময়েই কাহাকেও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা তাহারা করে নাই। এমন কি তাহারা কাহাকেও কোন প্রকার লোভ-লালসায় বশীভূত করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছে—এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ধর্ম প্রচার ব্যাপারে মুসলমান বাদশাহগণ পর্যন্ত এমন উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, যদ্দৃষ্টে সকলেই একথা বুঝিতে পারিবেন যে, ইসলাম প্রচারের পশ্চাতে সামান্য প্রলোভনও বিদ্যমান ছিল না। খলীফা ও বাদশাহ্গণের রাজত্বকালে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং নক্ষত্রোপাসকগণ নির্বিবাদে ও নির্ভয়ে নিজেদের ধর্মকর্ম সমাধা করিত—ইহাতে কোন প্রকার বাধাবিঘ্নই ছিল না। বিধর্মীদের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদের অনুরূপই ছিল। মুসলমানদের ধন-প্রাণের যে রকম মূল্য ছিল, বিধর্মী প্রজাদের ধন-প্রাণের মূল্যও তদপেক্ষা কম বিবেচিত হইত না। বিধর্মী প্রজার প্রাণনাশে দণ্ডস্বরূপ মুসলমানের প্রাণদণ্ড হওয়া ইসলামী ধর্মগ্রন্থেরই আদেশ।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ও বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত এবং বর্তমান সময়েও হইতেছে, এ রকম যদি ইসলাম প্রচার ব্যাপারে করা হইত, তবে মুসলিম রাজ্যসমূহে কোন বিধর্মীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। স্পেন রাজ্যের কথা ভাবিয়া দেখুন,

www.nagorikpathagar.org

সেখানে কোটি কোটি মুসলমানের বাস ছিল এবং তথায় আট শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী পতাকা উড্ডীয়মান ছিল; কিন্তু কখনও মুসলমানগণ বিধর্মীদের অস্তিত্ব বিলোপ করার সামান্য চেষ্টাও সেখানে করে নাই। ইসলামী রাজত্ব অবসানের সঙ্গেসঙ্গে এই সুবিস্তৃত রাজ্য হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। এক স্পেনের কথাই বা বলি কেন সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি রাজ্যেও যদি মুসলমানগণ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিত, তবে এই সমস্ত দেশে ভিন্ন ধর্মের নামগন্ধ পর্যন্ত বাকি থাকিতে পারিত না। তদানীন্তন ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীও স্বীয় বক্ষে অষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম রাজ-সিংহাসন ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল, অথচ এখানেও সর্বদা অমুসলমানের সংখ্যা অধিক রহিয়াছে। একবার স্থির মস্তিষ্ক ও সুস্থ মনে চিন্তা করিয়া বলুন, রাজধানী হইতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের পূর্ব-সীমান্তে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হইতে পারিয়াছিল। যদি রাজধানীর ভিতরে ধর্মান্তর করণের উদ্দেশ্যে সামান্য মাত্রও চাপ দেওয়া হইত এবং তৎসঙ্গে বিবিধ রকমের প্রলোভন দ্রব্যেরও সমাবেশ করা হইত, তবে সেখানে কোনও অমুসলমানের অস্তিত্ব থাকিতে পারিত কি?

অমুসলমানদের উপর কোন প্রকার চাপ দেওয়া তো দূরের কথা, সাম্যবাদ এবং সর্বজাতীয় স্বাধীনতার মানদণ্ড মুসলমানগণ এমনভাবে ঠিক রাখিয়াছিল যে, ইসলামী শক্তির পূর্ণ যৌবন কালেও খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নিপূজক এবং পুতুলপূজক সম্প্রদায় বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে মুসলমানদের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রতিযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে—আব্বাস বংশীয় খলীফাদের রাজত্বের সময় ইবরাহীম ইবনে হেলাল নামক নক্ষত্রপূজক এক ব্যক্তি আরবী সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি একটি সাধারণ রাজকার্যে চাকুরী গ্রহণ করেন; পরে উন্নতি করিয়া বাদশাহ ইয্যদ্দৌলার রাজত্বকালে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইয্যদ্দৌলা ও তাঁহার ভাই আয্দদ্দৌলার মধ্যে রাজ্যসংক্রান্ত বিবাদ চলিতেছিল। ইয্যদ্দৌলার পক্ষ হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র তদীয় ভ্রাতার নিকট প্রেরিত হইত সেগুলি নিতান্ত আক্রমণমূলক হইত এবং মন্ত্রী ইবরাহীমের হাতেই এই সমস্ত পত্র লিখিত হইত। উত্তরকালে আয্দদ্দৌলা সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে ইবরাহীমের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় তাহাকে ধৃত করিলেন। তখন বড় বড় মুসলমান রাজ-কর্মচারীগণ এই অনন্যসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ শুধু যে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, তাঁহাকে ইসলামী ইতিহাস লেখার মত দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াও অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিলেন।

ইবরাহীম ইবনে হেলালের মৃত্যু হইলে পর মুসলমান রাজ-কর্মচারী এবং আলেমগণ তাঁহার প্রতি শোক প্রকাশ করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তৎকালীন স্বনামধন্য আলেম শরীফরাজি রচিত শোকোচ্ছ্বাসের একটি পদের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বলিতে পার—কাহাকে শবাধারের উপর বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে? সভার আলোক কোথায় লুকাইয়াছে?"

ইবরাহীম যে কেবল আরবী সাহিত্যেই দক্ষ ছিলেন তেমন নহে, ইসলামী ধর্মশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি সম্পূর্ণ কোরআন শরীফের হাফেয ছিলেন। তিনি মুসলমানদের সংস্রবে থাকিয়া ইসলামী ধর্মশিক্ষা চর্চায় জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মুসলমানদের অনেক ধর্মানুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। এমন কি নিজেও অনেক ধর্মকর্ম পালন করিতেন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজের পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করেন নাই। আয্‌দদ্দৌলার আন্তরিক আগ্রহ ছিল, যাহাতে ইবরাহীমের মত বিদ্বান ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করেন নাই, যাহাতে ইবরাহীমকে বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হয়। এমন কিছুও করা হয় নাই, যাহাতে স্বধর্মে থাকিয়া তাঁহাকে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এ রকম অনেক দৃষ্টান্তই ইসলামী রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইবনুত্তিলমিয নামক এক খৃষ্টান আলেম খলীফার দরবারে আজীবন চাকুরী করিয়াছিলেন। নিজ গুণে তিনি বাদশাহের মুসাহেব পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অথচ তাহাকে ইসলাম গ্রহণ না করার দরুন কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। এই সমস্ত ঘটনাবলী কি একথার চাক্ষুষ প্রমাণ নহে যে, বলপ্রয়োগে মুসলমান করার প্রথা ইসলামের পূর্ণ শক্তির সময়েও মুসলমানদের মধ্যে ছিল না।

ইসলামী জেহাদ ঃ

অনেকে হয়ত মুসলমানদের জেহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া বলিতে চাহিবেন যে, যদি ইসলাম ধর্মে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা না থাকিত, তবে জেহাদের উদ্দেশ্য কি?

প্রথমে বলিয়াছি যে, জেহাদের উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগে মুসলমান করা নহে। আমরা এস্থলে জেহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব না। জেহাদের দ্বারা কাহাকেও বাধ্যতামূলক -ভাবে মুসলমান করা যে উদ্দেশ্য নহে, তাহাই কেবল এস্থলে ব্যক্ত করিব। অবশ্য তৎপূর্বে বলিয়া দেওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, যাহারা ইসলামী জেহাদের নাম শুনিতেই বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, জগতে কোন্ জাতি যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া নিজেদের রাষ্ট্রীয় জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছে? বস্তুতঃ ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন রাষ্ট্রীয় জাতির উপমা নাই, যাহারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয় নাই অথবা অন্ততঃপক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ সমর্থন করে না। বর্তমান জগতের প্রতি দৃকপাত করিয়াই বলুন, জগতের কোন্ রাষ্ট্র যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অন্ততঃপক্ষে যুদ্ধোপকরণ ব্যতীত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিতেছে?

হয়ত কেহ বলিতে পারেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভিন্ন জিনিস, ধর্ম ভিন্ন জিনিস। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ সমর্থিত হইলেও ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মেই ধর্ম-ব্যবস্থায় লড়াই ঝগড়ার স্থান নাই। আমরা বলিব—এক যুদ্ধের কথাই কেন, ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মে উপাসনার সাধারণ নিয়ম ব্যতীত মানব জীবনের তুলনা করিতে যাওয়াই বৃথা। ইসলাম হইল পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, আর অন্যান্য সকল ধর্ম হইল অপূর্ণ ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ কোন ধর্মে যদি সর্বাবস্থায়ই যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সেই ধর্ম পালনযোগ্যই হইতে পারে না। যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন ধর্ম নীরব থাকিলেও বলিতে হইবে যে, সেই ধর্মে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা নাই, সুতরাং তাহা পূর্ণাঙ্গ নহে। ইসলাম সে রকম ধর্ম নহে। মানুষ জীবনে যত রকম অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে, তৎসমুদয়ের সুস্পষ্ট ব্যবস্থাই ইসলামে রহিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের আচার-ব্যবহার, চরিত্রসংশোধন ইত্যাদি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা যেমন ইসলামে আছে, তদ্রূপ পারিবারিক জীবনে মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী, স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যার সঙ্গে কি নিয়মাধীনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, তাহাও ইসলামে আছে। সামাজিক জীবনে প্রতিবেশীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হইবে, সমাজে শান্তি বহাল রাখিতে কি কি জিনিসের আবশ্যক, রাজনৈতিক জীবনে কিরূপে দেশ শাসন ও প্রজাপালন করিতে হইবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার রাখিতে হইবে এবং কিভাবে শান্তি রক্ষা

www.nagorikpathagar.org

করিয়া চলিতে হইবে, আবার ঘটনাচক্রে যুদ্ধ বাধিলেই বা কি বিধি-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, এই সমস্ত কথাই ইসলামের অঙ্গমধ্যে গণ্য। এক কথায় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

অজ্ঞতাবশতঃ অনেক মুসলমানও মনে করে যে, ধর্ম বলিতে কেবল এবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুনই বুঝায়। সমাজ ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনীতি ইসলামের বহির্ভূত জিনিস। তাহাদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা বলিয়াছি, মানব-জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত। সুতরাং রাজনীতিও ইসলামের বাহিরে নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—জগতের সমস্ত রাজনীতিই যখন অবস্থাবিশেষে যুদ্ধের ব্যবস্থা দেয়, তখন ইসলামী রাজনীতিতে যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকাতে দোষ হইবে কেন? দুনিয়ার কোন জাতিই যখন যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তখন মুসলমানেরা কিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে? দেখা গেল, যুদ্ধ-ব্যবস্থা সব জাতিই মানিতে বাধ্য; প্রভেদ কেবল এখানে যে, অন্যান্য জাতির নিকট রাজনীতি ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য নহে। সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহের ব্যবস্থা তাহাদের ধর্ম পুস্তকে নাই। আর মুসলমানদের নিকট রাজনীতিও ধর্মের অংশ; সুতরাং অন্যান্য সকল ব্যবস্থার মত যুদ্ধের ব্যবস্থা এবং নিয়মাবলী ইসলামী ধর্ম পুস্তকেই বিবৃত হইয়াছে।

ইসলামী জেহাদ ও অন্যান্য জাতির যুদ্ধের মধ্যে আর এক তফাৎ এই যে, জেহাদ ধর্মের খাতিরে হইয়া থাকে—কোন প্রকার ঐহিক স্বার্থের খাতিরে নহে; আর অন্যান্য জাতির যুদ্ধবিগ্রহ সাধারণত অর্থনৈতিক ব্যাপারে হইয়া থাকে। এক জাতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের সামান্য অসুবিধা হইলে, অমনি আর এক জাতির সঙ্গে তার সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া গেল। হেদায়া প্রভৃতি ইসলামী বিধান পুস্তকে জেহাদের দুইটি উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে—'এ'জায়ে-দ্বীন' ও 'রফয়ে-ফাসাদ' অর্থাৎ, ধর্মের মর্যাদা রক্ষা এবং অত্যাচার, অনাচার প্রতিরোধ করা। ইসলামী জেহাদ কেবল আত্মরক্ষামূলক কিংবা আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক এই দুই প্রকারেই হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন আধুনিক লেখক সম্ভবতঃ বিধর্মী সমালোচকদের নিকট দোষ-প্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে একথা মানিয়া লইয়াছেন যে, কেবল আত্মরক্ষামূলক জেহাদের ব্যবস্থাই ইসলামে আছে। আমরা কিন্তু নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেছি যে, উভয় প্রকার জেহাদের ব্যবস্থাই আমাদের ধর্মে রহিয়াছে।

আমরাও স্বীকার করি—মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ যুদ্ধই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হইয়াছিল। কিন্তু অনেক সময় এমনও হইয়াছে যে, প্রতিবেশী কোন রাজশক্তি মুসলমানদের অধীনতাও স্বীকার করিতেছে না, স্বাধীন থাকিয়া মুসলিম রাজশক্তির সঙ্গে নিরাপত্তামূলক সন্ধিও করিতেছে না; এরূপাবস্থায় মুসলমানদের আশু বিপদের কোন আশঙ্কা না থাকিলেও হয়ত ভবিষ্যতে তাহাদের শান্তি বিপন্ন হইতে পারে এবং তাহাদের ধর্মের উপরেও আক্রমণ হইতে পারে। সুতরাং সন্ধিবিহীন যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবশ্যক বোধে মুসলিম রাজশক্তি যুদ্ধ করিতে পারে এবং তাহাকে পরাভূত অথবা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করিতে পারে। ইহাকে আক্রমণমূলক জেহাদ না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাতে ইসলামের উপর কোন প্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বর্তমান সভ্য জগতের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাতেও ইহার চেয়ে কোন উচ্চ ধরনের নিয়মতান্ত্রিকতা পরিদৃষ্ট হয় না।

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সুধী পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ধর্ম এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও মর্যাদা বজায় রাখাই ইসলামী জেহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য ধর্মের

www.nagorikpathagar.org

লোকদিগকে বলপূর্বক মুসলমান করা অথবা অন্য রাজশক্তিকে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা জেহাদের মূল উদ্দেশ্য নহে। কারণ, নিজের ধর্ম এবং পূর্ণ স্বাধীনতা বহাল রাখিয়া কোন বিজাতীয় রাজশক্তি যদি মুসলমানদের সঙ্গে নিরাপত্তামূলক ও সম্মানজনক সন্ধি করিতে রাজি হন, এরূপাবস্থায় অযথা সংগ্রাম ও নরহত্যায় লিপ্ত হওয়া ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। আমরা নিম্নে ইসলামী জেহাদের কয়েকটি ধারা উদ্ধার করিয়া দিতেছি, যাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, জেহাদের সঙ্গে বল প্রয়োগে মুসলমান করার কোন দূর সম্পর্কও নাই। এমন কি রাজ্য বিস্তারও জেহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য নহে।

জেহাদের কতিপয় ধারা ঃ

প্রথম—জেহাদের মধ্যে শিশু, স্ত্রীলোক, চিররুগ্ন এবং বৃদ্ধকে বধ করা নিষিদ্ধ, যদিও তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়। বলপূর্বক মুসলমান করার উদ্দেশ্যে যদি জেহাদ করার আদেশ হইত, তবে ইহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়ার কোন কারণই ছিল না।

দ্বিতীয়—এরূপ বিধান আছে যে, অমুসলমানগণ মুসলমানদের অধীনতা স্বীকারে জিযিয়া টেক্স দিতে সম্মত হইলে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। ইসলামে দীক্ষিত করাই যদি জেহাদের উদ্দেশ্য হইত, তবে তাহাদিগকে স্বধর্মে বহাল রাখিয়া জিযিয়া লওয়ার কোনই সার্থকতা ছিল না।

তৃতীয়—জিযিয়াও আবার সকল কাফেরের উপরে প্রবর্তিত করার বিধান নাই। স্ত্রীলোক, শিশু, চিররুগ্ন, অন্ধ, বৃদ্ধ এবং সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর উপর জিযিয়া প্রবর্তন করা যায় না। ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, জেহাদের মত জিযিয়াও কুফরীর শাস্তি নহে। নতুবা এই সমস্ত লোক কাফের থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর জিযিয়া ধার্য না হওয়ার কোনই কারণ ছিল না; বরং সাধারণভাবে সকল কাফেরের উপরই জিযিয়া কর ধার্য হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। জিযিয়া প্রাণ বধ করার চেয়ে সহজ সাজা। যখন ইহাই কুফরীর শাস্তিরূপে গণ্য হইল না, সুতরাং প্রাণনাশ করা কখনও কুফরীর শাস্তি হইতে পারে না।

চতুর্থ—মুসলমান বাদশাহ্ জিযিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে সন্ধি করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলে ধর্ম-বিধানে উহারও অনুমতি আছে।

পঞ্চম—এমন কি অমুসলিমগণকে কিছু অর্থ প্রদান অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদের নিকট নতি স্বীকারপূর্বক সন্ধি করাই যদি কোন অবস্থায় শান্তিপ্রদ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাতেও কোন বাধা নাই।

শেষোক্ত দুই ধারায় একথাও নিঃসন্দেহে বুঝা গেল যে, জিযিয়া যেমন কুফরীর দণ্ডস্বরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই, তদ্রূপ উহা উদ্দেশ্যের মধ্যেও গণ্য নহে; ইহা কেবল শান্তি স্থাপনের একটা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হইলে কখনও জিযিয়া ছাড়িয়া—এমন কি নিজেদের পক্ষ হইতে অর্থ প্রদানে সন্ধি স্থাপনের কোনই সার্থকতা ছিল না। অতএব, আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, তরবারি অথবা জিযিয়া অন্য ধর্মে থাকার শাস্তিও নহে; তাহা লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে গণ্যও নহে। জেহাদ এবং জিযিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এস্থলে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

জেহাদ শান্তির উপকরণ, অশান্তির নহে ঃ

ইসলাম শান্তির ধর্ম, অশান্তির নহে। মুসলমানগণ প্রতিবেশী বিধর্মীর সঙ্গে যে রকম সভ্যতা ও ভদ্রতা দেখাইয়া আসিয়াছে, এই পুস্তকে আমরা উহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখাইব। বস্তুতঃ ইসলাম মুসলমানের জন্য যেমন শান্তি আনয়ন করিয়াছে, অমুসলমানের জন্যও তদ্রূপ শান্তিময়

www.nagorikpathagar.org

জীবনযাপনের সন্ধান দিয়াছে। জেহাদ ইসলামের একটা বিশেষ অঙ্গ, সুতরাং ইহাতেও আছে শান্তি—অশান্তি নহে। অনেক ফলের বহিরাংশ কঠিন থাকে, কিন্তু উহার ভিতরের শাঁস কোমল হয়; জেহাদের অবস্থাও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিবেশী অমুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে—উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে উভয়ের স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষত রাখিয়া কালাতিপাত করা। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাতেও জগতের রাজশক্তিসমূহ সন্ধিসূত্রে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতি। ইসলাম সন্ধি স্থাপনকে কেবল যে সমর্থন করিয়াছে এমন নহে, অবস্থা বিশেষে ইহাকে উচ্চ স্থানও দান করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط

"তাহারা সন্ধির জন্য বাহু বিস্তার করিলে তুমিও উহার জন্য বাহু বিস্তার কর এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর।" —সূরা-আন্‌ফালঃ রুকূ ৮

মুসলমানদের মনে হয়ত সন্ধি-ব্যাপারে এমন সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, অমুসলিমগণ এক্ষণে দুর্বলতার কারণে সন্ধি করিতে রাজি হইলেও তাহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমরাভিযান করিতে পারে। যাহাতে এরূপ সন্দেহের বশে সন্ধিস্থাপন হইতে বিরত না থাকে, এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে, সন্ধিকরণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর; ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্তমান কর্তব্য হইতে বিমুখ থাকা কখনও উচিত নহে।

ইসলামের আইন মতে যুদ্ধ বাধার পূর্বেও সন্ধি স্থাপনের বিধান আছে; যুদ্ধারম্ভের পরেও আছে। এ রকম উদারতা যেখানে সেখানে জোর-জবরদস্তীর যে কোন স্থানই থাকিতে পারে না, একথা সাধারণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

অগত্যা যদি কোন বিধর্মী রাজশক্তি শান্তিকামী মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া সৌহার্দ্য ও শান্তি বহাল করিতে রাজি না হয়, উপরন্তু মুসলিম রাজত্বের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হয়, অথবা ইসলাম কিংবা মুসলমান জনসাধারণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে, এমতাবস্থায় ধর্মের নির্দেশ এই যে, আত্মরক্ষা ও দুষ্টের শাস্তি বিধানপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। এ সম্পর্কে কোরআন পাকে উল্লেখ আছেঃ

فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ

"যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়, তবে তোমরাও তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর।"
—সূরা-বাকারাঃ রুকূ ২৪

আরও আছেঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط

"যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তোমরাও আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিও না।" —সূরা-বাকারাঃ রুকূ ২৪

যুদ্ধরত মুসলিম বীরবৃন্দ যাহাতে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া কোন নির্লিপ্ত বিজাতীয় রাজ্যকেও আক্রমণ করিয়া না বসে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলা

www.nagorikpathagar.org

হইয়াছে, তোমরা যেন যুদ্ধাবস্থায়ও সীমালঙ্ঘন না কর। আক্রমণকারীদের রাজ্যেও এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা কার্যতঃ যুদ্ধবিগ্রহ বা অত্যাচার অনাচারে যোগদান করে না; যেমন স্ত্রীলোক, শিশু, চিররুগ্ন, বৃদ্ধ ইত্যাদি। যাহাতে যোদ্ধৃবৃন্দ এমন নিরীহ লোকদিগকে বধ না করে, ইহাও উক্ত সতর্কবাণীর অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রই ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, এ রকম উদারতাপূর্ণ বিধানের সঙ্গে বলপূর্বক ধর্মান্তর করার কি সংস্রব থাকিতে পারে? শত্রুরা মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাদের ধর্ম ও ধন-প্রাণ বিপন্ন করিবে, আর মুসলমানগণ যদি কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ অচল হইয়া থাকিতে যায়, তবে ধরাপৃষ্ঠে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। তাহাদের ধর্মও বহাল থাকিতে পারে না। জগতের কোন জাতিই এ রকম নিরস্ত্র অবস্থায় রাষ্ট্রীয় জীবন বাঁচাইতে পারে না। সুতরাং এই ব্যাপারে মুসলমানদের উপর দোষ চাপাইতে যাওয়া অন্যায় হইবে না কেন?

যে সকল অমুসলমানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয় নাই, অথচ তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অগ্রসর হয় নাই, এক্ষণে এ রকম অমুসলমানের কথা বিবৃত হইতেছে। তাহারা কার্যতঃ আক্রমণ না করিলে পারস্পরিক সন্ধি-বন্ধন না থাকায় যে কোন সময় তাহারা শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে। বিশেষতঃ এই রাজ্য যদি মুসলিম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হয়, তবে এ রকম আশঙ্কা আরও প্রবল হইয়া পড়ে। এরূপাবস্থায় কোরআনের আদেশঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

"অনন্তর অংশীবাদিগণকে যেখানে পাও, বধ কর।" —সূরা-তওবাঃ রুকূ ১

নিজেদের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে কোন সন্ধিবিহীন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আধুনিক সভ্যজগতেও অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। বিশেষরূপে এই অভিযানের উদ্দেশ্য যদি হয়—শান্তি এবং স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষা। আমরা এই শেষোক্ত ধর্ম-যুদ্ধকেই আক্রমণমূলক ধর্মযুদ্ধ বলিব। বলাবাহুল্য, এই আক্রমণমূলক যুদ্ধও বলপূর্বক ধর্মান্তর করার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। অমুসলিম রাজশক্তি ইচ্ছা করিলে যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে অথবা পরে পারস্পরিক বাক্যালাপ দ্বারা সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতেন; যাহাতে মুসলমানদের মন স্বধর্ম ও স্বজাতির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। যুদ্ধজয়ের পরেও এমন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই যে, বিজিতদিগকে ধর্মান্তরিত হইতে বাধ্য করা হইবে। পরাজিতগণকে বশ্যতা স্বীকার ও জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা হইবে, ইহাই ইসলামের বিধান।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُـؤْمِنُـوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَـوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ ع

"তোমরা এমন গ্রন্থধারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাহারা আল্লাহ্র প্রতিও বিশ্বাস রাখে না, পরকালের প্রতিও বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল যাহা অসিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহারা তাহা অসিদ্ধ বলিয়াও জানে না—সত্য ধর্মও গ্রহণ করে না। তাহারা নতভাবে জিযিয়া দিতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে।"

—সূরা-তওবাঃ রুকূ ৪

www.nagorikpathagar.org

জিযিয়া কর ঃ

জিযিয়া করের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে ইহাকে অমুসলমানদের উপর অত্যাচার ও অবিচারের মধ্যে গণ্য করেন। ভাবিতে গেলে ইহাতেও ইসলামের অসাধারণ উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে।

ইসলামের বিধান মতে মুসলিম রাষ্ট্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে—মুসলমান, অমুসলমান সমস্ত প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য। বাহিরের কোন শত্রু আক্রমণ করিলে, চোর-ডাকাতে উপদ্রব করিলে ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে বাদশাহই প্রজাদের রক্ষক। বাদশাহ যেমন প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তদ্রূপ ন্যায়তঃ প্রজাদেরও কর্তব্য, তাহারা যেন এই ব্যাপারে সর্বপ্রকারে বাদশাহের সাহায্য করে। এজন্যই ধর্মের আদেশ মতে বাদশাহের তাবেদারী সমগ্র মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোন সময় যুদ্ধ বাধিলে মুসলমান প্রজাগণ যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য। ধর্মের বিধান মতে মুসলমান যোদ্ধাদের অবস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের তুল্য। তাহারা বেতনেরও দাবী করিতে পারিবে না। অবশ্য অবস্থাবিশেষে বাদশাহ স্বয়ং তাহাদের মাহিনা নির্ধারিত করিয়া দিতে পারেন। যুবকদের যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক। কোন বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীলোকদের পক্ষেও যুদ্ধে যোগদান অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে। এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কেবল মুসলমান প্রজাদের সম্বন্ধে—অমুসলমান প্রজাগণকে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। তৎপরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে সামান্য পরিমাণ অর্থ গ্রহণের ব্যবস্থা মাত্র রাখা হইয়াছে। ইহাই হইল জিযিয়া ট্যাক্স। এক্ষণে বলুন, মুসলমান প্রজাদের তুলনায় অমুসলমান প্রজাদের উপর কত সহজ ও সদয় ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য ধন-প্রাণ যথাসর্বস্ব দিয়া জেহাদ করিতে মুসলমান মাত্রই বাধ্য। পক্ষান্তরে অমুসলমান প্রজাগণের কেবল সামান্য পরিমাণ ট্যাক্স দিতে হইবে; তদতিরিক্ত তাহাদের নিকট আর কোন কিছুই দাবী করা চলিবে না। ইহা অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের কত বড় উদারতার পরিচয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

বলা হয় যে, জিযিয়া কর কেবল অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ না করার শাস্তি হিসাবে প্রবর্তিত হইয়াছে। একথা নিতান্ত অমূলক। জিযিয়া সম্পর্কীয় কয়েকটি বিশেষ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যদ্দৃষ্টে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই একথার ভিত্তিহীনতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জিযিয়ার কতিপয় ধারা ঃ

প্রথম ঃ স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, রোগী এবং বৃদ্ধের উপর জিযিয়া কর ধার্য হয় না। তদ্রূপ অক্ষম, ধনহীন এবং সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীরও জিযিয়া দিতে হয় না।

ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়, বিধর্মী থাকার অপরাধে জিযিয়া ধার্য করা হয় না। যদি এ রকমই হইত, তবে সাধারণভাবে সমস্ত অমুসলমানের উপরই জিযিয়ার বিধান থাকিত। কিন্তু কার্যতঃ সেরূপ হয় নাই; কেবল যে সমস্ত লোক রাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে সক্ষম, তাহাদের যুদ্ধ হইতে অব্যাহতির জন্যই জিযিয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ বিধর্মী সন্ন্যাসী প্রবরদের কথাই ধরুন; তাহারা স্বধর্মে অত্যন্ত গোঁড়া হইয়া থাকে। তাহাদের উপর জিযিয়া না থাকাতে জিযিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিহীনতা সম্যক বুঝা যাইতেছে।

২–

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ঃ মুসলিম দলপতি অবস্থাবিশেষে ইচ্ছা করিলে জিযিয়ার নির্ধারিত পরিমাণে তারতম্য করিয়া অথবা জিযিয়া রহিত করার শর্তেও অমুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন।

তৃতীয়ঃ দলপতি ইচ্ছা করিলে অমুসলিম সম্প্রদায়বিশেষ হইতে জিযিয়া রহিত করিয়া মুসলিম পতাকাতলে যুদ্ধে যোগদান করিতেও তাহাদিগকে অনুমতি দিতে পারেন।

চতুর্থঃ মুসলমান রাষ্ট্রপতি যদি অমুসলিম প্রজাবৃন্দের ধন-প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অক্ষম হন, তবে ধর্মের বিধান মতে তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত জিযিয়া কর ফিরাইয়া দিতে হইবে।

এই সমস্ত ধারায় বুঝা যায় যে, জিযিয়া কর কেবল রক্ষণমূলক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছে; ধর্মান্তরের সঙ্গে ইহার দূর-সম্পর্কও নাই। ফলকথা, 'ধর্ম গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নাই'; এই মূল বিধান, ইসলামী ব্যবস্থার সমস্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যেই পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে।

'মোরতাদ'-এর প্রতি ব্যবস্থাঃ

'মোরতাদ' বা ইসলাম বর্জনকারীর প্রতি ইসলামের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। ব্যবস্থা এই যে, তাহাকে সত্যধর্মে প্রত্যাবর্তন করিতে বলা হইবে। ইহাতে অসম্মত হইলে তাহার প্রতি জিযিয়া অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার অবকাশ নাই; তাহার প্রতি প্রাণদণ্ড নির্ধারিত। স্থূল-দৃষ্টিতে এই বিধান বল প্রয়োগের মত দেখাইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকে বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করান বলা যাইতে পারে না। অবশ্য ইহাকে বল প্রয়োগে ইসলাম স্থায়ী রাখা বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদের দাবী নষ্ট হয় না। কারণ, মোরতাদ সম্পর্কীয় ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। অবশ্য আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, মোরতাদের প্রতি যে বিধান ইসলামে রাখা হইয়াছে, বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে তাহা কেবল উচিতই নহে— অপরিহার্যও বটে।

প্রথমে আমাদের ভাবিতে হইবে যে, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ তো দূরের কথা, সাধারণ চাপ দেওয়ারও বিধান নাই। যাহারা মুসলমান হয়, নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে ইসলাম ধর্ম সত্য জানিয়াই হয়। অতঃপর যদি ইসলাম বর্জনের ব্যাপারেও স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে একটা ফাসাদের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। হয়তো এই সুযোগে অনেক দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি লোক দেখানোভাবে ইসলাম গ্রহণের ভান করিয়া নিজের কোন পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইবে; উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর মুখোস খুলিয়া আবার আত্মরূপ প্রকাশ করিবে। অধিকন্তু এই সুযোগে দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোকেরা মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজনৈতিক ও ধর্ম সংক্রান্ত বহুবিধ বিভ্রাট সৃষ্টির চেষ্টাও করিতে পারে। ইহা কেবল কল্পনামাত্রই নহে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাস্তব ক্ষেত্রেও একদল কপট লোক নিজেদের মধ্যে এরূপ গোপন পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিল যে, আমরা এক একবার মুসলমান হওয়ার ভান করিয়া পরে আবার স্বধর্মে ফিরিয়া আসিব। ইহাতে নব-দীক্ষিত ও দুর্বলমনা লোকদের হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক হইবে এবং মুসলমানদের দলে ভাঙ্গন ধরিবে। কোরআন মজীদেও তাহাদের এই দুরভিসন্ধির উল্লেখ করা হইয়াছেঃ

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

"আহ্‌লে কিতাবদের একদল (কপট বিশ্বাসী) নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিত, মু'মিনদের নিকট যে প্রত্যাদেশ আসে, উহার প্রতি দিনের প্রথমাংশে বিশ্বাসের ভান কর এবং শেষাংশে তাহা

www.nagorikpathagar.org

পরিত্যাগ কর। হয়তো (এই উপায়ে মুসলমানদের বিশ্বাসও শিথিল হইয়া পড়িবে এবং) তাহারা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।" —সূরা-আলে-এমরান ঃ রুকূ ৭

বলা বাহুল্য, এ রকম প্রোপাগাণ্ডার প্রশ্রয় দিতে গেলে প্রকারান্তরে আন্তবিপ্লবের দ্বারই উদঘাটিত করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ধর্মের মর্যাদাও বিনষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণে শাসনমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ মোরতাদদের প্রাণদণ্ডের বিধান রাখা হইয়াছে। এস্থলেও যতদূর দয়া দেখানো সম্ভব, তাহাতে ক্রটি করা হয় নাই। প্রথমে বন্দী করিয়া তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার মত পরিবর্তন ঘটিলেই মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। সম্প্রতি তাহার মতের পরিবর্তন না হইলেও কিছুদিন বন্দী অবস্থায় রাখিয়া তাহাকে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হইবে। ফলকথা, এই বিষয়টি নিছক শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার, ধর্ম সম্পর্কে বল প্রয়োগ নহে। একথার প্রমাণ এই যে, মোরতাদ পুরুষকে বধ করার বিধান থাকিলেও মোরতাদ স্ত্রীলোককে বধ করার বিধান নাই। ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে, মোরতাদকে বধ করা ইসলাম বর্জনের শাস্তিও নহে, বলপূর্বক ইসলামে স্থায়ী রাখার উদ্দেশ্যেও নহে। এ সম্পর্কে প্রামাণিক ইসলামী বিধান পুস্তক হেদায়ায় উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্মাধর্মের বিচার পরকালের উপর ছাড়িয়া দেওয়ারই বিধান। কারণ, দুনিয়ায় বিচার করিতে গেলে ধর্ম ব্যাপারে মানুষের পরীক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু আশু-অশান্তি ও দুরভিসন্ধি নিবারণের জন্যই কেবল পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সেই অশান্তি হইয়াছে, যুদ্ধবিগ্রহ। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এ রকম কোন আশঙ্কা নাই; সুতরাং তাহাদের প্রাণদণ্ড হওয়ার কোনই কারণ নাই।

ইহার উপর আর টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক। কেবল অশান্তি ও দুরভিসন্ধি নিবারণের জন্যই যে এই প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা, তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

দেখা গেল, ইসলামের মূলনীতির আলোচনাতেই তলোয়ারের সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার অলীক অভিযোগের মূল উৎপাটন হইয়া যায়। বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তি সম্পন্ন পাঠক মাত্রেরই পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞ সমাজ মৌলিক আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। সকল কথাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং কার্যতঃ মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কি আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাহাও ঐতিহাসিক প্রমাণাদিসহ আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা ইসলামের প্রায় চৌদ্দ শত বৎসরের জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এই পুস্তকে আলোচনা করিব। প্রথম অংশে নূরনবী মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর জীবন-ইতিহাস, দ্বিতীয় অংশে সাহাবায়ে কেরামের যমানা এবং তৃতীয় অংশে সাহাবাদের পরবর্তী কালের অবস্থা বর্ণিত হইবে।

আমাদের এই পুস্তক ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, সুতরাং আমাদের দাবীর প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত সময়ের অসংখ্য ঘটনাবলী হইতে মাত্র সুপ্রসিদ্ধ কতিপয় ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হইবে, যদ্দৃষ্টে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, মুসলমানগণ কোরআন পাকের নির্দেশানুযায়ী ধর্ম প্রচার ব্যাপারে সর্বতোভাবে বল প্রয়োগ হইতে বিরত রহিয়াছেন। তৎসঙ্গে ইসলাম ধর্ম এত দ্রুত প্রচারিত হওয়ার যে সমস্ত মৌলিক উপকরণ রহিয়াছে, তৎসমুদয়ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যাহাতে পাঠকগণ মৌলিক উপকরণসমূহও সহজে বুঝিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া রাখা সঙ্গত মনে করিতেছি। এই উপকরণসমূহই দ্রুত ইসলাম প্রচারের সহায় হইয়াছিল।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম প্রচারের মৌলিক উপকরণঃ

প্রথমঃ তওরাত, ইন্‌জীল প্রভৃতি পূর্বকালের ধর্ম-গ্রন্থসমূহে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর কথা বর্ণিত ছিল। তদনুসারে ইহুদী এবং নাসারাগণ হযরত (দঃ)-এর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের নিকট শুনিয়া যে সমস্ত সম্প্রদায়ে ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় নাই, তাহারাও অবগত ছিল যে, শেষ পয়গম্বরের আবির্ভাবের সময় অতি নিকটবর্তী। তৎকালে পারস্য দেশে এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে জ্যোতির্বিদ্যার বহুল প্রচলন ছিল। ইহা দ্বারাও হযরত (দঃ)-এর আবির্ভাবের কথা প্রচার লাভ করিতেছিল। এমন কি অনেক লোক হযরত (দঃ)-এর দর্শন লাভেচ্ছায় স্বদেশ পরিত্যাগকরত মদীনা নগরীতে আসিয়া বসতি বিস্তার করিয়াছিল। এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বার্তা ইসলাম প্রচার ব্যাপারে অনেকখানি সহায় হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ঃ ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-ব্যবস্থাগুলি এমনি সরল ও হৃদয়গ্রাহী যে, বিশেষ দুর্ভাগ্যবান না হইলে উহা হৃদয়ঙ্গম করার পর কেহই ইসলামরূপ নেয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারে নাই। আমাদের মতে ইহাই ইসলাম প্রচারের সর্বপ্রধান অবলম্বন। কথায় বলে—সূর্যই সূর্যের আত্মপরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

তৃতীয়ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চরিত্রমাধুর্য, সরলতা, সত্যবাদিতা, বিনয়, সহানুভূতি, শিক্ষাদানের চিত্তাকর্ষক পদ্ধতি ইত্যাদি গুণাবলী অতি সহজেই লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিত। অনেক সময় মৌখিক শিক্ষাদানেরও আবশ্যক হইত না। তাঁহার নূরানী চেহারা দেখিয়াই অনেকে অভিভূত হইয়া পড়িত এবং পবিত্র পদতলে আত্মোৎসর্গ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত। চেহারা মোবারকের এই জ্যোতিঃ দেখিয়া বুদ্ধিমান ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা বলিতেন—"ইহা কখনও মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না।" শত্রুরাও দোষারোপের অন্য উপায় না দেখিয়া বলিয়া উঠিত যে,—'মুহাম্মদ (দঃ)-এর দৃষ্টিতে ভয়ানক ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ রহিয়াছে।

চতুর্থঃ ধর্মের মূলভিত্তির প্রতি মুসলমানদের অটল বিশ্বাস রাখা, ধর্মের বিধানসমূহ দৃঢ়তার সহিত পালন করা এবং তাঁহাদের সত্যবাদিতা, শুদ্ধ হৃদয়তা, ধর্মকর্মে তৎপরতা, সত্যানুবর্তিতা, নির্ভীকতা ইত্যাদি গুণাবলী সমষ্টিগতভাবে লোকচক্ষে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইত; ফলে ইসলামের প্রতি সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। মুসলিমবৃন্দের অবস্থা দেখিয়াই অনেকে ইসলামের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত; মৌখিক তবলীগের আবশ্যকও হইত না।

পঞ্চমঃ ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরআন পাকের ভাষা ও রচনার পারিপাট্য অতিশয় মাধুরীপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। মুসলমানগণ নামাযে অথবা অন্য সময় যখন কোরআন পাঠ করিতেন, তখন আরবের লোকেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাহা শুনিয়া অতীব তন্ময় হইয়া পড়িত। এমন কি অনেকে আগ্রহাতিশয্যের কারণে কাজকর্ম ও পানাহার ছাড়িয়া কোরআন পাঠ শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। এইভাবে আল্লাহ্‌র পাক কালাম ক্রমশঃ শত্রুর মন হইতেও শত্রুতাভাব বিদূরিত করিয়া তদস্থলে অজ্ঞাতভাবে বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের মধুর রস ঢালিয়া দিত। কোরআনের ভাব, ভাষা, রচনা-চাতুর্য সমস্তই অলৌকিক। এই অলৌকিকত্ব যে কেবল ভক্তরাই স্বীকার করিত এমন নহে, শত্রুরাও একথা মানিতে বাধ্য হইত যে, মানুষের পক্ষে এমন রচনা প্রস্তুত করা কখনও সম্ভবপর নহে। আরবের লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক প্রচারকার্য কোরআন পাকের নিজস্ব আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারাই সাধিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল।

■

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের সূচনা পর্ব

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রথম প্রচার জীবন ঃ

প্রথমে বলিয়াছি, ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উপমাস্বরূপ কতিপয় ঘটনা ব্যক্ত করাই শুধু আমাদের লক্ষ্য। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তের বৎসর কাল তাঁহার জন্মস্থান মক্কা নগরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এই তের বৎসর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কাহারও সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ তো দূরের কথা, সাধারণ বাদ-বিসম্বাদও করেন নাই। যেই সত্যের বাণী তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল, ধৈর্য ও একনিষ্ঠার সহিত কেবল উহাই প্রচার করিয়াছিলেন। মক্কার কাফেরগণ এই সময় হযরত (দঃ)-এর প্রতি যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়; কিন্তু মহানবীর পক্ষ হইতে সবর ও শুভকামনা ব্যতীত আর কোন প্রতিবাদই হইত না। এই সময় শত্রুর সঙ্গে কোন প্রকার লড়াই-ঝগড়া করার অনুমতিও ছিল না; বরং তাঁহার প্রতি কোরআন পাকের আদেশ ছিল ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ○

"আল্লাহ্র পথে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সহিত আহ্বান কর।" —সূরা-নহ্ল ঃ রুকূ ১৬

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে ইসলাম প্রচার বিষয়ে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে মক্কা ও কুরাইশ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অবগত হওয়া আবশ্যক।

অন্ধকার যুগের মক্কা ও কুরাইশ বংশ ঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল ও স্ত্রী বিবি হাজেরাকে বিশেষ ঘটনাক্রমে এক জনমানব শূন্য মরু-প্রান্তরে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হন। আল্লাহ্র কুদরতে এই বিজন মরু ভূমিতে জমজম কূপ দেখা দিল। আরব দেশে পানির খুব অভাব। মরুভূমির ভিতরে সুমিষ্ট পানির উৎস দেখিয়া কিছু লোক এখানে আসিয়া বসতি বিস্তার করে। ইহারাই জুরহুম সম্প্রদায় নামে অভিহিত। জুরহুম বংশ দ্বারাই সেখানে একটা নূতন জনপদ গড়িয়া উঠে। এই জনপদের নামই মক্কা। হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) পিতা-পুত্রে মিলিয়া খোদার আদেশে সেখানে একটি মসজিদ তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইহাই কা'বা শরীফ নামে বিখ্যাত। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উম্মতের নাম হইয়াছিল 'মুসলিম' বা

www.nagorikpathagar.org

'মুসলমান'। জগতের সমস্ত পয়গম্বরই ইসলাম ধর্মের প্রচারক হইলেও সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উম্মতের নামই 'মুসলিম' রাখা হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ছিলেন—ইসমাঈল ও ইসহাক। হযরত ইসহাক (আঃ) সিরিয়া রাজ্যে হযরত ইবরাহীমের পুরাতন বাসস্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অন্য নাম ইসরায়ীল ছিল। তাঁহার বংশধরগণই বনী ইসরায়ীল নামে পরিচিত। বনী ইসরায়ীল বংশে সিরিয়ায় (শামদেশে) অনেক পয়গম্বর জন্মগ্রহণপূর্বক ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হযরত ইসমাঈলের বংশে আর কোন পয়গম্বর না হইলেও সমস্ত পয়গম্বরের সরদার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য তাঁহার বংশকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণই উত্তরকালে কুরাইশ বংশ নামে অভিহিত হন।

জুরহুম বংশ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বহুকাল কা'বা শরীফের মধ্যে এক আল্লাহ্‌র এবাদতে রত ছিলেন। কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণ ভার জুরহুম বংশের হাতেই ছিল। বহুকাল পরে এই বংশের আসাফ নামক এক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নায়েলা নাম্নী এক দুষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত কা'বা শরীফের ভিতরেই ব্যভিচার করে। এই মহাপাতকের আশুফল-স্বরূপ পাপিষ্ঠদ্বয় প্রস্তরে পরিণত হয়। এই ঘটনার বহু যুগ পরে আমর ইবনে লুহাই নামক এক দুষ্ট-বুদ্ধি ব্যক্তি উপরোক্ত মহাপাপের নিদর্শন সেই যুগল প্রস্তর-মূর্তিকে তাহাদের উপাস্য দেবতা বলিয়া বুঝাইয়া দিল। এই সময় হইতে ক্রমশঃ সমস্ত আরব দেশে উক্ত প্রস্তর মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। অবশ্য পরে প্রত্যেক সম্প্রদায়েই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের মূর্তি গঠিত হইয়াছিল এবং ইহাদের সর্বশুদ্ধ সংখ্যা তিনশত ষাটে পৌঁছিয়াছিল।

কা'বা শরীফের খাদেম হিসাবে জুরহুম সম্প্রদায় সমগ্র আরবে খুবই সম্মানিত ছিল। কালের করাল গতিতে যখন তাহাদের অবনতির সময় আসিয়া পৌঁছিল, তখন ইয়ামন হইতে খোযাআ নামক এক সম্প্রদায় ভয়ানক যুদ্ধবিগ্রহের পর তাহাদিগকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা কা'বা শরীফের সর্বেসর্বা হইয়া বসিল। জুরহুম সম্প্রদায় মক্কা হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর কৃতপাপের জন্য তাহাদের অন্তরে অত্যন্ত অনুশোচনার উদয় হইয়াছিল। তাহারা অনেক জায়গায় আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু কোথাও তাহাদের মাথা রাখিবার স্থানটুকু জুটিতেছিল না। এই দুরবস্থার ভিতর দিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহাদের অস্তিত্বই লোপ পাইয়া যায়।

জুরহুমের পর কিছুকাল পর্যন্ত খোযাআ সম্প্রদায় বায়তুল্লাহ্‌ শরীফের মোতাওয়াল্লী রহিল। অনন্তর যখন তাহাদেরও দুর্ভাগ্যকাল উপস্থিত হইল, তখন তাহাদেরই দলের আবু-গায়শান নামক এক ব্যক্তি এক পাত্র মদ্যের পরিবর্তে কুরাইশ বংশের লোকদের নিকট কা'বা শরীফ বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই ঘটনার পর হইতে কুরাইশগণই কা'বা শরীফের খাদেমের পদে অধিষ্ঠিত হইল। আবু-গায়শান কর্তৃক শরাবের বিনিময়ে কা'বা বিক্রয়ের ঘটনাটি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, কেহ ঠকিয়া বেচা-কেনা করিলে বলা হইত—"আবু-গায়শান হইতেও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল!" কা'বা বিক্রয়ের কারণে লোকচক্ষে তাহাদের মান-সম্ভ্রম চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

খোযাআ বংশের পতনের পর কুরাইশগণই আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হইলেন। কা'বা শরীফ সমগ্র আরববাসীদের কেবলা ছিল। তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে পৃথক পৃথক উপাস্য দেবতা থাকিলেও কা'বা শরীফের সম্মান করা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত আরববাসী কা'বা শরীফে হজ্জ সমাধা করিত।

www.nagorikpathagar.org

কুরাইশগণ কা'বার মোতাওয়াল্লী হওয়ায় তাঁহারা আরববাসীদের নিকট ইমাম বা পুরোহিত বলিয়া সম্মানের পাত্র ছিলেন। এতদ্ব্যতীত জ্ঞান-গরিমাতেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার কুরাইশ সম্প্রদায় কর্তৃকই পরিচালিত হইত। আরবের সকল গোত্র সর্ববিষয়ে কুরাইশদের ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিত। কুরাইশদের পক্ষে বৎসরে একবার সমস্ত আরববাসীদের যেয়াফত করা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল, যাহা কুরাইশগণ সানন্দে পালন করিতেন এবং ইহাকে নিজেদের পক্ষে গৌরবজনক বলিয়া মনে করিতেন।

কুরাইশগণ আবার কয়েক দলে বিভক্ত ছিলেন। যে সমস্ত আধিপত্য তাঁহাদের করায়ত্ত ছিল, তাহা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সকলের হাতে বিভক্ত ছিল। কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ গোত্র হাশেমী-বংশীয়গণ এই গণতান্ত্রিক পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কুরাইশদের হাতে নিম্নলিখিত ক্ষমতাসমূহ ছিল—

সেকায়া-হাজ্জ ঃ অর্থাৎ, সমাগত হাজীদিগকে জমজম কূপের পানি পান করিতে দেওয়া। জমজমের পানি নিজের ইচ্ছামত পান করার কাহারও অধিকার ছিল না; এ বিষয়ে সকলকেই কুরাইশদের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইত।

রেফাদাহ ঃ অর্থাৎ, হজ্জের মওসুমে সমস্ত হাজীদের যেয়াফত করা। এই কাজের জন্য সমস্ত আরববাসিগণকে কুরাইশদের নিকট নির্ধারিত ট্যাক্স দিতে হইত। ইহাতে কেবল নির্দোষ উপার্জিত অর্থই দেওয়া হইত।

হেজাবাহ ঃ অর্থাৎ, কা'বা শরীফের চাবি সংরক্ষণ। চাবিধারীর অনুমতি ব্যতীত কেহই কা'বা শরীফ খুলিতে এবং উহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। উপরোক্ত তিনটি ক্ষমতা ধর্মসংক্রান্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে ছিল।

ক্বেয়াদাহ ঃ অর্থাৎ, যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্য পরিচালনার ক্ষমতা। তৎকালে আরববাসীদের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যবাহিনী না থাকিলেও কার্যতঃ আরবের প্রত্যেক যুবকই সিপাহী ছিল। যুদ্ধের আহ্বান শ্রবণ মাত্রই সহস্র সহস্র সুসজ্জিত বীরযুবক নিমেষে আসিয়া উপস্থিত হইত। এই জাতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ কুরাইশগণই ছিলেন।

লেওয়া ঃ অর্থাৎ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-পতাকা কুরাইশগণের হাতেই থাকিত; অন্য কেহই পতাকা ধারণ করিত না।

দারুন্-নাদওয়াহ ঃ ইহা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিষদ-গৃহ ছিল। কোন সময় যুদ্ধ বাধিলে, আভ্যন্তরীণ কোন ঝগড়া-বিবাদ অথবা অন্য ব্যাপার উপস্থিত হইলে এই দারুন-নাদওয়ার মধ্যেই ইহার পরামর্শ ও মীমাংসা হইত। এতদ্ব্যতীত বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কাজও এখানেই সমাধা হইত।

এই কয়েকটি নির্ধারিত পদের মধ্যে 'সেকায়াহ' ও 'রেফাদাহ' হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের হাতে ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গাম্ভীর্য, ধর্মপরায়ণতা, সম্ভ্রম ইত্যাদি গুণের জন্য 'নেয়াবত' বা রাজ্য-সংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপারে কোন রাজা-বাদশাহের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভারও তাঁহার হাতে ন্যস্ত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জন্মকালের কিছুদিন পূর্বে খৃষ্টান রাজ-প্রতিনিধি আবরাহা যে হাতীর ফৌজ লইয়া কা'বা শরীফ ভাঙ্গিতে আসিয়াছিল, সে সময়ও আবদুল মুত্তালিব সমস্ত কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিলেন। ফলকথা, আরব দেশে সেকালে কোন রাজত্ব না থাকিলেও কুরাইশ-বংশের হাতে অনেকটা রাজশক্তির মতই ক্ষমতা ছিল। এই হিসাবে মক্কাকে আরবের রাজধানী এবং কুরাইশগণকে রাজ বংশ বলা যাইতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) আবদুল মুত্তালিব-পুত্র আবদুল্লাহ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাতৃ-উদরে থাকিতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মাতাও শৈশব কালেই পরলোক গমন করেন। পিতামহ আবদুল মুত্তালিব তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু শিশুকাল অতিক্রম না করিতেই তাঁহারও মৃত্যু ঘটে। অতঃপর পিতৃব্য আবু তালিব তাঁহার প্রতিপালন করেন। তৎকালে আরবে লেখাপড়ার একে তো ততটা প্রচলনই ছিল না, তদুপরি আবার হযরত ছিলেন পিতৃ-মাতৃহীন; সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ মোটেই ঘটে নাই। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জীবনে খোদা তা'আলার হয়তো ইহাও দেখান উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রচলিত লেখাপড়া আয়ত্ত করা ভিন্নও খোদাদত্ত এলম দ্বারা জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

হযরত (দঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও প্রাথমিক প্রচারঃ

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নবুওয়ত প্রাপ্ত হন এবং আল্লাহ্র আদেশ মত ইসলামের মূলবাণী তওহীদ—একত্ববাদের শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করেন। আরবের বিশেষ করিয়া মক্কার বহু শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকদের নিকট ইহা অভিনব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। চতুর্দিক হইতে প্রতিবন্ধকতা, বিরুদ্ধতা ও অত্যাচারের তুফান ছুটিল। যে সামান্য কয়েকজন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। কেননা, ঘটনাক্রমে কাহারও মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর রক্ষা ছিল না। তাঁহার উপর এমন অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন হইত যে, তাহা শুনিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এরূপাবস্থায় কাহাকেও বলপূর্বক মুসলমান করানো তো দূরের কথা, খোলাখুলিভাবে জন-সমাজে ইসলামের প্রচার করাও নিজের প্রাণ লইয়া খেলা করার সমতুল্য ছিল। যাহারা ইসলামিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের এমন অবস্থা সামান্য সময়ের জন্যও দেখা দেয় নাই, যাহাতে তাঁহারা ধর্ম প্রচার ব্যাপারে বল প্রয়োগের কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিতেন। আমরা স্পষ্টস্বরে দাবী করিতেছি যে, হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত তের বৎসরের মধ্যে এমন একটি ঘটনাও ঘটে নাই, যাহাতে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগের সামান্য আভাষমাত্র বিদ্যমান থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে এমন শত শত ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে (?) অনেক নিরীহ লোকের প্রাণ দিতে হইয়াছিল। অনেককে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, অনেককে মাতৃভূমির মমতা চিরতরে বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।

এ রকম ভয়ানক আশঙ্কা ও বিপদের ভিতর দিয়াও সত্যের আলো ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভিতরে ভিতরে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিজেদের জান-মাল বিপন্ন করিয়া ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইতেছিলেন। অনেক দীন-দুঃখীর ঘরে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে এই সময়েই ইসলামের আলো প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত লোক নিজেদের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা শুধু ইসলাম জগতে নহে; বরং সমগ্র সভ্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যাহারা উত্তরকালে সমগ্র মুসলিম জাহানের তথা অর্ধ পৃথিবীর মালিক হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এই বিপদসঙ্কুল সময়ে মুসলমান হইয়াছিলেন। এক কথায় এই অসহায় অবস্থাই ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার পক্ষে সহায় হইয়াছিল। এই সময়ে মক্কার ঘরে ঘরে ইসলামের আলোক পৌঁছিয়াছিল। মক্কার বাহিরেও অনেক স্থানের বহু লোক এই সময় মুসলমান হইয়াছিলেন। এমন নিঃসহায় এবং

www.nagorikpathagar.org

উপলক্ষবিহীন অবস্থায়ও ইসলাম প্রচার কার্য এত দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হওয়াকে অলৌকিক ব্যাপার না বলিয়া আর কি বলা চলে? যাঁহারা বল প্রয়োগে ইসলাম প্রচারের অলীক কথা বলেন,তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এই সকল বল প্রয়োগের কোন্ উপকরণ মুসলমানদের নিকট ছিল?

বস্তুতঃ ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগের ঘটনা তো একটিও পাওয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণে বাধা দানের ঘটনা যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, তবে পৃথক একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। উপমাস্বরূপ হযরত বিলালের ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি এক পৌত্তলিকের গোলাম ছিলেন। ইসলামের সত্যতা বুঝিতে পারিয়া স্ব-ইচ্ছায় তিনি মুসলমান হইলেন। তাঁহার প্রভু এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রজ্জু-বদ্ধ অবস্থায় প্রহার করিতে লাগিল; গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া চলিল। বুকে পাথর দিয়া মরুভূমিতে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর ফেলিয়া রাখিল! মানুষের দ্বারা যত রকম অত্যাচার সম্ভবপর হইতে পারে, সমস্তই তাঁহার উপর করা হইল। কিন্তু সত্যের আকর্ষণ, ঈমানের মমতা তাঁহাকে এমনই বিভোর করিয়া দিয়াছিল যে, কোন কিছুতেই তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইলেন না। তাঁহার বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও টলিল না। যখনই তাঁহাকে ইসলাম বর্জনের জন্য উৎপীড়ন করা হইত, তখনই তিনি বলিতেন, আমাকে মারিয়া ফেলুন, কিন্তু আমি ঈমানের যে আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

একদিন মহানুভব আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কোন কার্যোপলক্ষে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন; দেখেন কি—বিলাল পাথর চাপা অবস্থায় উত্তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত; মুখে ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হইতেছে—"আহাদুন, আহাদুন।" অর্থাৎ, এক উপাস্য ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। এই নিদারুণ অবস্থা দৃষ্টে হযরত সিদ্দীকের অন্তরে করুণার উদ্রেক হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি হযরত বিলালকে তাঁহার প্রভু হইতে খরিদ করিয়া মুক্তি দিলেন। এই রকম ঘটনা একটি দুইটি নহে। স্বয়ং হযরত আবু বকরই এ রকম আরো কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে যালেমের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্বপ্রথম মুসলমান—হযরত খাদিজা (রাঃ)ঃ

আমরা এক্ষণে প্রথমাবস্থায় কিভাবে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, উহার দুই একটি নমুনা পেশ করিব। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, একথায় সামান্য মতভেদ থাকিলেও শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিকদের মতে উম্মুল মু'মিনীন বিবি খাদিজা (রাঃ)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপার হইতে যতদূর সম্ভব ইসলাম প্রচারের আদর্শ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

বিবি খাদিজা (রাঃ) আরবের প্রসিদ্ধ কুলশীলা সতী-সাধ্বী ও ধনবতী বিধবা রমণী ছিলেন। তিনি লোক মারফতে সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে বেপার তেজারতের মাল পাঠাইতেন। লোকমুখে তিনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সত্যবাদিতার খ্যাতি শুনিয়া ব্যবসায়ের কাজের সাহায্যের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্মত হইলে ব্যবসায়ের মালসহ তাঁহাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন। খাজিমা নামক বিবি খাদিজার জনৈক আত্মীয় এবং মায়সারাহ নামক গোলামও হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে চলিল। তাঁহারা সওদাগরদের কাফেলার সঙ্গে বুসরা নগরে উপস্থিত হইলেন।

৩—

www.nagorikpathagar.org

সেকালে বুসরায় অনেক খৃষ্টান পাদরী বাস করিতেন। নাসতুরা নামক এক প্রসিদ্ধ পাদরীর গীর্জার নিকট কাফেলা বিশ্রাম মানসে অবতরণ করিলে হযরত (দঃ) একটি পুরাতন বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। পাদরী নাসতুরা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে আর কেহ এই গাছের মূলে বসে নাই এবং আমাদের কিতাবে লিখিত আছে যে, পয়গম্বর ব্যতীত আর কেহ এখানে বসিতে পারিবে না। কিছুদিন যাবৎ বৃক্ষটি ফল ও পল্লববিহীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সকলেই দেখিল, হযরত (দঃ)-এর উপবেশনের পর হইতেই উহাতে নূতন পল্লব ও ফল-ফুল দেখা দিয়াছে।"—মাদারেজুন্নবুওয়ত

নাসতুরার হাতে একটি কিতাব ছিল; তিনি বারংবার কিতাবের দিকে এবং হযরত (দঃ)-এর দিকে দেখিতেছিলেন। পরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই ইনি সেই শেষ নবী, যাঁহার সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।"

এতদপূর্বেও হযরত (দঃ) তাঁহার চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসায়ের কাজে দূরদেশে গিয়াছিলেন এবং একই রকমের ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্মযাজকগণ আবু তালিবকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, শাম দেশে তাঁহার অনেক দুশমন আছে; হয়তো তাহারা তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। তাঁহাকে লইয়া সেখানে গমন করা কখনও সঙ্গত নহে। এখনও অনুরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় সঙ্গীরা সকলেই ভয় পাইল এবং সেখানেই ব্যবসায়ের মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিল। খোদার অনুগ্রহে ইহাতে তাহারা আশাতীত পরিমাণে লাভবান হইয়া ফিরিয়া আসিল। হযরত (দঃ)-এর সত্যবাদিতা, সরলতা এবং অলৌকিক ঘটনাবলী দৃষ্টে বিবি খাদিজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ-প্রস্তাব করিলেন এবং আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

হযরত (দঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির কিছুকাল পূর্ব হইতেই মক্কার নিকটবর্তী হেরা নামক পর্বতের নির্জন গহবরে অনেক সময় ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এমনি একদিন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশসহ জিবরায়ীল ফেরেশতা তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইলেন—তিনি নবুওয়ত প্রাপ্ত হইলেন। সূক্ষ্মদেহী জ্যোতির্ময় ফেরেশতার সাহচর্য এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশরূপ গুরুভার বহন করা সাধারণ ব্যাপার নহে। মানবোচিত ভয়-বিহ্বলতা উপস্থিত হইয়া মহাপুরুষের শরীর কন্টকিত ও আড়ষ্ট হইয়া গেল। তিনি কম্পিতদেহে বিবি খাদিজা সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"আমার গায়ে চাদর ঢাকা দাও!"

হযরত (দঃ) কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট গারে-হেরায় জিবরায়ীল ফেরেশতার আগমন এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ জ্ঞাপনের ঘটনা আমূল বিবৃত করিলেন। বিবি খাদিজা ঘটনা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আল্লাহ্ তা'আলা কখনও আপনাকে বিনষ্ট করিবেন না। কেননা, (আপনি তো কখনও কোন খারাপ কাজ করেন না) আপনি আত্মীয়ের প্রতি আত্মীয়তা রক্ষা করেন, সদা সত্য কথা বলেন, অক্ষম লোকের ভার বহন করেন, বিপদগ্রস্তের সহায়তা করেন।" —বোখারী, মুসলিম

হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর এক প্রবীণ বয়সী পিতৃব্যপুত্র ওরাকা ইবনে নওফেল খৃষ্ট-ধর্মের বিশেষজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি ইন্‌জীল কিতাব অধ্যয়ন ও সূক্ষ্ম সমালোচনা করার পর একেশ্বরবাদের মূলমন্ত্রসহ খৃষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। বিবি খাদিজা প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লইয়া ওরাকার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং

www.nagorikpathagar.org

সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ওরাকা হযরত (দঃ)-এর নিকট সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—

"নিশ্চয়ই তিনি সেই 'নামুস' (ফেরেশতা) যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আপনাকে এই সুসংবাদ দিতেছি যে, আপনি খোদার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত ঈসা (আঃ) আপনার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, আমার পরে এক পয়গম্বর হইবেন, তাঁহার নাম হইবে 'আহ্‌মদ'। অতি নিকটবর্তী সময়ে আপনার প্রতি বিধর্মীর সঙ্গে জেহাদের আদেশ হইবে। হায়! যে সময় আপনাকে স্বীয় জন্মভূমি হইতে বহির্গত করা হইবে, সে সময় আমি জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য করিতাম।"

এতদশ্রবণে হযরত (দঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে কি আমার দেশবাসী বিতাড়িত করিবে?" ওরাকা বলিলেন, "একা আপনিই কেন? যাঁহারাই আপনার ন্যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হেদায়ত লইয়া আসেন, ধর্মদ্রোহিগণ তাঁহাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে। আমি যদি জীবিত থাকি, তবে বিপদকালে নিশ্চয়ই আপনার সহায় হইব।"

ইহাই ইসলামের প্রাথমিক আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের মাতা হযরত খাদিজাতুল কোব্‌রা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মুখে তাহা শুনিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান। সর্বপ্রথম মুসলমান কে, এ বিষয়ে সাধারণ রকমের মতভেদ থাকিলেও আমরা মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহ্‌লবী (রঃ)-এর মতবাদের উপরেই নির্ভর করিতেছি। তিনি বলেন—

"অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত—ঈমান আনয়ন ব্যাপারে সর্বতোভাবে প্রথম স্থান মু'মিনকুল জননী বিবি খাদিজার। কারণ, হযরত (দঃ) হেরা পর্বতগুহা হইতে আসিয়া 'ওহী' অবতীর্ণ হওয়ার খবর প্রদান মাত্রই তিনি বিশ্বাস স্থাপন ও স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। অধিকন্তু হযরত (দঃ)-এর সত্যবাদিতার সপক্ষে যুক্তিতর্ক আনয়ন করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

আমরা প্রথমে বলিয়াছি, ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কতিপয় ঘটনার উল্লেখ দ্বারা আমাদের দাবীর পোষকতা করাই আসল উদ্দেশ্য। এক্ষণে এই ঘটনায় ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কয়েকটি কথা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই লিখিত হইতেছে।

কতিপয় সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ

প্রথম ঃ নাসতুরা নামক পাদরীর সঙ্গে হযরত (দঃ)-এর সাক্ষাৎকারের ঘটনা নির্ভরযোগ্য বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে। এই ঘটনার সময় হযরত (দঃ) নবুওয়ত প্রাপ্ত হন নাই। এ রকম কোন আলোচনাও সে সময় মক্কায় প্রচারিত হয় নাই। এরূপাবস্থায় নাসতুরার পক্ষে কোন পুরাতন গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টে তাঁহার নবুওয়ত সম্বন্ধে অবগত হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। বিশেষতঃ নাসতুরা নিজেও স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনবার্তা ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই সে নবী। নাসতুরার হস্তস্থিথ কিতাবের মধ্যে জগতের শেষ নবীর আকৃতি-প্রকৃতি লিপিবদ্ধ ছিল। সে সমস্ত চাক্ষুষভাবে হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াই যে তিনি হযরত (দঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি সম্পর্কে দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই ঘটনা দ্বারা তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ এই একই রকমের ঘটনা একাধিক বার ঘটাতে একথা আরও পরিষ্কার হইয়া পড়ে যে, হযরত (দঃ)-এর আগমন ও প্রেরিতত্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খৃষ্টান জগতের বিদ্বান সমাজে

www.nagorikpathagar.org

খুবই প্রচলিত। ইহাতে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের সত্যতার উপর আলোকপাত হইতেছে, অপরদিকে তেমনি জানা যাইতেছে যে, এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইসলাম প্রচার ব্যাপারে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল।

জগতের সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলা বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর ঈমান আনয়ন ব্যাপারে ওরাকার পূর্বলব্ধ জ্ঞান যে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। ওরাকাও যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বার্তা হইতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়তের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইসা (আঃ)-এর পর আর কোন পয়গম্বরের সন্ধান না পাইয়া নাসারা ধর্মে অভিজ্ঞ ও সত্যান্বেষী আলেমগণ শেষ নবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর হযরত (দঃ)-এর আগমন সংবাদ যখন সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তখন খৃষ্টজগতের সত্যকামী সম্প্রদায়ের অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ উৎপন্ন হওয়া কোনই আশ্চর্যের বিষয় নহে। আরবের লোকেরাও ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিত। এরূপাবস্থায় খৃষ্টানদের সঙ্গে তাহাদের ভাবের আদান-প্রদান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং আরবের লোকেরাও যে এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাত ছিল না, একথা বলা চলে না; বিশেষরূপে যখন আরবের ভিতরেও খৃষ্ট-ধর্মের অনেক লোক অবস্থিত ছিল।

দ্বিতীয়ঃ জীবনচরিতের দুইটি অংশ আছে—সামাজিক এবং পারিবারিক। মানুষের সামাজিক জীবন সকলেরই গোচরীভূত হয়, কিন্তু পারিবারিক জীবনের কথা কেবল এমন লোকেরাই জানিতে পারে, যাহারা তাহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। জীবনের এই অংশটা পত্নী যেরূপ অবগত হইতে পারে, অন্যেরা তেমন পারে না। বিশেষরূপে স্ত্রী বুদ্ধিমতী হইলে, স্বামী-চরিত্রের প্রত্যেক স্তর তাহার নিকট উত্তমরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কপট ধোঁকাবাজ লোকেরা সামাজিক জীবন হয়তো বাহ্যদৃষ্টিতে নির্দোষ দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহার পারিবারিক জীবনের দোষগুণ গোপন থাকিতে পারে না। এজন্য এমন লোক নিজের দোষসমূহ লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরের লোকের ভক্তি অর্জন করিতে পারিলেও স্ত্রীর নিকট তাহার শঠতা কখনও চাপা থাকিতে পারে না।

বিবি খাদিজা (রাঃ) আরব দেশে স্বনাম-ধন্যা সচ্চরিত্রা ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। এজন্যই তাঁহার বৈধব্যকালে আরবের প্রসিদ্ধ, সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) বিবাহের পূর্বেই হযরত (দঃ)-এর চরিত্র-মাধুর্য অবগত হইয়াছিলেন এবং বিবাহের পর তাঁহার পুণ্যময় জীবনের উভয় অংশ সম্যক অবগত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের গুরুত্ব যতখানি, অন্য কাহারও মুসলমান হওয়াতে ততখানি থাকিতে পারে না। বিবি খাদিজা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সত্যবাদিতা ও ধর্মনিষ্ঠার প্রতি এতই আস্থাবতী ছিলেন যে, হযরত (দঃ)-এর পবিত্র মুখে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশসহ ফেরেশতার আগমনবার্তা শ্রবণ মাত্রই পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেনঃ আপনার কার্যকলাপের কোথাও যখন এতখানি খুঁৎ নাই, আপনার সকল কাজেই যখন সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বিনষ্ট করিতে পারেন না। বিবি খাদিজার এই উক্তিতে একদিকে যেমন মুস্তফা-চরিতের আভ্যন্তরীণ অংশ দিবাকরসম সুপ্রকটিত হইয়া পড়িতেছে, তদ্রূপ অন্য দিকে দেদীপ্যমান হইতেছে যে, মহানবীর বিশ্বজনীন মানবতা ও চরিত্র মাধুর্য সর্বপ্রথম মুসলিম রমণীর ইসলাম গ্রহণের প্রধানতম কারণ

www.nagorikpathagar.org

ছিল। অবশ্য ওরাকা ইবনে নওফেলের বাক্য তাঁহার বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করণে সাহায্য করিয়াছিল। সর্বাবস্থায়ই একথা স্থিরনিশ্চিত যে, মুসলিম-কুলজননী খাদিজাতুল কোব্‌রার ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ অথবা অন্য কোন প্রকার প্ররোচনার সন্দেহ করিতে যাওয়া কখনও সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না।

তৃতীয়ঃ আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে আরও সম্প্রসারিত করিলে হযরত (দঃ)-এর বৈবাহিক জীবনের একটি নিগূঢ়তম উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়া পড়িবে। হযরত (দঃ)-এর বহু বিবাহ সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ বিধর্মী লেখকগণ যে কটাক্ষপাত করার চেষ্টা করে, বর্তমান অধ্যায় পাঠে সেই দোষারোপের মূলোচ্ছেদ হইয়া তাহাতে এক নব আলোক সম্পাত হইতেছে দেখিতে পাইবেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) যেমন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রথম জীবনের প্রথমাংশের পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন, তদ্রূপ অন্যান্য পত্নিগণও তাঁহার শেষ জীবনের পবিত্রতার প্রমাণ দিতেছেন। এ রকম না হইলে হযরত (দঃ)-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে শত্রুপক্ষের অশোভন আলোচনার পথ থাকিয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত হযরত (দঃ)-এর পারিবারিক জীবনের এমন অনেক ঘটনা আছে, যাহা কেবল তাঁহার সহধর্মিণীদের মধ্যস্থতায়ই আমরা অবগত হইয়া তাঁহার আদর্শ পালনের সুযোগ পাইতেছি। হযরত (দঃ)-এর সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কার্যকলাপ তাঁহার হাজার হাজার সহচরবৃন্দ প্রত্যক্ষকরত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহার পারিবারিক জীবনের লোকচক্ষুর অগোচরাংশ বর্ণনা করার জন্যও বহুসংখ্যক বর্ণনাকারীর আবশ্যক ছিল। তদস্থলে তিনি কেবল কতিপয় সংখ্যক মেধাবতী ছাত্রী তথা সহধর্মিণীর উপর এই কাজের ভার অর্পণ করিয়াছেন। সতী-সাধ্বী খাদিজা (রাঃ) নিজে ইসলাম গ্রহণ করিয়া এবং নবী-চরিতের প্রথম দিককার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তৎসঙ্গে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক সঙ্কটময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতি তাঁহার আর্থিক সাহায্যের কথা সর্বজন বিদিত।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার কায়িক সাহায্যের স্থানও বহু উচ্চে স্থাপিত। হযরত (দঃ)-এর প্রচার-জীবনের শেষাংশের প্রতি দৃকপাত করিতে গেলে মুসলিমকুলের অন্যতম জননী হযরত আয়েশার অনুপম দান প্রথমেই চক্ষে পড়ে। শেষ জীবনেই হযরত (দঃ) ইসলামের অধিকাংশ বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষা দিয়াছেন। শেষ জীবনের পারিবারিক স্তরের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এমন কি সামাজিক জীবনেরও কতকাংশ হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃকই বর্ণিত ও প্রচারিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের আচার-ব্যবহার, পাকী, নাপাকী ইত্যাদি ব্যাপারের বিধি-ব্যবস্থা, কেবল নবী-পত্নিগণই ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বহু বিবাহ ইসলাম প্রচারের একটা বিশেষ সহায়রূপে গণ্য।

এই প্রসঙ্গ খানিকটা লম্বা হইয়া পড়িলেও ইহাতে আমরা কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্বের আভাষ দিতে পারিয়াছি। এক্ষণে পুনরায় মূল বক্তব্য ধারাবাহিকরূপে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারঃ

প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর তিন বৎসর পর্যন্ত হযরত (দঃ)-এর প্রতি খোলাখুলিভাবে ইসলাম প্রচারের আদেশ হয় নাই। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পায় নাই। এই সময়ে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাধারণ্যে

ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। ইসলামের মূলমন্ত্র হইল—তওহীদ ও রেসালত। তওহীদের সংজ্ঞা মতে যাবতীয় দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা পরিত্যাগপূর্বক এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তওহীদ প্রচারের সাথে সাথে প্রতিমা-পূজার অসারতা সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে কুরাইশদের মধ্যে অতিশয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাহারা প্রথমে হযরত (দঃ)-কে প্রলোভন দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল। ইহা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া আবু তালিবের নিকট অভিযোগ করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হযরত (দঃ) ইসলাম প্রচারে বিরত হইলেন না। অতঃপর তাহারা হযরত (দঃ)-এর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। যাহারা ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া বৃথা কালক্ষয় করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—তাঁহারা যেন ইসলাম-প্রচারে বাধাদানের এই অমানুষিক চেষ্টার অধ্যায়গুলি পাঠ করিয়া নিজেদের ভ্রম বিদূরিত করেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "একদিন কা'বা শরীফের প্রাঙ্গণে আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় ওকবা নামক এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত (দঃ)-এর গ্রীবাদেশে কাপড় জড়াইয়া টানিতে আরম্ভ করিল। উহাতে গলায় ফাঁসি লাগিয়া তাঁহার দম আটকাইবার উপক্রম হইল। ঘটনাক্রমে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সেই পথ অতিক্রমকালে এই নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া পাপিষ্ঠের হাত হইতে হযরত (দঃ)-কে মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে বধ করিতে চাও, যিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক?"

আর একবারের ঘটনা—হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কা'বাগৃহে নামায পড়িতেছিলেন। সে সময় কুরাইশ দলের কয়েক ব্যক্তি অদূরে বসিয়া গল্পগুজবে রত ছিল। তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "দেখ, এই লোকটি সাধুতার ভান করিতেছে। তোমাদের কেহ কি সদ্য যবাহ করা একটি উটের অন্ত্র তাহার উপর ফেলিয়া দিতে পার?" এক পাপাত্মা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিল। ঘটনাক্রমে সেই দিনই একটি উট যবাহ করা হইয়াছিল। সে উহার আঁতুড়ি আনিয়া সজদার সময় হযরতের ঘাড়ের উপর ফেলিয়া দিল। হযরত (দঃ) এই ভারী বোঝা ঠেলিয়া মাথা তুলিতে পারিলেন না। দুষ্টেরা ইহা দেখিয়া বেশ কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল। বিবি ফাতেমা (রাঃ) এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং অন্ত্রটি ঠেলিয়া ফেলিয়া হযরতকে তুলিয়া দিলেন। —বোখারী

ক্রমে কাফেরদের অত্যাচার চরমে উঠিল। মুসলমানদের পক্ষে জীবনযাপন করা অসহ্য হইয়া পড়িল। তাহারা প্রকাশ্যভাবে নামায পড়িতে পারিতেন না, কোরআন তেলাওয়াত করিতে পারিতেন না; এক কথায় ইসলামের এই ক্ষীণ প্রদীপটি নির্বাপিত করার নিমিত্ত চতুর্দিক হইতে অত্যাচারের ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু সত্যের আলো নিভিবার নহে। শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ইসলামের আলো পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এভাবে দিন দিন মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কার সাধ্য সত্যের আলো নির্বাপিত করিতে পারে।

হাবশা রাজ্যে হিজরত ঃ

কাফেরদের অত্যাচারে মুষ্টিমেয় মুসলমানের পক্ষে মক্কায় বসবাস এবং ধর্ম পালন অসম্ভব হইয়া পড়িলে আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) তাঁহাদিগকে মক্কা ছাড়িয়া হিজরত বা স্থানান্তরে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) এই সময় নাজ্জাশী নামক এক খৃষ্টান বাদশাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। চতুর্দিকে তাঁহার ন্যায়বিচার ও দয়া-ধর্মের সুখ্যাতি পরিব্যাপ্ত ছিল। মুসলমানগণ

www.nagorikpathagar.org

অগত্যা হাবশায় গমনই সাব্যস্ত করিলেন। নাজ্জাশী খৃষ্টান হইলেও বিদেশাগত মুসলমান মোহাজেরদিগকে সযত্নে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে বিদ্বেষপরায়ণ কুরাইশগণ যখন জানিতে পারিল, মুসলমানগণ হাবশায় যাইয়া নাজ্জাশীর আশ্রয়ে বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতেছে, তখন তাহাদের হিংসানল শত শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের পারস্পরিক পরামর্শের পর আমর ইবনে আস এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি উমাইয়াকে হাবশায় পাঠান হইল। তাহাদের সঙ্গে নাজ্জাশী ও তাঁহার পরিষদগণের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকনাদি পাঠাইতেও ত্রুটি হইল না। তাহারা হাবশায় উপস্থিত হইয়া রাজপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অভিযোগ জানাইল যে, আমাদের দেশের কয়েকজন নির্বোধ লোক পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা আপনাদের দেশে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা এখানেও অনাচার সৃষ্টি করিতে পারে। অতএব, আমাদের অনুরোধ, বাদশাহের নিকট বলিয়া তাহাদিগকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। আমরা তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া গিয়া শায়েস্তা করিব।

অনন্তর দরবারীদের সাহায্যে কুরাইশ প্রতিনিধিগণ নাজ্জাশী সমীপে উপস্থিত হইয়া বিবৃতি দিল। দরবারিগণও ইহা সমর্থন করিল যে, এই সমস্ত অপরাধীদিগকে কুরাইশ প্রতিনিধিদের হাতে সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। নাজ্জাশী বলিলেন, "তাহারা আমার নিকট আশ্রিত অতিথি; সুতরাং তাহাদের কৈফিয়ত না শুনিয়া কিছুতেই আমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব না।"

নাজ্জাশী খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমানদের ভয় ছিল, হয়তো তিনি তাহাদিগকে কুরাইশদের হাতে সমর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু পরামর্শের পর তাঁহারা একথাই ঠিক করিলেন যে, তাঁহারা পরিষ্কারভাবে সত্য কথাই বলিবেন; পরিণাম যাহাই হয়—হইবে। সর্বসম্মতিক্রমে হযরত জা'ফর (রাঃ) কথাবার্তা বলার জন্য নির্বাচিত হইলেন।

নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা নিজেদের পুরাতন ধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথচ আমাদের খৃষ্টধর্মও গ্রহণ করিলে না ইহার কারণ কি? তোমরা যে নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা কিরূপ?' হযরত জা'ফর (রাঃ) তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন, "আমরা পুতুল পূজা করিতাম এবং এমন কোন পাপকর্ম ছিল না, যাহা আমরা করিতাম না। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের হেদায়তের জন্য এক রাসূল পাঠাইয়া দিয়াছেন, যিনি বংশমর্যাদায় আমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সত্যবাদিতা, ধর্মনিষ্ঠা এবং আমানতদারী আমাদের সকলেরই ভালভাবে জানা আছে। তিনি আমাদিগকে তওহীদের শিক্ষা দিয়াছেন, অংশীবাদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার, হারাম কাজ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং লোকের ধন-প্রাণ সংরক্ষণ করার উপদেশ দিয়াছেন। তৎসঙ্গে এক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামায ও রোযা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা সেই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা কখনও বিবাদ করিতে চাহি না; কিন্তু তাহারাই জোর-জবরদস্তী আমাদিগকে ধর্মত্যাগী করিতে চাহে। তাহাদের অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমাদের একান্ত আশা, এখানে আমাদের প্রতি কোন অবিচার হইবে না।"

নাজ্জাশী বলিলেন, 'তোমাদের নবীর উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার কিছু অংশ তোমার স্মরণ থাকিলে পড়িয়া শুনাও।' হযরত জা'ফর (রাঃ) সূরা-মরইয়মের প্রথমাংশের কয়েকটি আয়াত পাঠ করিলেন। কোরআন পাকের মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবি মরইয়ম ও হযরত ঈসা (আঃ)

www.nagorikpathagar.org

-এর বর্ণনা শুনিয়া বাদশাহ্ এবং সভাস্থ লোকদের চক্ষে অশ্রু-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল, তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ বলিলেন, "নিশ্চয়ই এই কালাম এবং যাহা ঈসা (আঃ) আনয়ন করিয়াছেন, একই আলোকাধার হইতে বাহির হইয়াছে।" —জম্উল-ফাওয়ায়েদ

অনন্তর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমার বুঝিতে বাকী নাই যে, আশ্রয়প্রার্থী লোকগণ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিছুতেই আমি এই আশ্রিত অতিথিদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব না। তোমরা এখন যাইতে পার।"

দরবার হইতে বাহির হইয়া আমর ইবনে আস বলিতে লাগিল, "আগামীকল্য আমরা বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট এমন কথা বলিব, যাহা শুনিয়া নিশ্চয়ই তিনি মুসলমানদিগকে বাহির করিয়া দিবেন।"

পরদিন আমর, নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হুযূর! মুসলমানগণ হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে অত্যন্ত খারাপ উক্তি করিয়া থাকে।" একথা শুনিয়া নাজ্জাশী হযরত জা'ফর (রাঃ)-কে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "আমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে কোন খারাপ কথাই বলি না; আমাদের পয়গম্বর যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই বলিয়া থাকি।"

নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা কিরূপ?" জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, "আমাদের নবী শিক্ষা দিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে 'রূহুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র সৃষ্ট রূহ) এবং 'কলেমাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র কলেমা বা শব্দ) উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে চিরকুমারী সতী মরইয়মের উদরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর রূহকে স্থাপন করিয়াছেন এবং পিতা ভিন্ন তাঁহাকে পয়দা করিয়া স্বীয় অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।"

নাজ্জাশী শুনিয়া কহিলেন, "ইহা তো কোনই দোষের কথা নহে; হযরত ঈসা (আঃ) নিজেও তো এইরূপই বলিয়াছেন।" নাজ্জাশীর কথা শুনিয়া খৃষ্টান সদস্যবৃন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। নাজ্জাশী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যদিও তোমাদের নিকট ইহা রুচিকর হয় নাই, কিন্তু ইহাই সত্য কথা।" তৎপর তিনি মুসলমানদিগকে বলিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে এখানে থাক; সোনার পাহাড়ও যদি আমাকে দেওয়া হয়, তবুও আমি তোমাদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করাকে পছন্দ করিব না।" এই বলিয়া তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিগণকে ফিরাইয়া দিলেন। বলাবাহুল্য, কুরাইশগণ যে সমস্ত উপহারদ্রব্য লইয়া আসিয়াছিল, নাজ্জাশী উহার এক কপর্দকও গ্রহণ করিলেন না।

কুরাইশ প্রতিনিধিগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে মুসলমানগণ নিরাপদে হাবশায় বাস করিতে লাগিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মদীনা শরীফে হিজরত করার পর তাঁহারাও তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

হযরত জা'ফরের বাক্যালাপ শুনিয়া নাজ্জাশীর অন্তঃকরণে ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রাথমিক আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে মুসলমানদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া এবং ইসলাম ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর অবস্থা সম্যক জানিতে পারিয়া তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

আমরা এ রকম সময়ের অবস্থা লিখিতেছি, যখন নাজ্জাশীর মত পরাক্রান্ত বাদশাহের উপর তো দূরের কথা, কোন সাধারণ লোকের উপরে বল প্রয়োগের ক্ষমতাও মুসলমানদের ছিল না। এমন কি তখন তাহাদের নিজেদের জীবন বাঁচান এবং ধর্ম পালনও কষ্টকর ছিল। সুতরাং ইহা

www.nagorikpathagar.org

বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, একমাত্র ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও আকর্ষণই হযরত নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কারণ হইয়াছিল। ইসলাম গ্রহণে তাঁহার কোন জাগতিক স্বার্থ ছিল এমন কল্পনা করাও চলে না। কেননা, মুসলমানদের নিকট জাগতিক স্বার্থের কোন উপকরণই তখন ছিল না। এদিকে তাঁহার সমস্ত প্রজা এবং রাজকর্মচারীই ছিল খৃষ্টান; সুতরাং ইসলাম গ্রহণ তাঁহার পক্ষে কত বিপজ্জনক ছিল, একথা সহজেই অনুমান করা চলে। নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ এবং তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী হইতে আমরা ইসলাম প্রচারের আদর্শ জানিতে পারিলাম। তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহের সন্ধানও আমরা উক্ত ঘটনায় পাইতে পারি।

কতিপয় সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ

প্রথম ঃ কুরাইশ প্রতিনিধিবৃন্দের অভিযোগের পর মুসলিম প্রবাসিগণ নাজ্জাশীর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের যে স্পষ্টভাষিতা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, উহার তুলনা অন্যত্র বিরল। তাঁহারা প্রাণের ভয়ে মাতৃভূমি ছাড়িয়া দূরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে তাঁহাদের পক্ষে দু'কথা বলিবার মত একটি লোকও নাই। ওদিকে আবার পিছনে পিছনে শত্রুরাও আসিয়া উপস্থিত। কখন কোন্ বিপদ আসে বলা যায় না। কিন্তু এমন অবস্থায়ও তাঁহাদের সামান্যমাত্র লুকোচুরি নাই; যাহা সত্য তাহাই নির্ভয়ে অকপটে বলিয়া দিতেছেন। ভাবিবার বিষয়, আরবের দুর্মদ বেদুইন জাতির মধ্যে এ রকম গুণাবলীর সমাবেশ এত অল্প সময়ে কোথা হইতে হইল? ইহা কি ইসলামের অনুপম মাহাত্ম্যের পরিচায়ক নহে? মাত্র কয়েকজন নও-মুসলিম বিধর্মী রাজদরবারে নিজেদের কথাবার্তা আচার ব্যবহার ও ধর্মপরায়ণতার নির্মল আদর্শ দেখাইয়া স্বয়ং রাজাকে স্বধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হন এবং পরিণামে তাঁহাকে ধর্মান্তর গ্রহণে রত করেন, ইহা কি ইসলাম প্রচারের একটা নির্দোষ ও নিখুঁৎ আদর্শ নহে? এই নও-মুসলমানদের অকপট ও অহিংসা প্রচার-নীতিতে যতখানি ক্ষমতা ছিল, তরবারিতে অথবা বলপ্রয়োগে কি তাহা সম্ভবপর হইতে পারিত?

দ্বিতীয় ঃ মক্কা শরীফে জীবন বিপদাপন্ন দেখিয়া মুসলমানগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অনুমতিক্রমে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয়ই কার্যোদ্ধার ও বিপদ নিবারণের উদ্দেশ্যে বাহ্যিক উপলক্ষ্য গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত। মানুষের জীবন-মরণ ভালমন্দ, সমস্তই যে তকদীরের লেখা ও খোদা তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, মুসলমান মাত্রই তাহাতে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ "কোন ব্যক্তিই মু'মিন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; যে পর্যন্ত সে চারিটি জিনিসের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না করেঃ (১) একথার স্বীকারোক্তি করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, (২) আমি আল্লাহ্র রাসূল—আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন, (৩) মৃত্যুর প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস করে এবং (৪) তকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে।" —তিরমিযী শরীফ

তকদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের একটা বিশেষ অংশ, কিন্তু ইহার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। অধুনা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; এক শ্রেণী তকদীরের প্রতি বিশ্বাস তো করিতেই চাহে না, অধিকন্তু তকদীরের বিশ্বাসকে নিশ্চেষ্টতার ও অলসতার কারণ বলিয়া মনে করে। আর এক শ্রেণী অবশ্য তকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে, কিন্তু তকদীরের সঙ্গে তদবীরকে একত্রিত করার উপায় তাহারা খুঁজিয়া পায় না। তাহারা মনে করে যে, তদবীর বর্জন না করিলে তকদীরের প্রতি বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না। এই দুই দলের ধারণাই ভ্রান্তিমূলক। তকদীরের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসও পূর্ণ মাত্রায় রাখিতে হইবে, অথচ অবস্থাবিশেষে তদবীরও করিতে হইবে—ইহাই ইসলামের বিধান। দেখুন, আল্লাহ্‌র রাসূল একদিকে তকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখার তাকীদ করিয়া বলিতেছেন যে, এই বিশ্বাসে শিথিলতা আসিলে মু'মিন সমাজ হইতেই বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে; অপরদিকে তিনিই আবার নিজের সহচরগণকে প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা কল্পে মক্কা হইতে হাবশায় পাঠাইয়া দিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, ব্যবসায় বাণিজ্য, কাজ-কারবার ইত্যাদি জীবন ধারণের যাবতীয় উপলক্ষ্য গ্রহণ করারও তিনি উপদেশ দিতেছেন। হযরত (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের কার্যকলাপ দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, তকদীর-বাদের কারণে কর্তব্যকর্মে শৈথিল্য আসার ধারণা নিতান্ত অমূলক। ধীর হৃদয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায়, তকদীর-বাদে মানসিক শৈথিল্যের পরিবর্তে দৃঢ়তা, সাহসিকতা এবং তৎপরতাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাহাবাদের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, একদিকে যেমন হযরত জা'ফর ভিন্নধর্মীয় রাজদরবারে নির্ভীক হৃদয়ে নিজেদের ধর্মমত যথাযথ ব্যক্ত করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি হযরত বিলাল হাবশী বুকে-চাপা পাথরকে অগ্রাহ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "আহাদ, আহাদ—।" সর্বশক্তিমান খোদার নির্দেশ মতেই সকল কাজ হয়, এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে এক খোদা ভিন্ন অন্য কিছুর ভয়ই তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইত না। এই বিশ্বাসের বলেই তাঁহারা একাকী শত শত শত্রুর ভিতরে প্রবেশ করিতেও সামান্যমাত্র শঙ্কা বোধ করিতেন না। মুসলমানদের উন্নতির যুগে তাঁহারা যে অভাবনীয় বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তকদীরের প্রতি বিশ্বাসই ছিল ইহার মূল সহায়।

আমরা বলিয়াছি, তকদীরের প্রতি নির্ভর করিয়া তদবীর পরিত্যাগ করা যায় না। এমন কি অবস্থাবিশেষে তদবীর ছাড়িয়া দেওয়া হারামও হইয়া থাকে। তকদীরের দোহাই দিয়া পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া অথবা এবাদত বন্দেগী এবং শরীঅত-সঙ্গত কর্তব্য কাজ ছাড়িয়া দেওয়া নিঃসন্দেহে হারাম। অবশ্য কেহ হয়তো বলিতে পারেন, যখন বেহেশতীদের বেহেশতী হওয়ার কথা এবং দোযখীদের দোযখী হওয়ার কথা প্রথমেই অদৃষ্ট-লিপিতে লিখা রহিয়াছে, তবে আর চেষ্টা করিয়া কি ফল হইবে? হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তকদীরের কথা বর্ণনা করার সময় সাহাবাদের মনেও এই সন্দেহ উৎপন্ন হওয়াতে তাঁহারা হযরতের খেদমতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হযরত এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই বুদ্ধিমান সাহাবাগণের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেনঃ

"তোমরা তোমাদের কর্তব্য কাজ করিতে থাক; কারণ যাহাকে যেজন্য পয়দা করা হইয়াছে, তাহার পক্ষে সে কাজই সহজ হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ, বেহেশতী ও দোযখী হওয়া অবশ্য তকদীরে লিখা আছে; কিন্তু আমাদের কাজের ফলস্বরূপই তাহা প্রকাশ পাইবে। যাহারা ধর্মকর্ম সুচারু রূপে সমাধা করে, তাহা তাহাদের শুভ অদৃষ্টেরই লক্ষণ এবং ইহার বিপরীত আচরণ পরিদৃষ্ট হইলে, তাহা দুরদৃষ্টের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই গুরুভার-বোধক সংক্ষিপ্ত উত্তর যথেষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর আর তাঁহারা কখনও তকদীরের বিষয়ে তর্কবিতর্ক উত্থাপন এবং এই অজুহাতে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেন নাই। সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় আমাদের বুদ্ধি নিতান্ত নগণ্য। সুতরাং আমরা যদি তকদীর -এর পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারি, তবেও আমাদের পক্ষে এ বিষয়ে সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই সর্বোতভাবে শ্রেয়ঃ। অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম যেমন অদৃষ্টের প্রতি বিশ্বাসও রাখিতেন পূর্ণ মাত্রায়, তেমনি কর্তব্য কর্মও পালন করিতেন ষোল আনা। আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয়ঃ নাজ্জাশীর সহিত কথোপকথনের সময় জা'ফর, মসীহ (আঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "তিনি একজন আল্লাহ্‌র বান্দা। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে তাঁহার রূহকে বিবি মরইয়মের উদরে স্থাপন করিয়াছেন।" নাজ্জাশী এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "হযরত ঈসা (আঃ) নিজেও এই কথাই বলিয়াছেন।" ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, খৃষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থে নিশ্চয়ই এই কথার সমর্থন বিদ্যমান ছিল। অধুনা খৃষ্টান-জগৎ হযরত মসীহ (আঃ)-কে খোদার পুত্র বলিয়া মত পোষণ করিলেও ইহা তাহাদের মূল ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা নহে। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজে বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দরবারেও খৃষ্টধর্মে ব্যুৎপন্ন বিদ্বানমন্ডলীর সমাবেশ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এরূপাবস্থায় একথা বলা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না যে, বাদশাহ নাজ্জাশী পৈতৃক ধর্মের মূল শিক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই এত সহজে তিনি হযরত মসীহ্ সম্বন্ধে ইসলামী ধর্মমত মানিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

জ্ঞান বুদ্ধি পরিচালনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র এক অলৌকিক পুত্র জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া সাধারণ মানুষের আকারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও মল-মূত্রের অধীনতা স্বীকার এবং দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার, রোগ-যন্ত্রণা সহ্যকরত স্বীয় অক্ষমতার পরিচয় দিতে আসিবেন এবং সর্বশেষে অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হইয়া শূলদণ্ডে প্রাণ দিবেন, ইহা নিতান্ত জ্ঞানবহির্ভূত কথা। আল্লাহ্ অবিনশ্বর ও অসীম, তাঁহার ক্ষমতাও অসীম। প্রত্যেক জীবের সন্তান যেমন স্বজাতীয় ও স্বপ্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, আল্লাহ্‌র সন্তান হইলেও সেইরূপই হইত, আল্লাহ্‌র সন্তানও অবিনশ্বর হইত এবং তাহার ক্ষমতাও অসীম হইত। এক্ষণে আমরা যদি পিতা ও পুত্র উভয়কেই অসীম ক্ষমতাবান স্বীকার করিতে যাই, তবে বিষম বিভ্রাট দেখা দেয়। কারণ, এক রাজ্যে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুই রাজা হইতে পারে না। এরূপাবস্থায় এক ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইতে গেলে দ্বিতীয় ক্ষমতাকে তাহার নিকট নিশ্চয়ই নতি স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, দ্বিতীয় ক্ষমতাকে অসীম বলা চলে না। আর যদি উভয় ক্ষমতাই স্বাধীনভাবে প্রকাশ পাইতে যায়, তবে মুহূর্তে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হইয়া পড়িবে এবং সমস্ত সৃষ্টি-জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

কোরআন পাকে এই বিষয়টি অতি সরল ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছেঃ

لَوْكَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۝

"যদি ঊর্ধ্ব ও নিম্ন-জগতে আল্লাহ্ ব্যতীত আরও মা'বূদ থাকিত, তবে উভয় জগৎই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত।" যেমন দেখুন, এক অসীম ক্ষমতা যদি চায়, অদ্য বৃষ্টি হউক। এক্ষণে অপর ক্ষমতা যদি ইহার বিপরীত করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহা সসীম হইয়া পড়ে। আর যদি দ্বিতীয় ক্ষমতা বিপরীত করিতে সক্ষম হয়, তবে প্রথম ক্ষমতার অসীমত্ব থাকে না। আর উভয় ক্ষমতাই যদি সমান হয়, তবে উল্লিখিত অবস্থায় এক ক্ষমতা বৃষ্টিপাত করিতে এবং অপর ক্ষমতা বৃষ্টি বন্ধ রাখিতে চাহিলে, পরিণামে মুহূর্তমধ্যে আসমান, যমীন তথা সমগ্র সৃষ্টজগৎ বিনষ্ট হওয়া ভিন্ন আর কোনই উপায় থাকিবে না।

খৃষ্টান-জগৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক দিয়া বর্তমানকালে উন্নত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহারা এই মোটা কথাটিতে যে অজ্ঞানতার পরিচয় দিতেছে, বাস্তবিক তাহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। বস্তুতঃ এই অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথাটি তাহাদের ধর্মের অঙ্গ নহে। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র ইন্‌জীলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার বান্দা এবং খোদার রাসূল বলিয়াই পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

বহু পূর্বেই সেই বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ইন্‌জীল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বাইবেল উহার বিকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূল ইন্‌জীলের সন্ধান তাহারা নিজেরাই বলিতে পারিবে না, আমরা কিরূপে বলিব? কেবল মোটামুটিভাবে এইমাত্র বলিতেছি যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন সংস্করণের যে সমস্ত বাইবেল দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিতেও অনেক অমিল দেখা যায়। এ রকম পুস্তকের উপর ধর্মের ভিত্তি কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে?

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই ইন্‌জীল কিতাব বিকৃত হইয়া থাকিলেও সে সময় এ রকম অনেক অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী আলেম ছিলেন, যাহারা ইন্‌জীলের প্রকৃত শিক্ষার খবর রাখিতেন। অনেকে হয়তো আভিজাত্যের খাতিরে তাহা প্রকাশ করিতেন না; কেহ প্রকাশ করিতে চাহিলেও হয়তো সর্বসাধারণের ধর্মমতের বিরুদ্ধে তাহা বলিতে সাহস পাইতেন না। বর্তমানকালেও দেখা যায় সর্বসাধারণের বহুবিধ ধর্ম-বিরোধী রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে ধার্মিক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও কোন কথা বলিতে সাহসী হন না; আর বলিলেও বিশেষ ফলোদয় হইতে দেখা যায় না।

বর্ণিত ঘটনায় নাজ্জাশী প্রথম হইতেই অবগত ছিলেন যে, ঈসা মসীহ (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়া খৃষ্টানগণ যে ধারণা রাখে, তাহা নিতান্ত অমূলক। এজন্যই হযরত জা'ফর (রাঃ) তাঁকে আল্লাহ্‌র বান্দা বলিয়া প্রকাশ করায় নাজ্জাশী তাহা স্বীকার করিতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেন নাই। দরবারের লোকেরা প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের বশে অথবা আভিজাত্যের কারণে বিরক্তি প্রকাশ করিলেও নাজ্জাশী তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই সময় হইতেই নাজ্জাশীর অন্তঃকরণে ইসলামের প্রতি ভক্তির সূচনা এবং পরিণামে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।

যে সমস্ত মুসলমান হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখানেই রহিলেন, কিন্তু মক্কায় অবস্থিত মুসলমানদের পক্ষে ধর্ম পালন এবং জীবন ধারণ কষ্টকর হইয়া পড়িল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণঃ

এই সময় কুরাইশ সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবু জহল ও ওমর ইবনে খাত্তাব অন্যতম ছিলেন। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দো'আ করিলেন,"আল্লাহ্! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জহল ইবনে হেশাম দ্বারা ইসলামের সাহায্য কর।"

যাহারা ইসলামের ঘোর শত্রু, যাহারা ইসলাম-তরীকে নিমজ্জিত করিতে এবং মুসলমানদের বিনাশ সাধন করিতে দিবানিশি আপ্রাণ চেষ্টায় রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা কি প্রকারে ইসলামের সাহায্য হইতে পারে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত হইলেও আল্লাহ্‌র অপার মহিমার ইহা সামান্য নিদর্শন মাত্র।

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) তরবারি হস্তে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিধন সাধন উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। তৎসঙ্গে মুসলমানদিগকেও নিপাত করিতে সংকল্প করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন; তাঁহার তরবারির সম্মুখে দাঁড়াইবার মত লোক আরব দেশে খুব সামান্যই ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর তরবারি হস্তে বহির্গত হওয়ার সংবাদে বিধর্মীরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এইবার নিশ্চয়ই মুসলমানদের দফা শেষ হইবে।

পথিমধ্যে ওমরের সঙ্গে নঈমের দেখা হইল। নঈম জিজ্ঞাসা করিল, "ওমর! তলোয়ার ঘুরাইয়া কোথায় চলিয়াছ?" ওমর (রাঃ) বলিলেন, "মুহাম্মদের দফারফা করিতে চলিয়াছি; এইবার শেষ না করিয়া আর ফিরিব না।" নঈম কহিল, "দেখ ওমর, কাজটা ভাল হইতেছে না। তুমি কি মনে

কর, মুহাম্মদকে বধ করিয়া নিরাপদে থাকিতে পারিবে? আবদে-মনাফের বংশধরগণ কি ইহার প্রতিশোধ লইবে না? অন্যের কথা পরে ভাবিও; তোমার ঘরের খবরও কি তুমি রাখ?"

হযরত ওমর অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "কেন, আমার ঘরে কি হইয়াছে?" নঈম উত্তর করিল, "তোমার ভগনী ফাতেমা এবং ভগনীপতি সাঈদও যে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন!"

হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-কম্পিত দেহে প্রথমেই ভগিনীর বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁহার স্বামী কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিলেও ওমর (রাঃ)-এর ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস পান নাই। তাঁহারা হযরত খাব্বাব (রাঃ)-এর নিকট কোরআন শিক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত ওমর যমের মত আসিয়া উপস্থিত। হাতে নিষ্কাসিত অসি, চক্ষু রক্তবর্ণ। —রকম দেখিয়াই তাঁহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। খাব্বাব আত্মগোপন করিলেন এবং ফাতেমা কোরআনের পাতাগুলি লুকাইয়া ফেলিলেন। ওমর (রাঃ) খাব্বাবের কোরআন পাঠ শুনিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি পড়িতেছিলে?" তাঁহারা বলিলেন, "কৈ? কিছুই না।" হযরত ওমর ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন, "হেঁয়ালী করিলে চলিবে না, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমরা নাকি মুহাম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ?" এই বলিয়া ভগনীপতিকে মারিতে উদ্যত হইলেন। ভগনী বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহাকেও আহত করিলেন। তখন বিবি ফাতেমা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিলেন যে, "নিশ্চয়ই, আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।"

হযরত ওমর (রাঃ) বিবি ফাতেমার এই স্পষ্টোক্তিতে অনেকটা নরম হইয়া গেলেন। তাঁহার বীর-হৃদয়েও ক্ষণেকের তরে করুণার ঢেউ খেলিয়া গেল। তিনি কিছু শান্ত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা এখন যে 'সহীফা' পাঠ করিতেছিলে, তাহা আমাকে দেখিতে দাও; পড়িয়া দেখি—মুহাম্মদের ধর্ম কি রকম?" তাঁহারা বলিলেন, "আপনার শরীর অপবিত্র; আল্লাহ্‌র কালাম স্পর্শ করিতে হইলে পাক-সাফ হইতে হইবে।" হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ গোসল করিয়া আসিলেন এবং সহীফা লইয়া কোরআনের আয়াত পাঠ করিতে লাগিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণ লেখাপড়া জানিলেও কোরআনের সরল হৃদয়গ্রাহী আয়াতগুলির ভাষাগত ও ভাবগত সৌন্দর্য তিনি সহজেই অনুভব করিতে পারিলেন। পবিত্র কালামের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি প্রফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিলেন, "ইহা তো চমৎকার জিনিস দেখিতেছি!" হযরত খাব্বাব অন্তরাল হইতে হযরত ওমরের এই উক্তি শুনিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইলেন এবং বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওমর! (রাঃ) সত্যের আলো প্রকাশ পাইয়াছে, তোমার মত বুদ্ধিমান লোক আর কতকাল অন্ধকারে থাকিতে পারে? আমি আশা করি, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দো'আ তোমার সম্পর্কেই কবুল হইয়াছে।" অতঃপর হযরত (দঃ) যে দো'আ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি খুলিয়া বলিলেন। ওমরের মনোভাব ইতিপূর্বেই কতকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল, খাব্বাবের কথায় তাঁহার মন আরও নরম হইয়া পড়িল। তিনি সম্মত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ তো, আমাকে সেখানে লইয়া চল।"

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জনৈক সাহাবীর বাড়ীতে সহচরবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ওমর (রাঃ)-কে এইভাবে তরবারি হস্তে আসিতে দেখিয়া সাহাবীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। কিন্তু তখন ওমর (রাঃ) আর সেই ওমর ছিলেন না; স্পর্শমণির সংস্পর্শে

www.nagorikpathagar.org

মুহূর্তমধ্যে যেন তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। তিনি হযরত সমীপে উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণে ধন্য হইলেন। —তারিখুল কামেল

ইহাই হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এই ঘটনাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে যে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এক্ষণে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানমতে তৎসমুদয় উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইব।

কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ

প্রথম ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় দেখা যায়, তাঁহার প্রতি ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারে কোন প্রকার বল প্রয়োগ হয় নাই, বস্তুতঃ তাহা সম্ভবপরও ছিল না। একে তো সেই সময় মুসলমানদের এ রকম ক্ষমতাই ছিল না যে, কাহারও উপর বল প্রয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ হযরত ওমরের তেজস্বিতা ও বল-বিক্রমকে সকলেই ভয় করিত। তাঁহার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি পর্যন্ত নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁহার ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। হযরত খাব্বাব কোরআন পড়াইতে আসেন, তিনিও হযরত ওমরের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, সর্বোপরি হযরত ওমর, সহচরবৃন্দ পরিবেষ্টিতাবস্থায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিধন সাধন করিতে চলিয়াছেন—মনে এতখানি আতঙ্ক পর্যন্ত নাই! অপর পক্ষ তাঁহার আগমনবার্তা শুনিয়াই ভয়ে কম্পমান। এই অবস্থাবলীর সমাবেশে একথাই স্পষ্টতর হইয়া উঠে যে—

(ক) হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপর বল প্রয়োগ, মুসলমানদের ক্ষমতার অতীত ছিল।

(খ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভয়েই মুসলমানগণ ভীত ছিল। এমন কি নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিতেও তাঁহারা সাহস পাইত না।

দ্বিতীয় ঃ হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের কথা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই; বরং ইসলামকে সমূলে বিনষ্ট করাই ছিল তাঁহার চরম লক্ষ্য। হযরত ওমরের অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণের সূচনা হয় ভগিনী ফাতেমা বিবির স্পষ্ট কথাবার্তা শুনিয়া। ফাতেমা যে সময় হযরত ওমরের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডা করিতেছিলেন, সে সময় বাস্তবপক্ষে মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁহার খেলা চলিতেছিল। সেকালে ভাইয়ের তলোয়ার ভগিনীর মাথায় পতিত হওয়া মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু এ রকম কালান্তক যমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি বলিতেছেন, "আমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" ভগিনীর এরূপ দৃঢ়তা ও অটলভাব হযরত ওমর (রাঃ) ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নাই। হয়তো তিনি ভাবিলেন, মুহাম্মদ (দঃ)-এর শিক্ষার ভিতরে এমন কি আকর্ষণ আছে, যাহার কারণে এতখানি দৃঢ়তা সম্ভবপর হইতে পারে? অতঃপর যখন কোরআনের সুমধুর বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার মনে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। সন্দেহের যে সামান্য কণাটুকু বাকি ছিল, হযরত (দঃ)-এর পবিত্র নূরানী চেহারা দৃষ্টে এবং তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণে, তাহাও তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। লোকচক্ষুর বহির্ভূত কোন অলৌকিক শক্তির প্রতি যাহারা বিশ্বাস রাখে না, যাহারা প্রত্যেক ঘটনাকেই বাহ্যিক উপকরণের উপর দাঁড় করাইতে চাহে, তাহারাও এত অল্প সময়ের মধ্যে অসম্ভব রকমে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মানসিক পরিবর্তন দৃষ্টে একথা মানিতে বাধ্য হইবে যে, আল্লাহ্র পাক কালাম এবং আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বরের মধ্যে এমন কোন অস্বাভাবিক আকর্ষণ নিহিত ছিল, যাহা অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এই লোকাতীত আকর্ষণ শক্তিই যে ইসলাম প্রচারের শ্রেষ্ঠ সহায়, একথায় সন্দেহ

www.nagorikpathagar.org

মাত্র থাকিতে পারে না। অতি পরাক্রমশালী স্বাধীনচেতা দুর্দম সাহসী বীরপুরুষ হযরত ওমর (রাঃ)-কে প্রভাবিত ও পরাভূত করিতে আর কোন শক্তিই যে কার্যকরী হইত না, সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তৃতীয়ঃ কোরআন শরীফের রচনাভঙ্গী ও উহার অর্থের মধ্যে এমনই বিশেষত্ব আছে, যাহা অন্য কোথাও নাই। যাঁহারা আরবী ভাষা জানেন, তাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে কোরআন শরীফকে মিলাইয়া দেখিতে পারেন। প্রাগ-ইসলামিক যুগে আরবী সাহিত্য খুব উন্নত ছিল। আরবের তৎকালীন কবিতা পুস্তকসমূহ আজকালও আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে জগতের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীসমূহের শোভা বর্ধন করিতেছে। সেই সাহিত্য-চর্চার যুগেও আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হইয়া আরবের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিল। আরবের সাহিত্যিক ও কবিগণ কোরআনের রচনাশিল্পের অনুকরণে নিজেরা রচনা করিতে চেষ্টা করেন নাই, এমন নহে। আল্লাহ্‌র কালামে প্রথমে তাহাদিগকে কোরআন শরীফের সম-মর্যাদাসম্পন্ন পুস্তক রচনা দ্বারা শক্তি পরীক্ষা করিতে বলা হয়। ইহাতে তাহারা অপারগ হইলে মাত্র দশটি সূরার (অধ্যায়ের) সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে আহবান করা হয়। যখন ইহাতেও তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ পাইল, তখন মাত্র ছোট একটি সূরার (অর্থাৎ, সূরা কাওসারের) ন্যায় তিনটি বাক্যবিশিষ্ট একটি সূরা রচনা করিতে আহবান করিয়া বলা হইল—

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

আমি আমার বান্দাদের উপর যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, উহাতে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, (তোমরা যদি ভাবিয়া থাক যে, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হয় নাই, মুহাম্মদ [দঃ] স্বয়ং রচনা করিয়াছেন) তবে ইহার অনুরূপ ছোট একটি 'সূরা' রচনা করিয়া দেখাও। আর এই কাজের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সাহায্যকারীদের—তোমাদের সহধর্মীদের এবং উপাস্য দেবতাদের সাহায্যও গ্রহণ কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক (তবে অবশ্যই ইহা করিতে পারিবে)।

—সূরা-বাকারাহ্ঃ রুকূ ৩

বলাবাহুল্য, আরব-সাহিত্যিকগণ এই প্রতিযোগিতার আহবানে সাড়া দিয়াছিল এবং একাজে তাহাদের পূর্ণ শক্তিও ব্যয়িত হইয়াছিল। কোরআন শরীফের ছোট সূরা-'কাওসার'-এর অনুরূপ বিভিন্ন রচনাও লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের বিচারেই একটিও কোরআনের উক্ত সূরাটির সমতুল্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। অবশেষে তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলঃ

لَيْسَ هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ

অর্থাৎ, ইহা মানুষের রচিত কালাম নহে।

কোরআনের উক্ত চ্যালেঞ্জ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর যাবৎ অক্ষুন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আজকালও খৃষ্ট-ধর্মের অনেক লোক এবং আর্য সমাজী অনেক হিন্দু আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া থাকেন, এখনও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমরা স্পষ্ট ভাষায় দাবী করিয়া বলিতেছি—কোরআন শরীফ মানুষের রচনা নহে; ইহা আল্লাহ্‌র কালাম। মানুষের কি সাধ্য, আল্লাহ্‌র কালামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে! বস্তুতঃ কোরআন শরীফ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম 'মো'জেযা' বা অলৌকিক শক্তির মধ্যে গণ্য।

www.nagorikpathagar.org

মানুষ যাহাতে পয়গম্বরের দাবী সত্য বলিয়া বুঝিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত পয়গম্বরকেই মো'জেযা দান করিয়াছিলেন। যে যুগে যে জিনিসের প্রচলন বেশী থাকে, মো'জেযাও উহার অনুরূপই হইয়া থাকে। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় যাদুবিদ্যার বহুল প্রচলন ছিল; যাদুকরেরা মানুষের চক্ষে যাদু করিয়া সাপের মত দেখাইয়া চমক লাগাইত। এজন্য হযরত মুসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মো'জেযা এই ছিল যে, তাঁহার লাঠি সত্য সত্যই সাপ হইয়া যাদুকরদের সকল সাপ খাইয়া ফেলিল। ঈসা (আঃ)-এর সময় গ্রীকদের হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্র অত্যন্ত উন্নত ছিল। এজন্য ঈসা মসীহ (আঃ)-কে মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন দানের মো'জেযা দেওয়া হইয়াছিল; যাহা চিকিৎসকদের ক্ষমতার অতীত ছিল।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সময় আরব দেশে সাহিত্য ও কাব্যচর্চার প্রাবল্য ছিল। সাহিত্য প্রতিযোগিতাই তাহাদের আত্মমর্যাদার মাপকাঠি বলিয়া মনে করা হইত। সুতরাং হযরত (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মো'জেযাও সাহিত্য-বিদ্যার অন্তর্গত। কোরআনের ভাষা ও ভাব উভয়ই অলৌকিক।

কোরআন পাকের ভাবার্থের ভিতরে অতীব সূক্ষ্মতা বিদ্যমান থাকিলেও আরবী যাহাদের মাতৃভাষা অথবা যাহারা সাধারণ আরবী জানে, তাহারা কোরআনের মোটামুটি ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহা যে অলৌকিক জিনিস একথা বুঝিয়া নিতে পারে। এমন কি যাহারা মোটেই আরবী জানে না, তাহারাও অন্ততঃ একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, কোরআন শরীফ অতুলনীয় শ্রুতিমধুর গ্রন্থ। অন্যান্য আরবী পুস্তকের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। তৎসঙ্গে ইহাতে যে একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ আছে, তাহাও সকলেই অনুভব করিতে পারে।

কোরআন শরীফের আয়াত ও সূরাসমূহ শ্রবণ করিয়া আরবের লোকেরা সকলেই এই অলৌকিকতা মর্মে মর্মে অনুভব করিত। শত্রুরা শত্রুতাবশতঃ কোরআনকে ঐন্দ্রজালিক বস্তু বলিত, জিনের ভাষা বলিত—কিন্তু এমন কথা কখনও বলিত না যে, কোরআন সাধারণ রকমের জিনিস।

স্বপক্ষ বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলেই কোরআন পাঠ শুনিয়া আনন্দানুভব করিত এবং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত। অনেক স্ত্রীলোক পর্যন্ত পানাহার ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম ছাড়িয়া কোরআন পাঠ শুনিতে চলিয়া যাইত। ইহাতে অনেকের মনেই ক্রমশঃ সত্যধর্মের প্রতি মমত্ববোধ দেখা দিত। এজন্য কাফেরগণ চেষ্টা করিত যাহাতে কেহ কোরআন শরীফ শুনিতে না পায়। তাহাদের এই শঠবুদ্ধির কথা কোরআন শরীফেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

যাহাতে কেহ কোরআন শুনিতে না পারে এবং কোরআনের প্রতি সকলের বিরূপ ধারণা থাকে, কাফেরগণ এই চেষ্টাই করিত। হযরত ওমরও বিজাতীয় ক্রোধ এবং বিদ্বেষভাববশতঃ কোন সময় কোরআনের আয়াত শ্রবণ করেন নাই অথবা শ্রবণ করিলেও তৎপ্রতি মনোযোগ দেন নাই। ভগিনীর নিকট কোরআন শরীফের কতিপয় আয়াত মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ মাত্রই তাঁহার কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তিনি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র পাক কালামের প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন।

চতুর্থঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর মুসলমানদের ভয়ানক শত্রু ছিলেন। মুসলমানগণও তাঁহাকে অত্যধিক ভয় করিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে দো'আ করিয়াছিলেন, ইহাতে বুঝা যায়, তিনিও হযরত ওমরকে সুযোগ্য ও শক্তিমান ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন। ইসলাম ধর্ম কোন মানুষের বীরত্ব, তেজস্বিতা, ক্রোধ, শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি প্রকৃতিগত গুণাবলীকে কখনও বিনষ্ট করিতে শিক্ষা দেয় না; এই গুণগুলিকে সংযতভাবে উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করার উপায় শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

দেয় মাত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে প্রকৃতিগত গুণাবলীর কারণে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে সমর্থ হয়, ইসলাম গ্রহণের পরে ইসলামিক বিধি-ব্যবস্থার গন্ডীর ভিতরে এই সমস্ত গুণাবলী ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার আসন এখানেও উপরেই নির্ধারিত হইয়া থাকে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত মানুষও চরিত্রের খনি। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে যাহারা শীর্ষস্থানীয়, ইসলামের মধ্যেও তাঁহারা শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকেন, যদি ধর্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন।" —মুসলিম শরীফ

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর জীবনচরিতেও আমরা একথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কাল যে তরবারি মুসলিম নিপাতের জন্য কোষমুক্ত হইয়াছিল, আজ তাহা মুসলমানদের রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। কাল যে তরবারির ভয়ে মুসলমানগণ কা'বা শরীফে নামায পড়িতে সাহস পাইতেন না, আজ তাঁহারই অনুগ্রহের ফলে মুসলমানগণ বায়তুল্লায় নামায পড়িতে চলিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ) তলোয়ার হাতে সকলের আগে; সাধ্য কি বিধর্মীগণ বাধা দিতে আসে?

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এক্ষণে যেমন হযরত ওমর ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে কাফেরদের নেতৃত্ব করিতেছেন, ইসলাম গ্রহণের পরেও তদ্রূপ তিনি মু'মিনদের নেতৃত্ব করিবেন—তাঁহার কীর্তি কলাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এজন্যই তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁহার ইসলাম গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা ইসলামের ভিত্তি দৃঢ় হওয়ার দো'আ করিয়াছিলেন। বাস্তবপক্ষে হযরত ওমরের দ্বারা ইসলামের যে খেদমত হইয়াছিল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরে অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা যেস্থলে সাহাবাদের ইসলাম প্রচারের কথা বর্ণনা করিব, সেখানে হযরত ওমরের কীর্তি কলাপ কতকটা বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

হযরত হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চাচা হযরত হামযা মুসলমান হইয়াছিলেন। হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ ব্যাপার আরো চমকপ্রদ। হযরত হামযা আরবের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একদিন বীরবর হামযা মৃগয়া হইতে ফিরিয়া সবেমাত্র কা'বাগৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, আবু জহল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপর নিতান্ত জঘন্য অত্যাচার করিয়াছে। এই খবর শুনিয়া তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি তৎক্ষণাৎ আবু জহলের নিকট যমের মত উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় ধনুক দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। আবু জহলের মস্তক জখম হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। হযরত হামযা বলিতে লাগিলেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর কোন্ সাহসে এমন অত্যাচার করিলে? তাঁহার কি অপরাধ দেখিয়াছ? ইসলাম ধর্ম প্রচার করাই কি তাঁহার অপরাধ? তবে আমিও তাঁহার ধর্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সাধ্য থাকে, আমার উপরেও অত্যাচার কর।" অতঃপর তিনি আবু জহলকে ছাড়িয়া রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া অকপট চিত্তে ইসলামের অমিয় বাণী—কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।

হযরত হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের এবংবিধ ঘটনার উপর টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক। তিনি যে বল প্রয়োগে মুসলমান হন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনায়

৫-

www.nagorikpathagar.org

আমরা ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে, বিধর্মীদের অত্যাচার উৎপীড়ন ইসলাম প্রচারে অনেকখানি সহায় হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন দিবাকরের আলোক রশ্মিকে কি কেহ বাধা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারে? প্রজ্বলিত হুতাশন কি ফুৎকারে নির্বাপিত হয়? আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

'কাফেরেরা আল্লাহ্‌র নূরকে স্বীয় মুখের (ফুৎকার) দ্বারা নির্বাপিত করিতে ইচ্ছা করে। আল্লাহ্ তাঁহার নূরকে পূর্ণত্ব দান করিবেন, যদিও কাফেরদের (তাহা) মনঃপূত নহে।' —সূরা-ছফ্ ঃ রুকূ ১

হযরত হামযা (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের অবস্থা কতকটা নিরাপদ হইলেও তাঁহাদের বিপদ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় নাই। এই দুই বীরপুরুষের ভয়ে এবং হযরত (দঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালিবের সম্ভ্রমে বিধর্মীগণ খোলাখুলিভাবে হযরত (দঃ)-এর উপর অত্যাচার করিতে সাহস না পাইলেও যখনই তাহারা সুযোগ পাইত, মুসলমানদের প্রতি উৎপীড়ন করিতে ছাড়িত না। বস্তুতঃ মক্কায় অবস্থানকালে ক্ষণেকের তরেও মুসলমানগণ নিজদিগকে পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারে নাই। স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার করা তো মোটেই সম্ভবপর ছিল না। ইসলামের উন্নতি, প্রচার এবং শৌর্য-বীর্য হিজরতের পরেই প্রকাশ পাইয়াছিল। মদীনার আনসারগণ হযরতের জন্য নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মুহাজেরদিগকে নিজেদের বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজেদের সম্পত্তির অংশ দিয়াছিলেন। আরো যে কত ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। আনসারদের মধ্যেও এমন সময়ে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, যখন ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করা জঘন্যতম অপরাধের মধ্যে গণ্য হইত।

■

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মদীনায় ইসলাম

মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ঃ

হজ্জের মওসুমে আরবের প্রত্যেক স্থান হইতে মক্কা শরীফে বহু লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন করিত। মক্কার লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিল যে, হয়তো বাহিরের লোকেরা মুহাম্মদ (দঃ)-এর নবুওয়তের কথা শুনিয়া থাকিবে, হয়তো বা তাহারা মুহাম্মদ (দঃ)-এর ধর্মমত শুনিতে আগ্রহান্বিত হইবে। এরূপাবস্থায় তাঁহার ধর্মের প্রসার লাভ খুবই সম্ভবপর। সুতরাং আমাদের সকলকে দলবদ্ধভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে হইবে।

পরামর্শ মত তাহাদের কাজও চলিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের শত প্রচেষ্টাতেও ইসলামের গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল না। ধর্মের আলোক ক্রমশঃই পরিব্যাপ্ত হইয়া চলিল।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হজ্জের সময় সুযোগ মত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রচার করিতেন। এক বৎসর তিনি মদীনার কয়েকজন লোককে ইসলামের বাণী শুনাইলে তাহারা তৎক্ষণাত ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁহারা এখন হযরতের পবিত্র মুখে ইসলামের বাণী শুনিয়া মদীনায় ফিরিয়া গিয়া একথা ব্যক্ত করিতেই ঘরে ঘরে ইহার আলোচনা ছড়াইয়া পড়িল। ইহা ছাড়া, মদীনায় অনেক ইহুদী বাস করিত। তাহারা প্রায়ই বলিত যে, অতি নিকটবর্তী সময়ে আরব দেশে একজন নবী আসিবেন। এই ভবিষ্যদ্বানী মদীনায় দ্রুত ইসলাম প্রচারে সহায়ক হইয়াছিল।

পরের বৎসর মদীনা হইতে বার জন লোক মক্কায় আসিলেন এবং গোপনে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাক্ষাৎ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ মতে তাঁহাদিগকে কোরআন শরীফ ও ইসলামের আহ্‌কাম শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)-কে তাঁহাদের সঙ্গে মদীনায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মদীনার দুই সরদারের ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত মোসআব (রাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া আস'আদ ইবনে জারারাহ্ (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে আসিয়া মুসলমানগণ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। এই সময় মদীনায় সা'দ ইবনে মুআয এবং ওসাইদ ইবনে হুযাইর এই দুইজন সরদার ছিলেন। তাঁহারা এই খবর শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সা'দ ওসাইদকে বলিলেন, "তুমি যাইয়া তাহাদিগকে বাধা দাও।" ওসাইদ, মোসআবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কেন দেশের যুবকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে আসিয়াছ? যদি ভাল চাও, এখান হইতে চলিয়া যাও।" মোসআব (রাঃ) বিনম্রভাবে বলিলেন, "আমাদের চলিয়া যাইতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি কি আমাদের কথাগুলি একবার শুনিতে পারেন না? হয়তো আপনার নিকটও তাহা পছন্দনীয় হইতে পারে।" ওসাইদ একথায় রাজি হইলে হযরত মোসআব (রাঃ) ইসলামের মূল বিধানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। ওসাইদ শুনিয়া বলিলেন, "এই সমস্ত শিক্ষা তো খুবই চমৎকার!"

www.nagorikpathagar.org

অনন্তর ওসাইদ তখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আর একজন (দ্বিতীয় সরদার সা'দ) মুসলমান হইলে কোন বাধাবিঘ্নই বাকি থাকিবে না।"

ওসাইদ ফিরিয়া চলিলেন। সা'দ ওসাইদকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ওসাইদ যে অবস্থায় গিয়াছিল, সে অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই।" অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তিনি মুসলমান হইয়া আসিয়াছেন। ওসাইদকে প্রকৃত কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "তাহাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম আমার নিকট কোনই আপত্তিকর বলিয়া মনে হইল না। ইচ্ছা করিলে আপনিও যাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।" তখন সা'দ নিজেই চলিলেন। সা'দের অবস্থাও সে রকমই হইল, তিনিও ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য বুঝিতে পারিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

সা'দ প্রত্যাবর্তনপূর্বক ওসাইদকে সঙ্গে লইয়া নিজের সম্প্রদায়ের সকল লোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে কেমন মনে কর?" তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাদের সরদার এবং সকলের চেয়ে উত্তম।" সা'দ বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে তোমাদের চেয়ে উত্তম মনে কর, তবে আমার অনুরোধ—তোমরা সকলে এখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর।" অনন্তর সা'দ সকলকে ইসলামের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বুঝাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তদীয় সম্প্রদায়ের একটি প্রাণীও ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত বাকি রহিল না।

পরের বৎসর মদীনা শরীফ হইতে সত্তর জন মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হইয়া হজ্জের মওসূমে মক্কা শরীফে গেলেন। সঙ্গী কাফেরগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য মোটেই বুঝিতে পারে নাই। তাঁহারা গুপ্তভাবে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মদীনায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইহাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহারা যেভাবে নিজেদের পরিবারের লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, হযরত (দঃ) এবং অন্যান্য সকল মুসলমানদের হেফাযতও সেভাবে করিবেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে হযরত (দঃ) মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় হিজরত করিলেন।

ইহাই আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সংক্ষিপ্ত ঘটনা। আনসারদের মুসলমান হওয়ার পরেই ইসলামের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। হিজরতের পূর্ব সময়ের যে ঘটনাবলী বিবৃত হইল, তাহাতে পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিয়াছেন, সে সময়ে কাহারও প্রতি জোর-জবরদস্তি করা তো দূরের কথা, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই মুশ্‌কিল ছিল। অথচ এই সময়ের ভিতরেই ইসলামের মূল সুদৃঢ় হইয়াছিল এবং ইহার শিকড় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিজরতের পরে ইসলামের উন্নতির যুগ আরম্ভ হইলেও কার্যতঃ তৎপূর্বেই ইসলামের ভিত্তি মজবুত হইয়াছিল। মক্কার বড় বড় গোত্রের লোকদের পূর্ণ শক্তিতে বাধা প্রদান সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে প্রায় প্রত্যেক গোত্রেই ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল। মক্কার বাহিরে—হাবশা এবং মদীনাতে ইসলামের আলো প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং ইসলামের পরবর্তী উন্নতির বুনিয়াদ হিজরতের পূর্বকার মৌলিক উন্নতির উপরেই স্থাপিত, তাহা অস্বীকার করা চলে না। প্রবল বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ইসলাম ধর্ম এতখানি বিস্তার লাভ করিতে পারা যে কেবল ইসলামের নিজস্ব সৌন্দর্য, তৎসঙ্গে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অলৌকিক চরিত্রবল ও মুসলমানদের নিঃস্বার্থ প্রচার-কার্য দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছিল, একথায় সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই।

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কাহাকেও প্রকাশ্যভাবে শিক্ষা দিতে পারিতেন না। মদীনার কতিপয় লোক মক্কায় আসিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এ রকম গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, অন্য একটি প্রাণীও এই খবর জানিতে পারে নাই—এমন কি তাঁহাদের দলের

www.nagorikpathagar.org

লোকেরাও নহে। হিজরতের পূর্বে মদীনার মাত্র কয়েকজন লোক অল্প সময়ের জন্য হযরত (দঃ)-এর সংসর্গ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাবিবার বিষয়—পবিত্র সংসর্গের এমনি অলৌকিক শক্তি ছিল যে, এই লোকগুলি মদীনায় যাইয়া হিজরতের পূর্বেই মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ধর্ম পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে—মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হযরতের দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হযরতের মদীনা রওয়ানা হওয়ার সংবাদ শ্রবণের পর আবেগাতিশয্যে প্রতিদিন শহরের বাহিরে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পথপানে তাকাইয়া থাকিত। যখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্র অত্যন্ত অসহ্য হইয়া পড়িত, তখন তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। অতঃপর যখন সত্যই একদিন তিনি মদীনার আকাশে নব চন্দ্রিমাসম উদিত হইলেন, তখন আর মদীনা-বাসীদের আনন্দ দেখে কে? জনৈক মদীনাবাসী সাহাবী বলেন, "জনাব রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দেখিয়া মদীনার লোকেরা যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আর কোন সময়ই তেমন আনন্দিত হইতে দেখা যায় নাই। শহরের স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত আগ্রহ দমনে অসমর্থা হইয়া ছাদের উপর, জানালার পার্শ্বে—যে যেখানে সুযোগ পাইল, দাঁড়াইয়া তাঁহার নূরানী চেহারা মোবারকের দর্শন লাভ করিল। বস্তুতঃ মদীনাবাসীদের সেই শুভ দিনটি চিরস্মরণীয় আনন্দের দিন ছিল। চতুর্দিকে উদ্বেগ ও প্রফুল্লতার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। কতিপয় স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা আনন্দাতিশয্যে এই আরবী কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

طَلَعَ الْبَـدْرُ عَلَيْنَا ـ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ـ مَادَعٰى لِلّٰهِ دَاعِ

"সানিয়াতুল-বেদা' হইতে আমাদের উপর পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে; যতকাল আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার মত লোক থাকে, ততকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।"

মদীনাবাসীদের মনে হযরতের প্রতি এই অভাবনীয় ভক্তি, ভালবাসা ও আগ্রহ এমন সময় উৎপন্ন হইয়াছিল, যখন কাহারও উপর বল প্রয়োগের ক্ষমতা মুসলমানদের মোটেই ছিল না। মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার বাহিরের চাপ অথবা ঐহিক লাভের বা লোভের আশা বিন্দুমাত্রও ছিল না; পরন্তু ইহার বিপরীতভাবে বলা চলে যে, তাহাদের ইসলাম গ্রহণ ভয়ানক বিপদসঙ্কুল ছিল। তাহারা নিজদিগকে সমস্ত দুনিয়ার আক্রোশ ও হিংসার লক্ষ্যস্থল করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয়বার যখন মদীনার সত্তর জন লোক মক্কায় হযরত (দঃ)-এর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হযরত (দঃ)-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যকার এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উক্ত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন, "হে খাযরাজ সম্প্রদায়, তোমরা কি বুঝিতে পারিয়াছ, কি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছ? তোমরা দুনিয়ার সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছ।"

অতঃপর তিনি আরও বলিলেন, "ভাইগণ! তোমরা যদি এরূপ সাহস করিয়া থাক যে, তোমাদের দলপতিগণ শত্রুহস্তে নিহত হইলে এবং তোমাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইলেও প্রাণপণে হযরতের সাহায্য করিবে, তবে তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা ইহকাল ও পরকালের জন্য সুফলদায়ক হইবে। দুনিয়ায় তোমাদের সুযশ ও সুকীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে, আর পরকালে তোমরা অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি এ রকম সাহস না থাকে, তবে এখনই তাহা চিন্তা করা ও খুলিয়া বলা ভাল।"

www.nagorikpathagar.org

এই স্পষ্ট কথার উত্তরে উপস্থিত আনসারগণ সর্বাবস্থায় হযরতের সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকার প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা হযরত (দঃ)-এর প্রতি আনসারদের ঐকান্তিক ও অতুলনীয় ভালবাসার পরিচায়ক। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, কোন প্রকার বিপদ-আপদই আনসারদিগকে এই অটল প্রতিজ্ঞা হইতে টলাইতে পারে নাই। এজন্যই তাঁহারা সম্মানজনক "আনসার" বা সাহায্যকারী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যাহারা সত্যধর্মের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তাঁহারা হয়তো আনসারদের এত অল্প সময়ে ইসলামের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হওয়াকে আশ্চর্যের চক্ষে দেখিবেন, কিন্তু আমরা জানি সত্যের আকর্ষণ এমনি অভাবনীয়। আমরা স্পষ্ট ভাষায় দাবী করিতেছি যে, আনসারদের মধ্যে এবং অপর সব ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচারের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ ছিল—ইসলামের নিজস্ব সৌন্দর্য। ইহা সত্ত্বেও আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার ভিতর দিয়া আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সহায়ক যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহা করিতে কার্পণ্য করিব না। এই প্রসঙ্গে মদীনাবাসীদের পূর্ব যুগের ইতিহাস খানিকটা আলোচনা করা আবশ্যক। ইহাতে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বিশেষ তথ্যও পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

মদীনাবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস ঃ

সেই সময় মদীনায় দুই সম্প্রদায়ের লোক বাস করিত; ইহুদী ও পৌত্তলিক। মদীনার পৌত্তলিকগণই ইসলাম গ্রহণের পর আনসার নামে পরিচিত হন।

ইহুদী সম্প্রদায় ঃ

ইহুদীরাই মদীনার প্রাচীন অধিবাসী। তাহারা কখন আসিয়া মদীনায় বসতি বিস্তার করে, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও একথা স্থিরনিশ্চিত যে, তাহারা কয়েক হাজার বৎসরের পুরাতন বাসিন্দা। তফসীর ও ইতিহাসের দ্বারা জানা যায় যে, যে সময় বোখ্ত-নসর বাদশাহ কর্তৃক জেরুজালেম লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন ইহুদীরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে লেখা ছিল যে, আরব দেশের কোন পল্লীতে জগতের শেষ পয়গম্বর আবির্ভূত হইবেন। সেই পল্লীর মধ্যে খর্জুর বৃক্ষ খুব বেশী থাকিবে। ইহুদীগণ বোখ্ত-নসরের অত্যাচারে দেশ-ত্যাগী হওয়ার পর ভাবিল, শেষ নবীর আগমন হইলেই আমাদের দুর্দশার অবসান ঘটিবে। এই ভাবিয়া তাহারা আরবের দিকে চলিল। শাম ও ইয়ামনের মধ্যস্থলে কোন খর্জুর বৃক্ষপূর্ণ আবাদী দেখিলেই তাহারা ভাবিত, হয়তো এই পল্লীতেই শেষ নবী প্রকাশ পাইবেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এ রকম প্রত্যেক পল্লীতেই তাহাদের এক একটি দল থাকিয়া যাইত। এরূপে তাহাদের এক দল মদীনায় আসিয়া বসতি বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা তওরাত কিতাবের নির্দেশ মতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর উপর ঈমান রাখিত এবং তাহাদের বংশধরদিগকে একথার প্রতি ঈমান রাখিতে উপদেশ দিত। কিন্তু হযরত মদীনায় আগমন করিলে তাহারা আনসারদের প্রতি শত্রুতাবশতঃ সত্য-ধর্মের আলো হইতে বঞ্চিত রহিল; কারণ আনসারগণ প্রথমেই ঈমান আনিয়াছিলেন। —এশাআতে ইসলাম

ইহুদীগণ যে পূর্ব হইতে হযরতের প্রতি বিশ্বাস রাখিত এবং তাহারা যে জানিয়া শুনিয়া ঈমান হইতে বিমুখ ছিল, কোরআন শরীফেও একথার উল্লেখ আছে।

www.nagorikpathagar.org

তফসীরে 'দুররে মনসূরে' আছে, আনসার সম্প্রদায়ের আমর ইবনে কাতাদা (রাঃ) বলেন, "মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের কোন সময় বিবাদ বাধিলেই তাহারা বলিত, এক নবীর আবির্ভাবের সময় অতি নিকটবর্তী, তিনি প্রকাশ পাইলেই আমরা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া কাফেরদিগকে বধ করিব। (ইহুদীরাও পৌত্তলিকদিগকে কাফের বলিত) অনন্তর শেষ পয়গম্বর আবির্ভূত হওয়ার পর আমরা তাঁহার তাবেদার হইয়াছি, আর পণ্ডিত ইহুদীগণ আমাদের প্রতি জাতক্রোধবশতঃ নাফরমান হইয়া রহিয়াছে।"

মদীনার ইহুদীদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জানা গেল। এখন আনসারদের পুরাতন ইতিহাস কতকটা জানা আবশ্যক।

কওমে সাবা ঃ

আনসারদের পূর্বপুরুষগণ ইয়ামন প্রদেশ হইতে মদীনায় আসিয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব বহু শতাব্দী আগে ইয়ামনের অন্তর্গত সাবা শহর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই সাবা শহরের রাণী বিলকীসের এক ঘটনা কোরআন পাকেও বিবৃত হইয়াছে। সাবা ইবনে ইয়াশহাব নামক এক বাদশাহ সর্বপ্রথম এখানে রাজত্ব করেন। তাঁহার নামানুসারেই এই শহরের নাম সাবা হইয়াছে। তাঁহার বংশধরগণ কওমে সাবা নামে পরিচিত হয়। তৎকালীন ইয়ামন রাজ্যের স্থাপত্য-শিল্প, বাগান ইত্যাদি এমনই উন্নত ধরনের ছিল যে, ইতিহাসে ইহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। ইয়ামনের আর এক নগরের নাম ছিল সানআ। এক কালে সানআ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল।

সাবা সম্প্রদায় যে এলাকায় বসতি করিত, সেখানে নদী ও খালের পানি দ্বারা কৃষিকর্ম ও বাগানে জল সেচনের কাজ চলিত। এই সমস্ত নদী ও খালে বৎসরের এক নির্দিষ্ট সময়ে বর্ষার পানির মত পানি দেখা দিত। ইহাতে তাহাদের এই অসুবিধা হইত যে, বর্ষার অতিরিক্ত পানিতে বাগান ও বাড়ী-ঘরের বিশেষ ক্ষতি হইত। এদিকে আবার আটকানো পানি সারা বৎসরের জন্য প্রচুর না হওয়ায় প্রায়ই তাহাদের মধ্যে পানি লইয়া ঝগড়া-বিবাদ চলিত। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে প্রজাবৃন্দের অনুরোধে রাণী বিলকীস দুইটি পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকার উভয় পার্শ্বে লৌহ ও সীসার সাহায্যে বিরাট প্রস্তর-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া পানি আটকাইয়া রাখার উপায় করিয়া দিলেন। ইহাতে পর্বত-গাত্র হইতে জলস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইয়া দেশে প্লাবন সৃষ্টি করাও বন্ধ হইল; অথচ প্রচুর পরিমাণে পানি আটকাইয়া থাকায় সারা বৎসরের কাজও নির্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। এই প্রাচীর-গাত্রে উপর-নীচ তিন সারিতে ছিদ্র-পথসমূহ রাখা ছিল। বৎসরের প্রথম অংশে উপরের পথগুলি খুলিয়া দেওয়া হইত। পানি কমিয়া গেলে মধ্যস্থলের দ্বার-শ্রেণী উন্মোচন করা হইত। আরও আবশ্যক হইলে নিম্নের দ্বারশ্রেণীও খোলা হইত। এইভাবে বৎসরের কোন অংশেই তাহাদিগকে পানির অভাব ভোগ করিতে হইত না। ইহাতে তাহাদের কৃষিকর্ম ও বাগানের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অভাব কাহাকে বলে তাহা তাহারা বুঝিতেই পারিত না।

কোন জাতি উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিলেই তাহারা সৃষ্টিকর্তার নাম বিস্মৃত হইয়া যায়; তখনই আবার তাহাদের অধঃপতনের সময় আসে। কওমে সাবার অবস্থাও তদ্রূপই হইল। তাহারা খোদা তা'আলার নাম ভুলিয়া দিবারাত্র আয়েশ-আরামে নিমগ্ন হইলে তাহাদের পতনকাল আসিল।

খোদা তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, তখন কোন তুচ্ছ জিনিস দ্বারাও আত্মগর্বে গর্বিত দুর্দম ক্ষমতাশালী জাতিকে ধ্বংস করিয়া থাকেন। সাবা সম্প্রদায়ের অবস্থা দৃষ্টে খোদা তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শনই প্রকাশ পাইতেছে। তাহাদের পতনের সময় সমুপস্থিত হইলে বাঁধান প্রাচীরের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে বড় বড় ইঁদুর দেখা দিল। দেশের লোকেরা ইঁদুর বিনষ্ট করার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ইঁদুরগুলি প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছিদ্র করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর একদিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল; সঙ্গেসঙ্গে জল-প্লাবন সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া দিয়া প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সাবা শহর নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। দেশের বাড়ী-ঘর, বাগান, গাছ-পালা বিনষ্ট হইল; প্লাবনের বালুকারাশি জমিয়া দেশের জমি কৃষির অযোগ্য হইয়া গেল, সাবাবাসিগণ যে যে দিকে পথ পাইল, ছুটিয়া পলাইল।

সাবা সম্প্রদায়ের এই উত্থান পতনের ভিতরে মানুষের শিখিবার মত অনেক উপদেশ নিহিত আছে। অহঙ্কার ও কৃতঘ্নতার পরিণাম দেখিয়া যাহাতে মানবজাতি সৃষ্টিকর্তার নিকট সর্বদা নত থাকে, এই উদ্দেশ্যে কোরআন পাকেও তাহাদের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۥ ۵ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

"কওমে সাবার জন্য তাহাদের দেশে ও বাসস্থানে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তাহাদের দেশের দক্ষিণে ও বামে বাগানের দুইটি সারি ছিল। তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, অবাধে আল্লাহ্‌র নেয়ামত উপভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি শোকর-গুযারী করিতে থাক। তাহাদের শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ছিল। প্রতিপালক আল্লাহ্ও তাহাদের প্রতি সদয় ও ক্ষমাশীল ছিলেন। কিন্তু তাহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকারে বিমুখ হওয়ায় তাহাদের উপর ধ্বংসকর জলপ্রবাহ পাঠান হইল।" —সূরা-সাবাঃ রুকূ ১

সাবা শহরের এই ধ্বংসলীলার কথা আরব দেশে লোকমুখে প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল। কাহারও ধ্বংসের উপমা দিতে হইলে তাহারা বলিত, "সাবার বংশধরদের মত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

আওস ও খাযরাজঃ

আমর এবং তাহার ভাই এমরান সাবা শহরের তৎকালীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। আমরই আনসার সম্প্রদায়ের আদি পিতা। সে সময় সাবা শহরে জ্যোতির্বিদ্যার খুবই প্রচলন ছিল। আমর নিজেও এই বিদ্যা জানিত এবং তাঁহার পরিবারের এক স্ত্রীলোক ইহাতে অত্যধিক পারদর্শিনী ছিল। তাহারা জ্যোতিষের গণনা দ্বারা প্লাবনের খবর পূর্বেই জানিতে পারিয়া সাবা পরিত্যাগপূর্বক দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। আমরের পুত্র সা'লাবা নানা দেশ হইয়া মদীনায় উপস্থিত হইল। এই সময় মদীনা শহরে ইহুদীগণ বাস করিতেছিল। সা'লাবা শক্তি সঞ্চয়করত মদীনার আদিম অধিবাসী ইহুদীদিগকে শহরের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। সা'লাবা-পুত্র হারেসার দুই সন্তান ছিল—আওস ও খাযরাজ। আনসারদের দুই গোত্র অর্থাৎ, আওস ও খাযরাজের সমস্ত লোক এই দুই ব্যক্তিরই বংশধর। সা'লাবার দ্বিতীয় ভাই হারেসা মক্কা শরীফের প্রাচীন অধিবাসী জুরহুম সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করিয়া কা'বা শরীফের মালিক হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি এক পাত্র মদ্যের পরিবর্তে কা'বা শরীফ বিক্রয় করিয়াছিল, একথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। সা'লাবার আর এক ভাই শাম দেশে বসতি বিস্তার করে এবং তথায় তাহাদের রাজত্ব গড়িয়া উঠে।

www.nagorikpathagar.org

ইহুদীদের ইতিহাসে বলিয়া আসিয়াছি যে, তাহারা তওরাত কিতাবের মারফতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর নবুওয়তের কথা অবগত ছিল। প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, আওস এবং খাযরাজ সম্প্রদায়ের লোকেরাও হযরতের নবুওয়তের বিষয় অবগত ছিল। আওস মৃত্যুর সময় তাহার পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া যে কবিতা পাঠ করিয়াছিল এবং যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সে হযরতের বিষয় অবগত ছিল। উক্ত কবিতার কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ

"যখন মক্কায় 'জমজম' কূপ ও কা'বার মধ্যস্থলে গালেবের[১] বংশে এক নবী প্রেরিত হইবেন, হে আমরের বংশধরগণ! সে সময় তোমরা নিজেদের শহরে থাকিয়া তাঁহার সাহায্য করিও; কারণ, সাহায্যের ভিতরেই সৌভাগ্য নিহিত আছে।" —এশাআতে ইসলাম

"তোমরা নিজেদের শহরে থাকিয়া সাহায্য করিও" এই কথা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে মদীনায় আসিবেন, ইহাও তাহার জানা ছিল। আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায় মদীনায় বহুকাল ইহুদীদের সংসর্গে ছিল। ইহুদীগণ যে অনেক সময় তাহাদিগকে শেষ নবীর আবির্ভাব ও তাঁহার সাহায্যে নিজেদের জয়ী হওয়ার কথা বলিত, তাহা পূর্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে হযরতের নবুওয়ত সম্পর্কে আনসারদের অবহিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। এমনও হইতে পারে যে, আনসারদের পূর্বপুরুষ সাবাবাসীদের মধ্যে যে জ্যোতিষ বিদ্যার প্রচলন ছিল, ইহার সাহায্যেই তাহারা পূর্ব হইতে শেষ নবীর কথা অবগত ছিল। সে যাহাই হউক না কেন, ইহুদী এবং আনসার উভয় সম্প্রদায়ই যে শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু আনসারদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকায় তাঁহারাই ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। ইহুদীরা গ্রন্থধারী ও বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া সকলেই আনসারদের প্রতি জাতক্রোধবশতঃ ইসলামের ন্যায় অফুরন্ত নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল।

মদীনার পুরাতন ইতিহাস পাঠে পাঠকদিগকে অনেকখানি ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আসল কর্তব্য ইসলাম প্রচারের একটি মূল যোগসূত্র জানা গেল যে, মদীনার লোকদের পূর্ব-লব্ধ জ্ঞান তাহাদের ইসলাম গ্রহণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের বহু যুগ পূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকা যে ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে, নিরপেক্ষ অমুসলিম পাঠকও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাববশতঃ এস্থলে অনেকের মনে হয়তো এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের নবী, ইহুদীরা ভিন্ন ধর্মের লোক হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করা এবং পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য কামনা করার তাৎপর্য কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে এ বিষয়ে আরো খানিকটা আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনায় ইসলাম ধর্মের সংজ্ঞা সম্পর্কে একটি বিশেষ তথ্যও অবগত হওয়া যাইবে।

ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ সংজ্ঞাঃ

সাধারণত লোকেরা ধারণা করে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর সময় হইতেই ইসলাম ধর্ম আরম্ভ হইয়াছে। এই ধারণা মোটেই ঠিক নহে। ইহাতে ইসলামের ব্যাপক অর্থকে নির্মমভাবে সঙ্কুচিত

টীকা

১ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এক পূর্বপুরুষের নাম গালেব ইবনে লুয়াই ছিল।

www.nagorikpathagar.org

করা হইয়া থাকে। প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ্ কর্তৃক মানবজাতির জন্য যে কর্মসূচী ও বিধি-ব্যবস্থা আসিয়াছে, তাহারই নাম ইসলাম। আল্লাহ্ যেমন এক, তাঁহার ধর্মও তদ্রূপ এক। সুতরাং জগতে যত পয়গম্বর ধর্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের ধর্মই অভিন্ন। সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র ধর্মই হইল—ইসলাম। আল্লাহ্ তা'আলা গুরু গম্ভীর স্বরে এই কথাই ঘোষণা করিতেছেন—

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

"আল্লাহ্র নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম।"

হযরত মূসা (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) তথা সমস্ত পয়গম্বরই ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। পয়গম্বরদের শরীঅতসমূহের হুকুম-আহকামে যে প্রভেদ দেখা যায়, এই প্রভেদ মূলগত নহে—শুধু বিধি-ব্যবস্থার প্রভেদ মাত্র। আল্লাহ্র অস্তিত্ব, একত্ব, গুণাবলী, ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস, বেহেশত-দোযখের প্রতি বিশ্বাস—এই সমস্ত মৌলিক কথা সমস্ত পয়গম্বরের শিক্ষাতেই এক। বিধি-ব্যবস্থায় যে প্রভেদ রহিয়াছে, উহার কারণও খুলিয়া বলিতেছি।

মানুষ প্রথমে শৈশব ও বাল্যকালের দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে ; পরে আবার বার্ধক্য আসিয়া দেখা দেয়। শিশুকে শাসন করার যে রীতি, তাহা যুবকের বেলায় অচল। আবার যুবকের প্রতি যে ব্যবস্থা, তাহাও বৃদ্ধের উপর প্রয়োগ করা যায় না। সমগ্র মানবজাতির সমষ্টিগত জীবনেও এক সময় শৈশব ও বাল্যকাল ছিল ; অতঃপর যৌবন ও সর্বশেষে বার্ধক্য আসিয়াছে। মানবজাতিকে শাসনে ও সুপথে রাখার জন্যই ধর্ম। সুতরাং মানবজাতির সমষ্টিগত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শাসন ব্যবস্থার তারতম্য হওয়াতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই ; বরং তদ্রূপ না হইলেই ব্যবস্থার ত্রুটি হইত। মানবজাতি প্রথমাবস্থায় শিশুর মতই সরল ছিল ; সুতরাং তাহাদের প্রতি ধর্মের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কড়াকড়ি রাখার আবশ্যক ছিল না। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) ও তাঁহার পরবর্তী কয়েক পয়গম্বরের এই কাল ছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় জনসমাজ অত্যন্ত দুর্দান্ত ও কঠিন হৃদয় হইয়া পড়িয়াছিল ; ইহাকে আমরা মানব জাতির যৌবন কাল বলিতে পারি। সেই সময় ধর্মের বিধানও অত্যন্ত কঠিন ছিল। মানুষ যেমন যৌবনকাল অতিক্রম করিলে তাহার বুদ্ধি-বিবেক পাকা হয়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় গ্রীক-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া ইহাকে সমষ্টিগত মানব জীবনের জ্ঞান পরিপুষ্টাবস্থা বলিয়াই অনুমিত হয়। এই সময়ের ধর্ম-বিধানসমূহও সহজ অথচ গভীরতাপূর্ণ। ধর্মের এই সবগুলি স্তরকে ইসলামেরই এক একটা সংস্করণ এবং প্রত্যেক পয়গম্বরকেই ইসলামের সেবক বলিয়া ধারণা করিতে হইবে।

আমরা দেখিতে পাই যে, বহুবিধ জাগতিক জিনিস বিভিন্ন সংস্করণ অতিক্রমকরত পূর্ণত্বে যাইয়া পৌঁছে। ইসলাম খোদার ধর্ম হইলেও ইহা জগৎবাসীর জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য পদার্থের মত ইহাও বিভিন্ন সংস্করণের পর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর সময়ে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে আর তাহাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ের মত জটিলতাও নাই ; আবার হযরত ঈসা (আঃ)-এর কালের মত তেমন শিথিলতাও নাই। বিশেষতঃ এই সময় ইসলামের আইন যে সমস্ত ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যুগের সব রকম পরিবর্তনেই তাহা সচল ও অব্যাহত থাকিতে পারিবে।

www.nagorikpathagar.org

এক্ষণে স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে ইসলামের প্রবর্তক না বলিয়া সংস্কারক ও পূর্ণত্ব সাধক বলাই অধিক শোভনীয় হইবে। বস্তুতঃ তিনি কোন নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন নাই। আদিকাল হইতে মানবজাতির জন্য যে ধর্ম নির্দিষ্ট আছে, তাহাকে পূর্ণত্ব দান করিয়াছেন মাত্র।

সমস্ত পয়গম্বরের ধর্মই যখন এক ইসলাম, তখন আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মে তওহীদের (একেশ্বরবাদিতার) বিপরীত যে মতবাদ আছে, তাহা ধর্মের বিষয়বস্তু নহে; কুসংস্কার জনিত মানব মস্তিষ্কের পরিকল্পনা মাত্র। এই সমস্ত অমূলক কথা জড়িত হওয়ার পর তাহাদের ধর্মের অবস্থা এমনই শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে যে, সত্য সনাতন ইসলামের সহিত উহার যোগ-সূত্রের সন্ধান পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত পয়গম্বরই অবগত ছিলেন যে, শেষ যুগে এক সংস্কারক আসিবেন, তাঁহার জন্মস্থান আরবের কোন এক পল্লীতে হইবে। তাঁহারা নিজেদের উম্মতের মধ্যেও এই সমস্ত কথা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহুদী আলেমগণ তাঁহাদের ধর্মের ভিতর যে কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং শেষ সংস্কারকের আগমনে যে ইসলামের বাস্তবরূপ ফুটিয়া উঠিবে, তাহাও তাঁহারা ভালভাবে জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন প্রতীক্ষা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আনসারদের সঙ্গে শত্রুতাবশতঃ সাধারণ ভাবে ইহুদী সমাজ ইসলাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাদের মধ্যকার কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

■

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

সত্যের সাক্ষ্য

হিজরতের পরেঃ

নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এখন জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছেন। মদীনাবাসিগণও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায় সাগ্রহে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফে গমনের নামই ইসলামের ইতিহাসে 'হিজরত' বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিজরতের পরেই ইসলামের নূতন যুগ আরম্ভ হয় এবং ইসলাম আরব দেশের চতুর্দিকে প্রসার লাভ করে। হিজরত হইতেই হিজরী সন আরম্ভ হইয়াছে।

হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ ও তরবারি ধারণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। কার্যতঃ তাঁহাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতাও ঐ সময় ছিল না। হিজরতের পরে তাঁহাদের অবস্থা কতকটা সবলভাব ধারণ করিল এবং আত্মরক্ষার কিছু ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে আসিল। কিন্তু এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, হিজরতের সঙ্গেসঙ্গেই মুসলমানগণ পরাক্রমশালী দলে পরিণত হইয়াছিলেন।

যদিও হিজরতের পরেই মুসলমানদের জন্য জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবং এই সময় বিধর্মীদের সঙ্গে কয়েকবার যুদ্ধও হইয়াছিল। এমন কি কোন কোন যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-ও যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু একথা অভ্রান্ত যে, এই সময়কার যুদ্ধ সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ছিল। বস্তুতঃ এই সময়েও মুসলমানগণ অত্যাচারিতই ছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় আশ্রয় লইয়াছেন; এখানেও তাঁহাদের নিরাপত্তা নাই— বারংবার মক্কার কাফেরগণ মদীনায় আসিয়া তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিতেছে। মদীনার ভিতরেও বিদ্রোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলিতেছে। এরূপাবস্থায়ও জেহাদের অনুমতি না হওয়ার অর্থ—নিজেদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সময় জেহাদের যে প্রথম আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, কেবল মাত্র অত্যাচার নিবারণ ও আত্মরক্ষার জন্যই এই সময়ে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। শুনুনঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط

"কাফেরগণ যাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এমন মুসলমানদিগকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল; কেননা, তাহারা অত্যাচারিত হইতেছে।" —সূরা-হজ্জঃ রুকু ৫

উল্লিখিত আয়াতের প্রতি দৃকপাত করিলে স্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে, এই সময় কেবল অত্যাচার নিবারণের জন্যই জেহাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; ধর্মপ্রচারের সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সময়কার যুদ্ধগুলির অবস্থা আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, মুসলমানগণ কেবল যে অত্যাচার নিবারণার্থেই জেহাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এমন নহে, জেহাদ ভিন্ন তাঁহাদের অস্তিত্ব

www.nagorikpathagar.org

বজায় রাখাও অসম্ভব ছিল। মদীনার মুষ্টিমেয় মুসলমানকে বিনাশ করার জন্য মক্কার মুশ্‌রিকরা বারংবার নর-রাক্ষসের আকারে ধাইয়া আসিয়াছিল। এরূপাবস্থায় কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই মুসলমানদের অস্ত্রধারণকে অন্যায়ের মধ্যে গণ্য করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের কোনটিতে মুসলমানগণও জয়লাভ করিতেন, কোনটিতে বিপক্ষও জিতিত; কিন্তু এমন একটি প্রমাণও পাওয়া যাইবে না যে, কোন যুদ্ধের সময় একটি লোককেও বলপূর্বক মুসলমান করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমরা এই পুস্তকের প্রথম দিকে ইসলাম প্রচারের যে কয়েকটি উপকরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সে সমস্তের ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। আসুন, আমরা হিজরতের পর ইসলাম প্রচারের কতিপয় নমুনা অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

আমরা প্রথমে বলিয়াছি, মদীনার ইহুদীগণ একথা অবগত ছিল যে, শেষ নবীর আবির্ভাবের সময় অতি নিকটবর্তী। কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন ইহুদীদের চিরশত্রু মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অনুবর্তী হইলেন, তখন এই গোত্রদ্বয়ের প্রতি জাত-ক্রোধবশতঃ তাহারা মুসলমানদেরও শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মক্কার মুশ্‌রিকদের পরে মুসলমানদের প্রতি ইহুদী সম্প্রদায়ের মত এমন ঘোর শত্রুতা ও শঠতা আর কেহই দেখায় নাই। এমন কি কোরআন পাকেও একথার উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুশ্‌রিকদের পরে ইহুদীর তুলনায় মুসলমানদের আর কোন বড় শত্রু নাই। মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এমন অনেক বিদ্বান লোক ছিলেন, যাঁহারা তওরাত কিতাব ভালরূপে বুঝিতেন। হাসীন ইবনে সালাম ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। আমরা এস্থলে হাসীন ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিব। হাসীনের ইসলামী নাম হইয়াছিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ ঃ

নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নাম এবং তাঁহার আকার-প্রকার সমস্তই পূর্ব হইতে অবগত ছিলাম। তাঁহার আবির্ভাবের সময়ও আমি জানিতাম। একদিন আমি বাগানে খেজুর গাছের উপর কোন কাজ করিতেছিলাম, এমন সময় কেহ আসিয়া কহিল, 'একটি লোক মক্কা শরীফ হইতে মদীনার নিকটবর্তী কোবা নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি নিজকে নবী বলিয়া প্রকাশ করেন।' তওরাত কিতাবের বর্ণনা মতে আমার ভালভাবেই জানা ছিল যে, শেষ নবীর আত্ম-প্রকাশের ইহাই সময়। এজন্য আমি পূর্ব হইতেই তাঁহার দর্শন লাভের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এক্ষণে এই খবর শুনিয়া আমার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। আমি গাছের উপর হইতেই 'আল্লাহু আকবর' রবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার এক ফুফু গাছের নীচে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তোমার সর্বনাশ হউক! কোথাকার একটি লোকের খবর শুনিয়া দেখিতেছি তুমি পাগল হইয়া উঠিলে। হযরত মূসা (আঃ) সশরীরে আগমন করিলেও তো বোধ হয় তোমার এমন অবস্থা হইত না।' আমি কহিলাম, 'ফুফুজী, ইনিও হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই। হযরত মূসা (আঃ)-এর মত সত্য-ধর্ম লইয়াই তিনি আসিয়াছেন।' তখন আমার ফুফী কহিলেন, 'তবে আমাদিগকে যে পয়গম্বরের খবর দেওয়া হইয়াছে, ইনিই কি সেই পয়গম্বর?' আমি বলিলাম, 'জি হাঁ, ইনিই তওরাত কিতাবে বর্ণিত আখেরী যমানার পয়গম্বর।'

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট কোবায় উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি পরিবারের সমস্ত লোককে ইসলামে দীক্ষিত করিলেন। —বোখারী

বোখারীর আর এক রেওয়ায়তে আছে, আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বাগানে খেজুর পাড়িতেছিলেন, এমন সময় হযরত (দঃ)-এর আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া তিনি হযরত (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি আপনাকে এমন প্রশ্ন করিব, নবী ব্যতীত যাহার সঠিক উত্তর অন্য কেহ দিতে পারিবে না; (১) কিয়ামতের প্রথম নিশানা কি? (২) বেহেশতী লোকদের সর্বপ্রথম খাদ্য কি হইবে? (৩) কোন সন্তান মাতার আকৃতি পায়, আবার কেহ পিতার আকৃতি পায়, ইহার কারণ কি?'

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইলেনঃ 'এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমিও পূর্বে জানিতাম না; এখনই জিবরায়ীল ফেরেশতা আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন। শুনুন, (১) কিয়ামতের প্রথম আলামত এই যে, ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব প্রান্তে একটা আগুন প্রকাশ পাইবে। লোকেরা আগুন দেখিয়া পশ্চিম দিকে ছুটিয়া পালাইবে। অগ্নি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকরত পশ্চিম দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিবে। (২) বেহেশতী-দের প্রথম খাদ্য হইবে মাছের কলিজা দ্বারা প্রস্তুত কাবাব। (৩) তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—পিতার বীর্য যদি জরায়ুতে প্রথমে পৌঁছে, তবে সন্তান পিতার আকৃতি পায়; আর মাতার আর্তব ধাতু প্রথমে পৌঁছিলে সন্তান মাতার আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।'

প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া ইবনে সালাম তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র সত্য রাসূল।"

—মেশকাত

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর যেমন বিশিষ্ট সাহাবাদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, ইসলামের পূর্বেও তেমনি ইহুদী সমাজে বিদ্যা, ধর্মপরায়ণতা এবং বংশ-মর্যাদার দিক দিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই হিসাবে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের যতখানি গুরুত্ব, অন্য কোন ইহুদীর মুসলমান হওয়ার মধ্যে ততখানি গুরুত্ব নাই। ইসলামের পূর্বে মদীনার সমস্ত ইহুদীগণই তাঁহাকে মান্য করিত। কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে শঠতা, মিথ্যাবাদীতা এবং দুষ্টবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল থাকায় ইবনে সালামের ভয় হইল। দুষ্ট প্রকৃতির ইহুদী সমাজ তাঁহার আদর্শে ঈমান তো আনিবেই না; বরং তাঁহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেও হয়তো ছাড়িবে না। এই ভয়ে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণ ব্যাপার প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তাঁহার প্রতি ইহুদীদের ধারণা কিরূপ, একথা কৌশলে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। ইবনে সালাম (রাঃ) নিজেই বলিতেছেনঃ

"ইহুদীদের ভয়ে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে একদা আমি নিবেদন করিলাম, হুযূর! ইহুদীরা অত্যন্ত দুষ্ট লোক। আমার মুসলমান হওয়ার খবর জানিতে পারিলে নিশ্চয় তাহারা আমার উপর নানাবিধ অলীক দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিবে। আমাকে গোপনে রাখিয়া এখনই ইহুদীগণকে ডাকিয়া আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখুন।" হযরত (দঃ) তাহাই করিলেন। ইহুদীরা আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক?" তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ বংশের লোক। তিনি আমাদের সরদার এবং সরদারের ছেলে।" তখন হযরত (দঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে

www.nagorikpathagar.org

তোমরা তাঁহাকে কি বলিবে?” তাহারা কহিল, “আল্লাহ্ তাঁহাকে এমন কাজ হইতে রক্ষা করুন। তবে তিনি মুসলমান হইলেও আমরা তাঁহার প্রতি ভক্তি পোষণ করিতে বিরত হইব না।”

এমন সময় ইবনে সালাম পর্দার আড়াল হইতে বাহির হইয়া সর্বসমক্ষে ইসলামের কলেমা পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহুদীরা তখন বলিয়া উঠিল, “ইনি নিতান্ত অসদ্বংশজাত এবং অসৎ প্রকৃতির লোক।” ইবনে সালাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে আরয করিলেন, “হযরত! আমি ইহার জন্যই ভয় করিতেছিলাম।”

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ব্যাপার হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারিলাম।

কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ

প্রথম ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এখনও মদীনার ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। মদীনার নিকটস্থ কোবা নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছেন মাত্র। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এতদবস্থায় তাঁহার খবর শুনিয়াই এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, গাছের উপর হইতেই তকবীর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কেহ ইসলামের বাণী শুনানেরও আবশ্যক হইল না, নিজে নিজেই উপস্থিত হইয়া তিনি মুসলমান হইলেন। এখন বলুন, ইসলাম প্রচারের ভিতর এক্ষেত্রে জোরজবরদস্তির স্থান কোথায়?

দ্বিতীয় ঃ ইবনে সালাম পূর্ব হইতেই শেষ নবীর নিদর্শন ও আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি প্রায় নিঃসন্দেহ ছিলেন। তবুও তিনি তিনটি এমন প্রশ্ন করিলেন, যাহার উত্তর নবী ভিন্ন আর কেহ দিতে পারেন না। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়াতে তাঁহার আর কোন সন্দেহই রহিল না যে, ইনিই শেষ নবী। তাঁহার অন্তর সরল ও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল; সুতরাং তিনি সত্যধর্ম গ্রহণপূর্বক পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

তৃতীয় ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। ইহুদী ধর্মে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি সাধারণ কথার উপরে অথবা অস্থায়ী উত্তেজনার বশে ধর্ম পরিবর্তন করিবেন, কখনও এমন ধারণা করা যাইতে পারে না। আমরা উপরে বোখারী শরীফের যে হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ধীরভাবে পাঠ করিয়া দেখুন। তাহাতে স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্বলব্ধ জ্ঞানই তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণ হইয়াছিল।

চতুর্থ ঃ মানুষ যে জিনিসকে ভালবাসে, সর্বদাই উহার আলোচনা করে। ইবনে সালামও যে অনাগত নবীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সর্বদাই যে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করিতেন, এই সূত্রেই তাহা বুঝা যাইতেছে। ইবনে সালামের ফুফুর সেই কথাটি স্মরণ করুন, “তবে কি ইনিই সেই নবী?” ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, ইবনে সালাম সর্বদাই এক নবীর আবির্ভাবের কথা বলিতেন। তাঁহার পরিবারস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একথা ভালরূপে অবগত ছিল এবং সকলে ইহা বিশ্বাসও করিত। একমাত্র এই বিশ্বাসেরই ফলে ইসলাম গ্রহণের পর ইবনে সালাম ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পরিবারস্থ সমস্ত লোক দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া পৈতৃক ইহুদী ধর্মকে চিরতরে বিসর্জন দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

মুসলমান হওয়ার পরেও ইবনে সালাম বিভিন্ন সূত্রে একথা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি তওরাত কিতাবে শেষ নবীর নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সে সমস্ত নিদর্শন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। এ সমস্ত ঘটনা অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে

www.nagorikpathagar.org

বিবৃত হইয়াছে। আমরা এস্থলে মোহাদ্দেস দেহ্লবী (রঃ) কৃত মাদারেজুন্ নবুওয়ত হইতে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

নবুওয়ত সম্বন্ধে সাক্ষ্য

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ঃ

একদা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইবনে সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তো মদীনাবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম। আপনাকে খোদার শপথসহ জিজ্ঞাসা করিতেছি, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আমার উল্লেখ আছে কিনা।"

ইবনে সালাম (রাঃ) একথার উত্তরে আল্লাহ্র শপথসহ কহিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এবং আপনার ধর্মকে নিশ্চয়ই প্রবল করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আপনার গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি।"

অনন্তর তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে হযরত (দঃ)-এর যে সমস্ত গুণাবলী লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথাও ছিল ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বলিয়াছেন যে, শেষ পয়গম্বর কঠোর-স্বভাব এবং কঠিন-হৃদয় লোক হইবেন না। বাজারের ভিতরে যেমন অসভ্য লোকেরা চীৎকার করে, তেমন অভ্যাস তাঁহার থাকিবে না। তিনি অনিষ্টের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন না; সর্বদা দয়া ও মার্জনা করিবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আচরণে উল্লিখিত গুণাবলী যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করিত। হাটে-বাজারে চীৎকার করা তো দূরের কথা, সম্ভ্রম এবং গাম্ভীর্যের বিপরীত কোন কাজই তিনি কোন সময় করেন নাই। তাঁহার পবিত্র জীবনীতে এমন একটি ঘটনাও কেহ্ দেখাইতে পারিবেন না যে, তিনি কোন সময় নিজের ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন।

কা'ব আহ্বার ঃ

ইবনে সালামের মত কা'ব আহ্বারও ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি হযরত ওমরের খেলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তওরাত কিতাবে কি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বর্ণিত হইয়াছে?" কা'ব কহিলেন, এইভাবে বর্ণিত আছে, "আবদুল্লাহ্ তনয় মুহাম্মদ আমার (আল্লাহ্র) মনোনীত বান্দা, তাঁহার জন্মস্থান মক্কা, হিজরতের জায়গা মদীনা এবং তাঁহার রাজত্ব হইবে শাম দেশে। তাঁহার ব্যবহার ও মনোভাব কঠিন হইবে না, হাটে-বাজারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিবেন না, অনিষ্টের প্রতিশোধ স্বরূপ অনিষ্ট করিবেন না; বরং কৃপা ও মার্জনা করিবেন।" —মাদারেজ

কা'ব আহ্বারের এই রেওয়ায়তে আরও স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তওরাত কিতাবে হযরতের নাম, তাঁহার পিতার নাম এবং তাঁহার জন্মস্থানের নাম পর্যন্ত লিখিত ছিল। এই রেওয়ায়তের শেষাংশে আছে যে, তওরাত কিতাবে নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতের কথাও এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

www.nagorikpathagar.org

"তাঁহার উম্মতগণ দুঃখে ও সুখে আল্লাহ্‌র শোকর করিবে, প্রত্যেক উচ্চস্থানে তকবীর বলিবে, নিম্নস্থানে খোদার প্রশংসাবাদ করিবে,[১] নামাযের সময়ের জন্য সূর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, ভূ-পৃষ্ঠের সব জায়গায়ই তাঁহারা নামায পড়িবে,[২] তাহারা টাখ্‌না এবং হাঁটুর মধ্যস্থল পর্যন্ত পায়জামা, লুঙ্গি পরিবে, ওযূ করিবে, তাহাদের আহ্বানকারী ঊর্ধ্বে উঠিয়া আহ্বান করিবে[৩] তাহাদের নামাযের কাতার এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কাতার এক রকম হইবে, রাত্রে তাহাদের দলে মধুমক্ষিকার মত গুন্ গুন্ শব্দ হইবে।"[৪]

ফলকথা, ইবনে সালাম (রাঃ)-এর বর্ণনা ব্যতীত আরও বিভিন্ন বর্ণনায় একথা জানা যায়। পাঠকগণ! ইবনে সালাম, কা'ব আহবার এবং এই শ্রেণীর বর্ণনাকারীদিগকে যদি কেবল সাহাবী এবং মুসলমান হিসাবে দেখেন, তবে ঠিক হইবে না। তাঁহারা যে ইহুদীদের ধর্মনেতা এবং তওরাত কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলেম ছিলেন, তাঁহাদের এই দিকটার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া মিথ্যা কথা বলিবেন এবং এমন একটি মিথ্যার পিছনে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিবেন, এমন ধারণা করার কোন কারণই থাকিতে পারে না। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় মুসলমানদের হাতে কোন ক্ষমতাও ছিল না এবং তাঁহাদের নিকট কোন প্রকার প্রলোভনদ্রব্যও ছিল না। তাহা হইলেও বলা চলিত যে, হয়তো এই নও-মুসলিমগণ চাপে পড়িয়া অথবা প্রলোভন-মুগ্ধ হইয়া এ সমস্ত মনগড়া কথা বলিয়াছিলেন; বরং ইহার বিপরীতভাবে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা এই সময় নূতন ধর্মমত গ্রহণ করিয়া সমগ্র দুনিয়াবাসীর শত্রুতার চাপে পতিত হইয়াছিলেন। বিশেষ রূপে আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন অনেক দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই, যাহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে নাই; অথচ তাহারাও একথার স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, তওরাত ও ইন্‌জীল কিতাবে শেষ নবীর নিদর্শনসমূহ লিখিত আছে।

আবু আমের রাহেব:

আবু আমের রাহেব আওস সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী পুরুষের নাম। ইহুদীদের সঙ্গে তাহার খুব সংস্রব ছিল। সে ইহুদীদের নিকট জানিতে পারিয়াছিল যে, অতিশীঘ্র শেষ পয়গম্বর মদীনায় আবির্ভূত হইবেন। অনন্তর সে তায়মা নামক স্থানে যাইয়া তথাকার ইহুদীদের নিকটেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহারাও এই একই কথা বলিল। তৎপর শাম দেশের খৃষ্টানদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াও সে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। তাহারাও এরূপ খবরই দিল। ইহাতে একথায় তাহার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। অতঃপর সে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্বক সংসারবিরাগী হইয়া 'রাহেব' বা সন্ন্যাসীর পোষাক পরিধান করিল এবং শেষ নবীর প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতে লাগিল। ইহাতে দরবেশ বলিয়া সমাজে তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জন্মিল। কিন্তু উত্তরকালে এই প্রতিপত্তিই তাহার পক্ষে কাল হইয়া দাঁড়াইল।

টীকা

১ হজ্জের সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া হাজিগণ 'তল্‌বিয়াহ' পাঠ করেন, সম্ভবতঃ একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ গীর্জা এবং কানিছা ব্যতীত অন্য স্থানে নামায পড়িতে পারে না। সুতরাং সর্বত্র নামায পড়ার বিধান হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

৩ মিনারার উপরে চড়িয়া আযান দিবে।

৪ রাত্রে যিকর ও ওযীফা পাঠকারী দলের মধ্যে এ রকমই হইয়া থাকে।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন। মদীনার লোক দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া সত্য ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন আবু আমেরের মনে হিংসা জন্মিল—আমি এতকাল যোগসাধনা করিলাম, এত লোক আমার তাবেদার হইল, আর এখন কি-না আমাকে বিদেশ হইতে আগত এক অপরিণত বয়স্ক লোকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

একবার আবু আমের রাহেব হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোন্ ধর্মমত নিয়া আসিয়াছেন?' হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, আমি কোন নূতন ধর্ম প্রচার করিতেছি না, মিল্লাতে ইবরাহীমের সংস্কারের জন্যই আসিয়াছি। আমার আগমনের কথা তুমিও তো ইতিপূর্বে ইহুদীদের নিকট শ্রবণ করিয়াছ।

আবু আমের কহিল, 'এক পয়গম্বরের সংবাদ অবশ্য আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই নবী এখনও আসেন নাই। আপনি নবুওয়তের মিথ্যা দাবী করিতেছেন।' হযরত (দঃ) বলিলেন, 'তুমি জানিয়া শুনিয়াও সত্য গোপন করিতেছ এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছ। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, সে সত্যবাদীর জীবদ্দশায়ই প্রবাসে নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণ হারাইবে।'

আবু আমের চলিয়া গেল। এতদিন সে শেষ নবীর প্রতীক্ষায়ই সন্ন্যাসীর বেশে কালযাপন করিতেছিল। কিন্তু এখন হিংসা-দ্বেষ তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে মদীনা ত্যাগকরত মক্কায় গিয়া আবার পৌত্তলিক ধর্মমত গ্রহণ করিল। একদা ঘটনাক্রমে সে শাম দেশের দিকে চলিল। এক্ষণে হযরত (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বার্তা পূর্ণ হইল। আবু আমের প্রবাসে নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিল। —মাদারেজুন্ নবুওয়ত

আবু আমের রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত স্বীকার না করিলেও নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই একথা বুঝিতে পারেন যে, তাহার ঘটনার মধ্যেও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত এবং ইসলাম ধর্মের সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

(ক) যদিও আবু আমের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে নবুওয়ত স্বীকার করে নাই, তবুও সে নিজেই সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, এক নবীর আবির্ভাবের সময় আসিয়াছে, যিনি মদীনাতেই হিজরত করিয়া আসিবেন। হযরত (দঃ)-এর পর আর কোন্ নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং কোন্ নবী মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন?

(খ) হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আবু আমের ধর্মের ছায়ায় আসিবে না এবং প্রবাসে তাহার অপমৃত্যু ঘটিবে। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। ইহা কি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

আবু আমেরের ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাও পাইতে পারি যে, মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধিও অনেক সময় কাজে আসে না। খোদা তা'আলার অনুগ্রহ না হইলে মানুষ কখনও সুপথ পাইতে পারে না। বর্তমান সময়েও ভিন্নধর্মের এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির সহায়তায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার দরুন তাঁহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ইসলামের প্রতি সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

www.nagorikpathagar.org

হযরত হান্‌যালা (রাঃ)ঃ

আবু আমের রাহেবের কথা প্রসঙ্গে আমরা তাহার কৃতিসন্তান হযরত হান্‌যালার কথা না বলিয়া পারিলাম না। হযরত হান্‌যালা নবী সমীপে উপনীত হইয়া স্বেচ্ছায় দ্বীন ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইলেন। হান্‌যালা (রাঃ) ইসলাম-জগতে 'গাসীলে-মালায়েকা' এই সম্মানজনক উপাধিতে পরিচিত। শাহাদাতের পর ফেরেশতাগণ কর্তৃক তাঁহার গোসল সম্পন্ন হইয়াছিল, এইজন্যই তাঁহাকে 'গাসীলে-মালায়েকা' বলা হয়।

সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস হাকেম 'মুস্তাদরাক' কিতাবে বর্ণনা করিতেছেন, 'ওহুদ যুদ্ধের দিনই হযরত হান্‌যালার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম মিলন-রজনী প্রভাত হওয়ার পূর্বেই তিনি জেহাদের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। জেহাদের ডাকে সত্যিকার মুজাহিদের ধমনীতে তাজা খুনের ঢেউ খেলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, হযরত হান্‌যালার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি শহীদ হইয়াছেন।'

যাঁহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হন, ইসলামের ব্যবস্থা মতে রক্তাক্ত দেহে বীরবেশেই তাঁহাদিগকে সমাহিত করা হয়। অন্যান্য মৃতদের মত তাঁহাদিগকে গোসল দিতে হয় না। ওহুদ যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণকেও গোসল দেওয়া হইল না। কিন্তু হযরত (দঃ) দেখিতে পাইলেন, আসমান হইতে ফেরেশতাগণ আসিয়া হান্‌যালাকে গোসল দিতেছেন। নবী করীম (দঃ) লোকদের নিকট একথা প্রকাশ করিলে অনেকে তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। স্ত্রী কহিলেন, 'হান্‌যালার উপর গোসল ফরয ছিল, এরূপাবস্থায় তিনি জেহাদের আহ্বান শুনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।' কথিত আছে , হযরত (দঃ)-এর নিকট এই অলৌকিক সংবাদ জানিতে পারিয়া অনেকে হান্‌যালার মৃতদেহ পরীক্ষা দ্বারা তাহাতে গোসলের চিহ্ন স্বচক্ষে দেখিতে পায়।

আমরা কথা প্রসঙ্গে কিছু দূরে আসিয়া পড়িলেও আমাদের প্রত্যেকটি কথাই মূল আলোচ্য বিষয়—ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করি। বলিতেছিলাম, তওরাত ও ইন্‌জীল কিতাবে যে শেষ নবীর নাম-ধাম, তাঁহার গুণাবলী এবং তাঁহার উম্মতের নিদর্শনসমূহ লিখিত ছিল, তাহা বিভিন্ন সূত্রেই জানা যায়। এই সমস্ত নিদর্শনকে খৃষ্টান ও ইহুদীগণ নিজেদের ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর ভাবিয়া এগুলিকে পরিবর্তিত করিয়াছিল। কিন্তু তওরাত এবং ইন্‌জীল পাঠে দেখা যায় যে, এই পরিবর্তনের পরেও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পরোক্ষভাবে এখনও শেষ নবীর উল্লেখ রহিয়াছে।

তওরাত কিতাবে শেষ নবীর উল্লেখঃ

আমরা পূর্বে একথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছি যে, তওরাত ও ইন্‌জীল গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদই বর্তমানকালে জনসমাজে তওরাত ও ইন্‌জীল বলিয়া পরিচিত। প্রচলিত অনুবাদ অবলম্বনে ইসলামের আলেমগণ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তওরাত এবং ইন্‌জীল কিতাবে এখনও শেষ নবীর উল্লেখ বিদ্যমান রহিয়াছে। আলেমগণ এ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাওলানা হাবীব কেরানবী সাহেবের 'এজহারুল হক' সমধিক প্রসিদ্ধ। এই মাওলানা সাহেব ইউরোপ হইতে আগত অনেক পাদরীকেই সম্মুখ-তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। মাওলানার 'এজহারুল হক' এখনও অক্ষতদেহে বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহই উহার প্রমাণাদি খণ্ডন করিতে পারে নাই। দিল্লীর স্বনামধন্য মোহাদ্দেস মাওলানা আবদুল হক মরহুম 'মাদারেজুন্ নবুওয়ত' কিতাবে পার্সী তওরাতের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিতেছি—

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ সোবহানাহু 'সীনায়' স্বীয় নূর প্রকাশ করিলেন, 'সাঈর'কে আলোকিত করিলেন, 'ফারানে' বিকাশ লাভ করিলেন। —মাদারেজ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৮

'সীনা' একটা পাহাড়ের নাম, যাহাকে 'তূরে-সীনা' এবং 'তূরে-সীনীন'ও বলা হয়। প্রচলিত কথায় ইহার নাম 'কূহে-তূর'। খোদা তা'আলা 'তূরে-সীনা' পাহাড়ে নিজের নূর প্রকাশ করিয়া হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে তওরাত কিতাব দান করিয়াছিলেন। 'সাঈর' বায়তুল মুকাদ্দসের নিকটস্থ একটি পাহাড়ের নাম। এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হইয়াছিল এবং এখানেই তিনি পয়গম্বরী লাভ করিয়াছিলেন। 'ফারান' হিব্রু ভাষায় মক্কাস্থিত হেরা পর্বতের নাম। এখানে শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল।

খৃষ্টান এবং ইহুদী ধর্মজ্ঞ-সমাজও স্বীকার করেন যে, সীনা পাহাড়ে আল্লাহ্র নূর প্রকাশ পাওয়ার অর্থ তওরাত কিতাব অবতীর্ণ হওয়া; তদ্রূপ সাঈরে নূর প্রকাশের মর্ম ইন্জীল অবতীর্ণ হওয়া। অতএব, ফারানে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ যে, কোরআন নাযিল হওয়া—ইহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

অবশ্য কেহ যদি বলিতে চাহেন যে, ফারান মক্কার পাহাড়ের নাম নহে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, সেই পাহাড়টি তবে কোথায়? তাহাতে আল্লাহ্র নূর প্রকাশ পাওয়ারই বা কি অর্থ? আরও দেখুন, তওরাত কিতাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমকে বলিলেন, 'ইবরাহীম! হাজেরা বিবি ও তৎপুত্র ইসমাঈলকে ফারানে স্থাপন কর।" একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ইবরাহীম (আঃ) পুত্রসহ বিবি হাজেরাকে মক্কার প্রান্তরে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ফারান যে মক্কা অথবা উহার মধ্যস্থ পাহাড়ের নাম, এ বিষয়ে কোন তর্কই বাকি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখুন, কোরআন শরীফের মধ্যস্থতায় যেমন সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহ্র নূর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই।

'মাদারেজুন্ নবুওয়তে' তওরাতের আর একটি মন্তব্য লিখিত হইয়াছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিলেনঃ

"তোমার প্রতিপালক তোমার ভাইদের মধ্য হইতে বনী ইসরায়ীলদের জন্য এক নবী পয়দা করিবেন।"

হযরত মূসা আলাইহিস্সালাম এবং তাঁহার সম্প্রদায় হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরগণ তাঁহাদের ভাই। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে আর কোন নবী নাই। তাঁহার বংশে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, তওরাতের এই বক্তব্য বিষয়ে শেষ নবীর নবুওয়তের কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে।

ইন্জীল কিতাবে শেষ নবীর উল্লেখঃ

তওরাতের মত ইন্জীল কিতাবেও শেষ নবীর উল্লেখ এখনও বিদ্যমান আছে। ইসলামের আলেমগণ বিভিন্ন গ্রন্থে ইহারও আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু খৃষ্টান-জগৎ ইহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

www.nagorikpathagar.org

মোল্লা আলী কারী (রঃ) 'শরহে শেফা' কিতাবে অধুনা প্রচলিত আরবী ইন্‌জীলের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

"হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এক 'ফারকালিত' প্রার্থনা করিব, যিনি তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকিবেন।"

'ফারকালিত' হিব্রু ভাষার শব্দ। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি—ইহার অর্থ হয়—গুপ্ত-তত্ত্ববিদ। কোন কোন খৃষ্টান ধর্মবেত্তা এই শব্দের অর্থ 'আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী' এবং 'মুক্তিদাতা' লিখিয়াছেন। সর্বাবস্থায়ই এই শব্দ দ্বারা শেষ নবীর প্রতি ইঙ্গিত হয়। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর আমাদের পয়গম্বর (দঃ)-এর মত আর কোন গুপ্ত-তত্ত্ববিদ খোদার প্রশংসাকারী এবং মুক্তির সন্ধানদাতাই আগমন করেন নাই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্ত-তত্ত্ববিদ ছিলেন। আল্লাহ্‌র 'হামদ' বা প্রশংসাবাদের শিক্ষা কোরআন পাকে যেমন আছে, আর কোথাও তেমন নাই। বাকি রহিল মুক্তিপথের কথা—শেষ নবীর কল্যাণে জগদ্বাসী যে চরম মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে, তেমন আর কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) বলিয়াছিলেন, 'ফারকালিত' তোমাদের সাথে চিরকাল থাকিবেন। মানুষ চিরকাল থাকে না, মানুষের স্মৃতি ও প্রভাব চিরকাল থাকে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপদেশ দুনিয়ায় যেমন পূর্ণরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তেমন আর কোথাও আছে কি? আমরা খোদার প্রেরিত সমস্ত পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি পোষণ করি—ঈমান রাখি; কিন্তু তৎসঙ্গে একথার প্রতিও বিশ্বাস রাখি যে, প্রলয়কাল পর্যন্ত কেবল শেষ নবী প্রচারিত ধর্মমতই অবিকৃত ও অক্ষত থাকিবে।

হযরত মসীহ (আঃ) 'ফারকালিত' সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলিও বলিয়াছেন ঃ

(ক) ফারকালিত তোমাদের জন্য অনেক গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিবেন। তিনি আমার প্রতি সাক্ষ্য দিবেন, যেমন আমি তাঁহার প্রতি সাক্ষ্য দিতেছি।

(খ) সমস্ত পৃথিবীর লোকেও ফারকালিতকে বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

(গ) আমি না যাওয়া পর্যন্ত ফারকালিত আসিবেন না। ফারকালিত আসিয়াই দুনিয়াবাসীকে পাপকর্মে ভয় প্রদর্শন করিবেন।

(ঘ) তিনি নিজের মনগড়া কথা বলিবেন না। প্রেরকের নিকট হইতে যাহা শুনিবেন, কেবল তাহাই তিনি বলিবেন। —মাদারেজ, প্রথম খণ্ড

এক্ষণে পাঠকগণ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া বলুন, এই সমস্ত বিষয়ই কি আমাদের হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান নাই?

ইসলামের আলেমগণ, ইন্‌জীল কিতাবের বিভিন্ন অনুবাদ হইতে যে সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, খৃষ্টান-জগৎ এগুলির কোনই প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা বলি—বর্তমানে প্রচলিত ইন্‌জীল ও তওরাতে যদি শেষ নবীর কোন প্রকার উল্লেখ না-ও থাকিত, তবুও অভ্রান্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে বলা চলিত যে, পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে অবিকৃত গ্রন্থদ্বয়ে হযরত (দঃ)-এর উল্লেখ নিশ্চয়ই ছিল। কোরআন পাকেও একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

اَلنَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۙ

www.nagorikpathagar.org

"তাহারা তাহাদের নিকট লিখিত ·ওরাত এবং ইন্‌জীলের মধ্যে নবীয়ে উম্মীর (শেষ নবীর) উল্লেখ প্রাপ্ত হইতেছে।" —সূরা আ'রাফঃ রুকূ ১৯

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিতেও একথা বুঝা যায় যে, তওরাত এবং ইন্‌জীলের ভিতরে যদি শেষ নবীর কথা না থাকিত, তবে কোরআন পাকের এই ঘোষণা ইসলাম প্রচারের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর হইত। খৃষ্ট ও ইহুদী ধর্মের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ঘোষণা দেখিয়া ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া পড়িত অথবা ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিত। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না যে, কেহ সেকালে ইহার কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে একথার স্বীকারোক্তির ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণঃ

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর ঘটনা হইতেও চমকপ্রদ আর এক ঘটনা এক্ষণে বলিতেছি। তাহা হইতেছে, সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।

হযরত সালমানের জন্মস্থান পারস্য দেশ। ইসলামের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল 'মাবা'। তিনি পারস্য রাজবংশের লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা স্থানীয় জমিদার ছিলেন। সালমান ফারেসীর বয়স অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখিয়াছিলেন। এই হিসাবে তিনি ছয়শত বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত ছিলেন। কাহারও মতে তাঁহার বয়স ৩৫০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রথম বয়সে পারস্য দেশে প্রচলিত অগ্নি উপাসনার নিয়ম পালন করিতেন। তিনি ও তাঁহার পিতা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পিতা যত্ন সহকারে পুত্রকে নিজেদের ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল। যাহাতে সালমান বাহিরের আবহাওয়া পাইতে না পারেন, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সর্বদা চোখের সম্মুখে রাখিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি একদিন খৃষ্টানদের এক গীর্জায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নামায পড়িতে দেখিলেন এবং ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত ভাল বোধ হইল। সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে পৈতৃক ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি গীর্জাতেই অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি গীর্জার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ধর্মের উৎপত্তিস্থল কোথায়?" তাহারা কহিল, "শাম দেশে।"

সন্ধ্যার পর তিনি বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার পিতা পুত্রের অমঙ্গল আশংকা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট গীর্জায় গমনের ঘটনা প্রকাশ করিলেন এবং তৎসঙ্গে ইহাও কহিলেন যে, তাঁহার নিকট খৃষ্টধর্ম অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। পিতা তাঁহাকে নানাভাবে নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সালমান পিতৃধর্ম বর্জনকরত ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তাঁহার পিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া সালমানের হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

আবদ্ধ থাকিয়াও সত্যান্বেষী সাধক পুরুষ সালমানের মন মুক্ত বিহঙ্গমের মত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। অগ্নি-পূজারূপ পিঞ্জরে কিছুতেই তিনি মনকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি সুযোগ বুঝিয়া হাত-পায়ের বেড়ি খুলিয়া ফেলিলেন এবং শাম-দেশ-যাত্রী একদল বণিকের সঙ্গে মিশিয়া খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রস্থল শাম দেশে পৌঁছিলেন। তথাকার নাসারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনাদের মধ্যে বড় বিদ্বান কে?" লোকেরা বড় পাদরীর ঠিকানা বলিয়া দিল। তিনি পাদরীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আপনার নিকট থাকিয়া আল্লাহ্‌র বন্দেগী

www.nagorikpathagar.org

করিতে ও খৃষ্টধর্ম শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করি। পাদরী ইহাতে সম্মত হইলে তিনি তাহার নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পাদরী অত্যন্ত কপট প্রকৃতির লোক ছিল। সে লোকদিগকে তো দান-খয়রাতের ফযীলত শুনাইত, কিন্তু নিজে খয়রাতপ্রাপ্ত টাকা জমা করিয়া রাখিত। এমন কি তাহার নিকট সাত মটকি স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা হইয়াছিল। হযরত সালমানের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই পাদরীর মৃত্যু হইলে পর তিনি সকলের নিকট তাহার গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিলেন। লোকেরা এই বক-ধার্মিকের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়া তাহার জানাযা পড়াও পছন্দ করিল না। ফলে তাহার মৃতদেহ শৃগাল, কুকুরের আহারে পরিণত হইল।

পাদরীর মৃত্যুর পর আর এক ধর্মপরায়ণ পাদরীকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হইল। এই পাদরী বাস্তবিকই অত্যন্ত সৎলোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সালমান বলিলেন, "আমাকে কিছু অন্তিম উপদেশ দান করুন।" পাদরী কহিলেন "মুসেল শহরে এক দ্বীনদার পাদরী আছেন। আমার মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট চলিয়া যাইও।" উপদেশ মত তিনি মুসেল শহরে চলিয়া গেলেন। এই পাদরীও অত্যন্ত নেককার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে সালমান উমুদিয়া নামক স্থানে আর এক পাদরীর আশ্রয়ে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট নিজের আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল তিনি সালমানকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সালমানের ভাগ্য তাঁহাকে অন্য কোন অদৃশ্য জগতের দিকে টানিতেছে, তিনি এখানে কিরূপে স্থায়ী হইতে পারেন? এই পাদরীরও অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে সালমান (রাঃ) তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "আপনার পর আমি কোথায় আশ্রয় লইব? কাহার নিকট পরকালের পথ পাইব?" তদুত্তরে পাদরী বলিলেন—

"প্রিয় সন্তান, আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা যে ধর্মপদ্ধতির উপর ছিলাম, তাহাতে আর কোন উপযুক্ত লোকই দেখিতেছি না। অবশ্য এক নবীর যমানা অতি নিকটবর্তী ; যিনি হযরত ইবরাহীম-এর ধর্মমত সহ প্রেরিত হইবেন। তিনি আরব দেশে প্রকাশ পাইবেন।" —জমউল-ফাওয়ায়েদ

পাদরী আরও কহিলেন, "তাঁহার বিশেষ নিদর্শন এই যে, তিনি জন্মভূমি ছাড়িয়া এক খর্জুর বৃক্ষপূর্ণ স্থানে প্রস্থান করিবেন। তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে 'মোহরে নবুওয়ত'-এর চিহ্ন থাকিবে, তিনি হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সদকা লইবেন না।"

মানুষের অদৃষ্ট যে মানুষকে অচিন্তনীয়ভাবে টানিয়া নিতে পারে, একথা হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর জীবন-কাহিনীতে সুস্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছে। তিনি কোথায় ছিলেন আর কোথায় আসিলেন। আবার অদৃষ্টলিপি তাঁহাকে কোন্ পথে লইয়া চলিল—তাহাই এখন দেখা যাউক। সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর নিজ মুখেই তাঁহার আত্মকাহিনীর পরবর্তী অংশ শ্রবণ করুন।

হযরত সালমান (রাঃ) বলিতেছেন, ঘটনাক্রমে এক কাফেলা আরব দেশের দিকে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিলে তাহারা ইহাতে সম্মত হইল। কিন্তু 'ওয়াদিল-কোরা' নামক স্থানে পৌঁছিলে কাফেলার লোকেরা বলপূর্বক গোলাম বলিয়া আমাকে সেখানকার এক দুর্দান্ত ইহুদীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই অঞ্চলে অনেক খেজুরের বাগান ছিল। তাহা দেখিয়া উমুদিয়া পাদরীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমার মনে পড়িল এবং ভাবিলাম—হয়তো ইহাই নবীর আবির্ভাবের স্থান। আমার মালিকের নিকট মদীনার এক ইহুদী অতিথি আসিয়াছিল, তাহার নিকট আবার আমাকে বিক্রয় করা হইল। মদীনার খর্জুর বৃক্ষরাজি দর্শনে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, শেষ নবী আবির্ভূত হওয়ার স্থান ইহাই। ইহুদী প্রভুর নিকট আমি খেজুর বাগানে কাজ করিতাম।

www.nagorikpathagar.org

অনেক কাল পর যখন আমি এই কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তখন একদিন শুনিলাম, এক ব্যক্তি মক্কা হইতে আসিয়া নিজকে নবী বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। পূর্বকথা স্মৃতিপটে জাগরুক হওয়ায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি গাছের উপরে ছিলাম, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথাবার্তা হইতেছে?" আমার মনিব আমাকে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "তুই তোর কাজে যা, এসব কথায় তোর কি আবশ্যক?" আমি নিরুপায় হইয়া নিজের কাজে পুনরায় মনোনিবেশ করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যাকালে মনিবের কাজকর্ম শেষ করার পর কিছু খাবার লইয়া হযরত (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, "হুযূর, ইহা সদকাস্বরূপ আপনার জন্য আনিয়াছি; গ্রহণকরত আমাকে কৃতার্থ করুন।" সদকার কথা শুনিয়া হযরত (দঃ) ইহা নিজে গ্রহণ করিলেন না; সঙ্গিগণকে দিয়া দিলেন। আর একদিন কিছু উপহারসহ গিয়া কহিলাম, "হুযূর, ইহা আপনার খেদমতে 'হাদিয়া' দিতেছি।" হযরত (দঃ) সন্তুষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। আমি ভাবিলাম—প্রথম এবং দ্বিতীয় পরীক্ষা ঠিক হইল; এক্ষণে তৃতীয় পরীক্ষা অর্থাৎ, পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়ত দেখা আবশ্যক।

একদিন তিনি জানাযার নামাযের জন্য যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দেখার সুযোগের জন্য তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। হযরত (দঃ) আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই যেন পিঠের চাদর কতকটা সরাইয়া দিলেন। আমি 'মোহরে নবুওয়ত' দেখিতে পাইয়া তাহাতে চুম্বন করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে সস্নেহে সম্মুখে বসাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার পূর্ণ আত্মকাহিনী শুনাইলাম। হযরত (দঃ) ও তাঁহার সহচরগণ আমার ইতিহাস শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন।

সালমান ফারেসী বলেন, ইসলাম গ্রহণের পরও ইহুদী দাসত্বের কারণে সব সময় স্বাধীনভাবে হযরত (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইতে এবং ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিতে পারি নাই। একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, 'তোমার মনিবের সঙ্গে এমন কোন শর্ত কর, যাহাতে টাকা-পয়সা অথবা অন্য কিছুর বিনিময়ে তুমি তাহার দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পার।' আমি বহু সাধ্য-সাধনার পর মনিবকে এই শর্তে রাযি করিলাম যে, আমি তিন শত খেজুর চারা রোপন করিব; উহাতে ফল হইলে এবং তৎসঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ মালিককে দিতে পারিলে আমি তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলে আমার সাহায্যের জন্য তিনি সাহাবাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। প্রত্যেকেই আমার জন্য দুই চারিটি করিয়া খেজুরের চারা সংগ্রহ করিয়া দিলেন এবং হযরত (দঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে খেজুরের চারাগুলি বসাইয়া দিলেন। সেই বৎসরই গাছগুলি বাড়িয়া ফল-ফুলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর হযরত (দঃ) নির্দিষ্ট পরিমাণে সোনাও সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইভাবে আমি গোলামী হইতে অব্যাহতি পাইলাম। —শামায়েলে তিরমিযী

বৃদ্ধ সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ও তাঁহার অত্যাশ্চর্য জীবনীতে আমাদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় রহিয়াছে। মানুষ কিরূপে সত্যের সন্ধানে মাতাপিতা, স্বদেশ ও স্বজাতির মমতা অকাতরে বিসর্জন দিয়া নিরাশ্রয়ভাবে বিদেশ গমন করিতে পারে—অগাধ ধনসম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করিয়া কিভাবে নিদারুণ কষ্টদায়ক কারাবরণ করিতে পারে—কিরূপে মানুষ বিপদ-আপদের অকূল সাগরে জীবনতরী ভাসাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে, সালমান ফারেসীর জীবনীতে উহার সুস্পষ্ট নমুনা আমরা দেখিতে পাই।

www.nagorikpathagar.org

একথা বলাই বাহুল্য যে, হযরত সালমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ তো দূরের কথা, ইসলামের প্রতি তাঁহাকে আহবান করারও আবশ্যক হয় নাই। তিনি পূর্বলব্ধ জ্ঞান এবং পরীক্ষা দ্বারা শেষ নবীর পরিচয় পাইয়াই স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদরীরা যে শেষ নবীর কথা অবগত ছিলেন এবং তাঁহার আগমনকাল নিকটবর্তী হওয়ার কথাও যে নিশ্চিতভাবে তাঁহারা জানিতেন, এই ঘটনায় তাহাও আমরা পরিষ্কারভাবে জানিতে পারিলাম। এতদ্ব্যতীত আরও যে কয়েকটি অত্যোপকারী কথা এই আখ্যায়িকা হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহাও লিখিত হইতেছে।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

খৃষ্টান ধর্মের অবস্থা ঃ

সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত হযরত সালমান (রাঃ)-এর ঘটনা পাঠ করিলে তৎকালীন খৃষ্টধর্মের শোচনীয় অবস্থার চিত্র চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। পাঠকগণ শাম দেশের প্রথম পাদরীর অবস্থা দেখিয়াছেন। সে ব্যক্তি কিরূপ চতুরতা ও শঠতার সহিত লোকের চক্ষে ধুলা দিয়া অগণিত ধনরাশি আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহাও পাঠ করিয়াছেন। ধর্মযাজকদের এরূপ অবস্থা হওয়া কি নিতান্ত লজ্জার কথা নহে? পরে যে কয়েক পাদরীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহারা অবশ্য ধর্মপরায়ণ ও সাধুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু উমুদিয়ার পাদরী স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আমাদের ধর্মে এখন আর এমন কোন লোকই দেখা যায় না, যাহার আদর্শ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। সেকালে যে পাদরীর অস্তিত্ব ছিল না, অথবা পাদরীর সংখ্যা কম ছিল একথা ঠিক নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে সততা লোপ পাইয়াছিল এবং তাহাদের ধর্মেকর্মে নানাবিধ মনগড়া জিনিস প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটে, তখনই কোন পয়গম্বর, রিফর্মার (Reformer) বা সংস্কারকের অভাব অনুভূত হয়। স্বভাবের চিরাচরিত নিয়মও ইহাই যে, এরূপ সময়েই কোন না কোন সংস্কারক শুভাগমন করিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসা করি—এই সময় অন্য কোন্ সংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছিল? বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সেই সংস্কারক নহেন কি?

হযরত (দঃ)-এর পরলোক গমনের পর মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই, এমন কথা আমরা বলি না। তবে হযরত (দঃ)-এর আগমনে ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা সাধিত হওয়ার কারণে ধর্ম -সংস্কারের জন্য আর কোন নূতন নবীর আবশ্যক করে না। তাঁহার উম্মতের ধর্মনিষ্ঠ আলেম ও ওলি-দরবেশগণই সংস্কারকের কাজ সমাধা করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। হযরত (দঃ) এ সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلُ

“আমার উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরায়ীলের নবীদের অনুরূপ।” বনি ইসরায়ীল বংশের নবীগণের কাজ ছিল, ধর্ম প্রচার ও ধর্মসংস্কার। উম্মতে মুহাম্মদীর আলেমদের কাজও ধর্মের প্রচার এবং ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত কুপ্রথা প্রবেশ লাভ করে, সেগুলিকে বিদূরিত করা।

www.nagorikpathagar.org

আরও এক হাদীসে আছে—

'আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এমন লোক পাঠাইবেন, যিনি উম্মতের ধর্মকর্মের সংশোধন করিবেন।' —আবুদাঊদ

মো'জেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা ঃ

মানুষ যাহাতে পয়গম্বরের উপর সহজে ঈমান আনিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সময় তাঁহাদের দ্বারা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত করিয়া থাকেন। পাঠকগণ যদি উল্লিখিত ঘটনা সাধারণ গল্পের মত পাঠ না করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে হযরত (দঃ)-এর মো'জেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা (miracle) স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছেন।

সালমান ফারেসী যখন তাঁহার ইহুদী মালিকের সঙ্গে এই শর্ত করিলেন যে, তিনি তিন শত খেজুরের চারা গাছ রোপণ করিবেন; গাছগুলি বড় হইয়া তাহাতে ফুল ও ফল হইবে; তৎসঙ্গে বহু সংখ্যক মুদ্রা মালিককে দিতে হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উপদেশে এবং সাহাবায়ে কেরামের বদান্যতার ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ এবং তিন শত খেজুরের চারা অল্প সময়েই সংগৃহীত হইয়াছিল। হযরত (দঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে চারাগুলি বসাইয়া দিলেন এবং সেই বৎসরই সেগুলিতে ফল আসিল, এই ঘটনা বাস্তবিকপক্ষে শেষ নবী (দঃ)-এর মো'জেযা দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল।

'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে আছে, ২৯৯টি গাছ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কর্তৃকই স্থাপিত হইয়াছিল। মাত্র একটি গাছ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বসাইয়াছিলেন। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহা জানিতে পারেন নাই। পরে দেখা গেল, একটি ব্যতীত সব গুলিতেই ফুল হইয়াছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গাছটির অবস্থা এমন হইল কেন?" হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "এই গাছটি আমি বসাইয়াছিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উহা উঠাইয়া পুনরায় স্বহস্তে বসাইয়া দিলেন। ইহাতে সেই গাছটিতেও সে বৎসরই ফুল আসিল এবং ফল ধরিল।

মো'জেযা সম্পর্কে যুক্তিতর্ক ঃ

আমরা এই ঘটনাকে মো'জেযা না বলিয়া আর কি বলিতে পারি? যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণের মর্যাদা রক্ষা করেন এবং মনে স্বাধীন বিচার-বিবেচনার স্থান দেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহাকে মো'জেযার মধ্যে গণ্য করিতে বাধ্য হইবেন। হযরত (দঃ)-এর পবিত্র জীবনে এমন আরও অনেক মো'জেযা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা স্বীকার করি যে, মো'জেযাগুলির কোন কোনটি হয়তো তেমন শক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে। কিন্তু হযরত (দঃ)-এর অনেক মো'জেযা এত অধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, যাহাদের একসঙ্গে মিথ্যা কথা বলা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। অতঃপর সবগুলি অলৌকিক ব্যাপার একত্রিত করিলে সমষ্টিগতভাবে ইহাই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া পড়ে যে, হযরতের দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার নিশ্চয়ই সংঘটিত হইয়াছিল। হাদীসের রেওয়ায়তগুলি যেমন সুদৃঢ় বর্ণনা-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই তেমন নহে। এরূপ প্রামাণ্য ঘটনার উপর যদি সন্দেহ করা হয়, তবে আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা চলিবে না। ইতিহাসের সমস্ত কথার উপরই শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তবে এক্ষেত্রে উহার বিপরীত হইবে কেন?

www.nagorikpathagar.org

আমরা ইতিহাসে পাঠ করি, তাজমহল নামক একটি অত্যাশ্চর্য অট্টালিকা বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। হয়তো একথায় সামান্য মতভেদও থাকিতে পারে যে, ইহা নির্মাণ করিতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, নির্মাণ কার্যে কত সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত খুঁটিনাটি মতভেদের অজুহাতে তাজমহল নির্মাণের কথায় কি সন্দেহ করা চলে? যদি একথায় কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকে, তবে বর্তমানে যে আগ্রা শহরে তাজমহল আছে, উহার প্রমাণ দেওয়াও মুশ্‌কিল হইয়া পড়িবে। তাজমহলের ফটো দেখাইয়া দিলেও যদি কেহ বলে যে, হয়তো ইহা কল্পনা দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে; তবে তাহার নিকট আর কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করাই বৃথা।

ঐতিহাসিক প্রমাণের দিক দিয়া হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহাতে কোন সন্দেহ পোষণ করা অমূলক। এমন কি ইসলামের দুশমন মক্কা ও মদীনার বিধর্মীগণও হযরত (দঃ)-এর মো'জেযা অস্বীকার করিতে পারিত না। তাহারা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছিল, ইতর প্রাণীর কথা বলিতে শুনিয়াছিল, নির্জীব পদার্থ হযরত (দঃ)-এর নবুওয়তে সাক্ষ্য দিতে শুনিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়া হযরত (দঃ)-কে জাদুকর বলিত, কিন্তু কখনও এমন কথা বলিত না যে, এ সমস্ত ঘটনা ঘটেই নাই।

কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয়, আমাদের মুসলমান ভাইদের মধ্যেও কোন কোন লেখক মো'জেযা স্বীকার করিতে চাহেন না। কোন কোনটি স্বীকার করিলেও তাহার এমন বিকৃত অর্থ করেন, যাহাতে তাহা মো'জেযার মধ্যে গণ্যই থাকে না। তাঁহাদের লিখিত পুস্তকাদি পাঠে বুঝা যায়, তাঁহারা বিধর্মী সমালোচকদের ভয়েই মো'জেযাগুলিকে গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে, দুনিয়ায় যত ধর্ম আছে, প্রায় সকল ধর্মের লোকেরাই অলৌকিক ঘটনার উপর বিশ্বাস রাখিতে বাধ্য। ইহুদীগণ হযরত মূসা (আঃ)-এর অলৌকিক লাঠির প্রতি বিশ্বাস রাখে, খৃষ্টানরা ঈসা মসীহ (আঃ)-এর দ্বারা জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির মুহূর্তে আরোগ্য হওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জীবন প্রাপ্তির প্রতি আস্থা রাখিতে ধর্মতঃ বাধ্য। ভারতের হিন্দু সমাজ রামায়ণ মহাভারতের আজগুবী গল্পগুলির প্রতি বিশ্বাস করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না; তবে আর কাহারা শেষ নবীর সত্য ও প্রামাণিক ঘটনাবলীর উপর আপত্তি করিতে পারিবে?

অনেকের আপত্তি—মো'জেযাগুলি বিজ্ঞানসম্মত নহে। সুতরাং তাহাতে বিশ্বাস করা চলে না। এরূপ কথার উত্তর দেওয়াও আমরা সঙ্গত মনে করি না। কিন্তু আজকাল এমনি বিষাক্ত আবহাওয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সকল কথাকেই বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখা হয়। কিন্তু এই অজুহাতে মো'জেযায় অবিশ্বাস করিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হইবে।

প্রথমতঃ বিজ্ঞান এখনও চরম সীমায় পৌঁছে নাই। কখনও যে পৌঁছিতে পারিবে, তাহারও আশা নাই। বিজ্ঞান মতে কাল যে কথা স্থির-নিশ্চিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল, আজ তাহাই অবাস্তব বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। আবার এখন যাহা ঠিক বলিয়া ধরা হইতেছে, দুদিন পর হয়তো তাহাই ভুল বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে। এমন পরিবর্তনশীল জিনিসের দোহাই দিয়া ঐতিহাসিক সত্য এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের কালামকে বিকৃত করিতে যাওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, মো'জেযাসমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপরীতও নহে। অবশ্য প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়াই এগুলিকে অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক

www.nagorikpathagar.org

বলা হয়। বিজ্ঞানের মধ্যে তো আর এমন কোন ধারা নাই যে, প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের বাহিরে কোন কাজই হইতে পারিবে না। আমরা যদি স্বীকারও করি যে, প্রকৃতি ও স্বভাবের বাহিরে কোন কিছু ঘটিতে পারে না, তবুও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোন কোন ঘটনা ঘটা—ইহাও প্রকৃতির ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত জিনিস। সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বহু পদার্থই আমরা সংসারে দেখিতেছি। মো'জেযাকেও ঠিক তদ্রূপই মনে করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে প্রতীচ্যের স্বনামধন্য বিজ্ঞান-অধ্যাপক মিঃ ব্যারেটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি। তিনি বলেনঃ "ধর্মপুস্তক বাইবেলে যে সমস্ত অনৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, তৎসমুদয় বিজ্ঞানের কঠোর নিয়মাবলীর বিপরীত নহে।" এই কথা নিউটন, ফ্যারাডে, কেলভিম, ষ্টোকস্, ম্যাক্সওয়েল প্রমুখ মহারথী বৈজ্ঞানিকদের উক্তির দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। (মহর্ষি মনসুর ভূমিকা দ্রঃ)

এক্ষণে উল্লিখিত মো'জেযার কথাই আলোচনা করিতেছি। খর্জুর বৃক্ষে বহু বৎসর পরে ফল ফুল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া অল্প সময়ে ফল হওয়া বিজ্ঞানের বিপরীত কথা বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে না। দেখুন, হাঁস ও মুরগীর ডিম অনেক দিন তা দেওয়ার পর ফুটে। কিন্তু যদি কেহ বলে যে, বৈদ্যুতিক উত্তাপের দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা বাহির করা যায়, তবে তাহাতে বিশ্বাস করিতে মোটেই আপত্তি হইবে না। বিজ্ঞান যদি চব্বিশ ঘণ্টায় ডিম ফুটাইতে পারে, তবে বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা কি এক বৎসরে খেজুর গাছে ফল ফলাইতে পারে না। তবে কি আমরা বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার চেয়ে বড় মনে করিব?

■

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

সাফল্য ও অগ্রযাত্রা

বদরের যুদ্ধ ও ফেরেশতার সাহায্যঃ

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কাবাসিগণ প্রতি বৎসর ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করিত। এ বৎসরও কুরাইশ সরদার আবু সুফিয়ান লোকজনসহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করিয়াছিলেন। সিরিয়া যাইতে মদীনার নিকট দিয়া যাইতে হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) লোকমুখে এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। এই সময়ে মক্কাবাসীদের সঙ্গে সন্ধি ছিল না। মক্কা 'দারুল-হরব' বা যুদ্ধরত দেশের মধ্যে গণ্য ছিল। হযরত (দঃ) ভাবিলেন, শত্রুর শক্তি খর্ব করার এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ।

সন্ধিহীন ও যুদ্ধরত রাজ্যের বিরুদ্ধে যে কোন অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণকরত উহার শক্তি বিনষ্ট করা সমরনীতিতে কোনই দূষণীয় নহে। বর্তমান সময়ের শত্রু-রাজ্যের উপর দিবা-রাত্রির যে কোন সময়ে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, রসদের জাহাজ নিমজ্জিত করা হয়, কারখানা ধ্বংস করা হয়। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক মক্কার সওদাগরী কাফেলা আক্রমণকে বিস্ময়ের চক্ষে দেখার কোনই কারণ নাই। সমরনীতির মধ্যে এ রকম আক্রমণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নিপুণতার পরিচায়ক বটে। তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই যুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গে ইসলাম প্রচারের কোনই সম্পর্ক নাই। একথা বলা নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তলোয়ার লইয়া কাফেলার লোকদিগকে মুসলমান করিতে গিয়াছিলেন।

এ দিকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করিতেছেন, অপর দিকে সুচতুর আবু সুফিয়ান এবং তাহার সহচর আমর ইবনে আস অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অন্য পথে মক্কায় চলিয়া গেলেন; সঙ্গেসঙ্গে কুরাইশ দলের অন্যতম দলপতি আবু জহল সহস্র সংখ্যক সুসজ্জিত সৈন্যসহ মদীনার দিকে ধাবিত হইল। বদর নামক স্থানে উভয় দলের সম্মুখ-সংঘর্ষ হইল। ফলে দলপতি আবু জহল নিহত এবং কুরাইশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল কুরাইশ দলের সত্তর জন নিহত, সত্তর জন বন্দী এবং বহু ধন-সম্ভার ও অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের আয়ত্তে আসিয়াছে।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, এই যুদ্ধে মুসলমান যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল দুইটি অশ্ব, সত্তরটি উষ্ট্র, ছয়টি বর্ম এবং আটটি তরবারি। আবু জহল আসিয়াছিল সুসজ্জিত এক হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনীসহ। অবশ্য তন্মধ্যে যোদ্ধৃপুরুষ ব্যতীত অন্যান্য লোকজন এবং কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকও ছিল। সৈন্যদের মধ্যে একশত ঘোড়সওয়ার, বাকি পদাতিক ছিল। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশই বর্মাবৃত ছিল। এতদ্ব্যতীত সাত শত বাহন-উষ্ট্রও তাহাদের সঙ্গে ছিল। ফলকথা তৎকালীন আরবের যুদ্ধায়োজন হিসাবে আবু জহলের দল পূর্ণ সজ্জিত ও সুগঠিত ছিল। ইহাতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এতবড় দলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানগণ কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অবস্থায়ই তাঁহাদিগকে এই যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

www.nagorikpathagar.org

মক্কার লোকেরা মদীনার পার্শ্বদেশ হইয়া শামদেশে বাণিজ্য করিতে যায়। মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে এই পথ বন্ধ হইয়া তাহাদের শক্তি খর্ব হয় এবং তৎসঙ্গে গণীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা মুসলমানদের অবস্থা উন্নত হয়। অধুনা সভ্য সমাজও কোন শত্রুকে সন্ধিহীন অবস্থায় নিজের রাজ্যের উপর দিয়া সদলবলে যাতায়াত করিতে দেন না। দিতে গেলেও তাহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

প্রিয় পাঠক! মুসলমানদের যুদ্ধ-যাত্রার ও যুদ্ধায়োজনের অবস্থা দেখিয়াছেন। এক্ষণে সৈন্যচালক হিসাবে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে অবলোকন করুন। ঐ দেখুন, হযরত আলী ও যায়েদ ইবনে হারেস উষ্ট্রপৃষ্ঠে সমাসীন। উটের রজ্জু হাতে পদব্রজে চলিয়াছেন, দোজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ (দঃ)। হযরত আলী (রাঃ) কহিলেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি উটের উপর বসুন, আমরা দুই জনেই পর পর উষ্ট্রচালনার কাজ সমাধা করিতে পারিব।" হযরত (দঃ) তদুত্তরে ফরমাইলেন, "তোমরা আমার চেয়ে সবল নও, আমিও তোমাদের চেয়ে সওয়াবের কম মুখাপেক্ষী নহি।"

প্রথমে বলিয়াছি, তিন শতাধিক মুসলিম যোদ্ধার মধ্যে মাত্র সত্তরটি উট ছিল। সুতরাং প্রতি দুই জনের মধ্যেও একটি উট আসে না। এজন্য কিছু উট দুই জনের মধ্যে আর বাকিগুলি তিন তিন জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিয়ম হইল, পথে বদলাইয়া বদলাইয়া এক একজন উষ্ট্র চালনার কাজ করিবে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উটে তাঁহার দুই সঙ্গী—হযরত আলী এবং যায়েদ ইবনে হারেস শরীক ছিলেন। তাঁহাদের উষ্ট্রচালনার পালা শেষ হইলে হযরত উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রজ্জু গ্রহণ করিলেন। সঙ্গিগণ বাধা দিতে গেলে তিনি তাহা শুনিলেন না। তিনি কার্যক্ষেত্রে দেখাইয়া দিলেন যে, ইসলামে ছোট বড়তে প্রভেদ নাই, আমীর গরীবেরও তারতম্য নাই। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের (equality) এই যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, জাতীয় উন্নতির বড় অংশ ইহার উপরেই নির্ভর করে। হযরতের সাহাবাগণও এই আদর্শকে পূর্ণরূপে বহাল রাখিয়াছিলেন। আমরা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-কেও নিজে উটের রশি ধারণকরত নগণ্য দাসকে উটের উপর বসাইয়া শামদেশে শত্রুর রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি। এই আদর্শ বজায় রাখার ফলেই তাঁহারা এত অল্প সময়-মধ্যে অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের আলোক বিকীর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ ইসলামের এই আদর্শ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। যে পর্যন্ত তাঁহারা আবার এই আদর্শ গ্রহণ না করিবেন, সে পর্যন্ত কিছুতেই জাতীয় উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। ইসলামের উন্নতির যুগে মুসলমানদের আচার-পদ্ধতি দৃষ্টে বিধর্মীরা ইসলামের আদর্শ বুঝিয়া লইতে পারিত এবং তাহাদের অন্তঃকরণে ইসলামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার উদ্রেক হইত। কিন্তু আজকাল আমাদের চালচলন দেখিয়া ইসলামের আদর্শ বুঝিবার উপায় নাই। তবে আর কিরূপে বিধর্মীরা সত্যিকার ইসলাম ধর্ম বুঝিতে পারিবে? তাহারা তো আর কোরআন হাদীস পড়িয়া ইসলাম ধর্ম শিক্ষা করিতে আসিবে না।

হযরত (দঃ) বদরে বিপক্ষের সম্মুখীন হইলে কুরাইশগণ নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও সাজসজ্জার গর্বে গর্বিত হইয়া আস্ফালন আরম্ভ করিল। এদিকে হযরত সজদার অবস্থায় মাটিতে মাথা রাখিয়া করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করিতে লাগিলেন, "আয় আল্লাহ্, তোমার উপাসক মুষ্টিমেয় লোক মাত্র দুনিয়ায় আছে; তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পার। এই যুদ্ধে আমরা

www.nagorikpathagar.org

তোমার কৃপায় জয়ী হইলে তোমার ধর্ম রক্ষা পাইবে; নতুবা চিরতরে তোমার নাম লওয়ার মত লোক ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।" হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে জয়যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; তবে আর এত উতলা হওয়ার কি কারণ!

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর অন্তরে খোদার প্রতি যেরূপ নির্ভরশীলতা ছিল, তাহা অবশ্য উম্মতের অন্য কোন লোকের অন্তরে থাকা অসম্ভব। কিন্তু হযরতের নির্ভরশীলতা তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ বেশী ছিল। সমুদ্রের সঙ্গে যেমন বিন্দুর তুলনা হয় না, তেমনি হযরত (দঃ)-এর মহৎ হৃদয়ের সঙ্গে অন্য কাহারও মনের তুলনা হইতে পারে না। তৎসঙ্গে আমাদের একথাও বুঝিতে হইবে যে, হযরতের তাওয়াক্কুল যেমন বেশী ছিল, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা, নিজের ক্ষুদ্রত্ব এবং দাসত্বের (আবদিয়ত) অনুভূতিও তাঁহার অতুলনীয় ছিল। দাসত্বের অনুভূতি হেতু খোদার দরবারে মস্তক নত করা এবং দয়া প্রার্থী ভিক্ষুকের আকারে দণ্ডায়মান হওয়া—ইহাই মানুষের পক্ষে চরম শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের লক্ষণ।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা সম্পর্কে হযরত (দঃ) পূর্ণ আস্থাবান থাকা সত্ত্বেও খোদার প্রভুত্বের নিকট নিজের দাসত্ব (মকামে আবদিয়ত) নিবন্ধন নম্রতা প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, বাহ্যিক ক্ষমতা অথবা অন্য কিছুর প্রতি নির্ভর না করিয়া সর্বাবস্থায় কেবল খোদার অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখাই মুসলমানের কর্তব্য।

এস্থলে বদর যুদ্ধের পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'আ সফল হইয়াছিল, খোদার সাহায্য রূপে আসমানের ফেরেশতাগণ বদরের মাঠে নগণ্য সংখ্যক সত্য-ধর্মানুগামিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। ফলে মুসলমানগণ পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা পাক কালামে বলিতেছেন—

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ○

"তোমরা যখন তোমাদের প্রতিপালকের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্) হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিলাম, যাহারা পর পর আগমন করিয়াছিল।" —সূরা-আনফালঃ রুকূ ১ঃ আয়াত ৯

বিজ্ঞানের প্রতি মোহের কারণে যাহাদের অন্তঃকরণে নাস্তিকতার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে, তাহারা ফেরেশতার অস্তিত্ব অথবা ভূতলে ফেরেশতার আগমন অস্বীকার করার চেষ্টা করিলেও বদরের যুদ্ধে সমর-সজ্জাবিহীন নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদের জয়লাভ করাকে অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য করা ব্যতীত তাহাদেরও গত্যন্তর নাই। সহস্রাধিক সুসজ্জিত যোদ্ধার সঙ্গে মাত্র ৩০৫ জন সৈনিকের মোকাবেলা হওয়ার আর কোন নযীর বিশ্বের ইতিহাসে নাই। তবু কি কেহ হযরত (দঃ)-এর অলৌকিক শক্তিকে অস্বীকার করিতে পারেন?

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণঃ

যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হইল। তৎসঙ্গে বহুবিধ গণীমতের মাল মুসলমানদের হাতে আসিল। বন্দীদের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাসকে

যে ব্যক্তি বন্দী করিলেন, তিনি নিতান্ত খর্বাকৃতি ও কৃশ ছিলেন। কিন্তু আব্বাস (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত লম্বা ও শক্তিমান ব্যক্তি। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন দুর্বল মানুষ হইয়া কিরূপে আব্বাস -কে বন্দী করিতে সমর্থ হইলে?" তিনি কহিলেন, "এক অপরিচিত লোক এই ব্যাপারে আমার সাহায্য করিয়াছিল। সেই লোকটিকে আমি পূর্বে আর কখনও দেখি নাই, বন্দী করার পরেও আর তাহাকে দেখি নাই।" হযরত (দঃ) বলিলেন, "আগন্তুক একজন ফেরেশতা ছিলেন।" —মাদারেজ

বন্দীদিগকে বন্ধন অবস্থায় রাখা হইল। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বন্ধন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। একে তো তিনি বয়ঃপ্রবীণ ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি আমীর বংশের লোক; সুতরাং রাত্রে বন্ধনের যাতনা অসহ্য হওয়ায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) পিতৃব্যের ক্রন্দন শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাত্রে তাঁহার চক্ষেও নিদ্রা আসিল না। কেহ হযরত (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "হুযূর, আপনার ঘুম হইতেছে না কেন?" হযরত (দঃ) বলিলেন, "চাচা আব্বাসের ক্রন্দন শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।" পিতার আপন ভাই এমন যন্ত্রণাময় বন্দী অবস্থায় থাকিলে মনে কষ্ট হওয়া কোনই বিচিত্র ঘটনা নহে। কিন্তু দেখিবার বিষয়, রাজনীতি, সমরনীতি এবং ইসলামের নির্দেশে সমস্ত বন্দীর প্রতি যে বিধান—হযরত নিজের পিতৃব্য সম্বন্ধেও উহার কোন ব্যতিক্রম হইতে দেন নাই; প্রাণে দারুণ যাতনা হইতেছে, মনঃকষ্টের কারণে নিদ্রা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এরূপাবস্থায়ও বিধানের সামান্য তারতম্য করা হয় নাই। এরূপ ন্যায়নিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা না থাকিলে জগতে কোন পরিকল্পনা এবং আন্দোলনই ফল-প্রসূ হইতে পারে না। হযরত (দঃ)-এর এই ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের মাপকাঠিতে অধুনা নেতৃস্থানীয় লোকদের ব্যবহারকে মাপিয়া দেখুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন, ইসলামের আদর্শ হইতে তাঁহাদের অবস্থান কত দূরে!

প্রশ্নকারী লোকটি হযরত (দঃ)-এর মনোবেদনা অনুভব করিতে পারিয়া চুপি চুপি আব্বাসের বন্ধন কতকটা শিথিল করিয়া দিয়া আসিল। বন্ধন-যন্ত্রণা লাঘব হওয়ায় আব্বাস নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আব্বাসের ক্রন্দন শুনিতেছি না কেন?" লোকটি কহিল, "হুযূর, তাঁহার বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়াছি।" হযরত ফরমাইলেন, "তবে সকল বন্দীদের বন্ধনই এ রকম শিথিল করিয়া দাও।"

সহচরবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শের পর হযরত (দঃ) বন্দীদের সম্পর্কে এই আদেশ দিলেন যে, কিছু নিষ্ক্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হউক। হযরত আব্বাসকেও হাজির করা হইল। তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে যে স্বর্ণ, রৌপ্য ছিল, তৎসমুদয়ই আপনার লোকদের হস্তগত হইয়াছে, তৎপরিবর্তেই আমাকে মুক্তি দান করুন।" আদেশ হইল—"যুদ্ধলব্ধ মাল বিজয়ী যোদ্ধাদেরই প্রাপ্য; তাহা বন্দী মুক্তির নিষ্ক্রয়রূপে গৃহীত হইতে পারে না।" আব্বাস বলিলেন, "আর তো আমার নিকট কিছুই নাই। যুদ্ধ পরিচালনা ব্যয়ের জন্য আমার যথাসর্বস্বই লইয়া আসিয়াছিলাম। আপনি কি পছন্দ করিবেন যে, আপনার পিতৃব্য ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করুক?" হযরত (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, "কেন; যুদ্ধযাত্রার সময় আপনার স্ত্রী উম্মুল-ফযলের নিকট যে স্বর্ণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন, উহার কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন?" আব্বাস আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার এই গুপ্ত কথা খোদা ভিন্ন আর কেহই জানিত না; আপনি আল্লাহ্র রাসূল না হইলে তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন? অতএব, আর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি ফল? আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল।" —মাদারেজ

www.nagorikpathagar.org

বদর যুদ্ধের আবশ্যকীয় কয়েকটি ঘটনা এস্থলে লিখিত হইল। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গেসঙ্গে ধর্ম প্রচার হইলেও ধর্ম প্রচার-সূত্র সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস ছিল। ভাবিয়া দেখুন, এই যুদ্ধের পর কয়েদীগণ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে ছিল। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। অথচ সামান্য অর্থদণ্ড গ্রহণের পর বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অবশ্য তাহাদের প্রাণদণ্ড হইলেও সমরনীতির দিক দিয়া কোন অন্যায় হইত না। পরামর্শের সময় এবংবিধ সর্বপ্রকার আলোচনাও উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন কথাই উঠে নাই যে, তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করা হউক। বাস্তবক্ষেত্রে "ধর্মে বলপ্রয়োগ নাই" কোরআনের এই বিধান মুসলমানদের দ্বারা সর্বত্রই অটলভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে।

সোলহে হোদায়বিয়াহ্ ঃ

একবার হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি স্বীয় সহচরমণ্ডলীসহ নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। পয়গম্বরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, এজন্য মুসলমানগণ এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও দেখিয়াছিলেন যে, তিনি কা'বা শরীফের চাবি হস্তগত করিয়াছেন। এই বৎসরই হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সহচরসহ ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে রওয়ানা হইলেন। আসহাবগণ ভাবিলেন, হযরতের স্বপ্ন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা গমনের কথা মদীনার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে প্রচার করিলেন এবং জানাইয়া দিলেন যে, যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা আমার সহযাত্রী হইতে পারে। অনেকেই সহযাত্রী হইল। কেহ কেহ ভাবিল, কুরাইশগণ মদীনায় আসিয়াই বারংবার আক্রমণ করে। এরূপাবস্থায় তাহারা কখনও মুসলমানদিগকে শান্তিতে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। এই ভাবিয়া অনেকে সহযাত্রী হইতে সাহস করিল না।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদিগকে (রাঃ) এমন সাজসরঞ্জাম লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, যাহাতে মক্কার লোকেরা শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ হইতে পারে। সঙ্গে যবাহ্ করার জন্য সত্তরটি উটও লওয়া হইল। উহাদের গলায় চামড়ার ফিতা পরাইয়া দেওয়া হইল। এই নিদর্শনগুলি দেখিলে আরবের লোকদের মনে যুদ্ধবিগ্রহের সামান্য সন্দেহও হইতে পারে না। অবশ্য মুসলমানদের সঙ্গে দুই শত ঘোড়াও ছিল। কিন্তু হযরতের নিষেধক্রমে তরবারি ভিন্ন আর কোন প্রকার অস্ত্রই কেহ সঙ্গে আনে নাই। তৎকালে যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্নও সকলে তরবারি সঙ্গে রাখিত।

সাবধানতার জন্য অগ্রদূতরূপে এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। লোকটি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, মক্কার কুরাইশগণ মুসলমানদের আগমন সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে।

হযরত যে উদ্দেশ্যে মক্কায় যাইতেছিলেন, প্রথমেই তাহা ঘোষণা করা হইয়াছিল। হযরত যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, একথা মক্কার লোকেরা জানিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মক্কাবাসীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। খালেদ ইবনে ওলীদের অধীনে একদল সৈন্য মক্কা হইতে মুসলিম নিপাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে একস্থানে হযরত (দঃ) মুসলমানগণসহ ফজরের নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় খালেদ দলবলসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। খালেদ ভাবিলেন, নামাযের অবস্থায়ই আক্রমণের উপযুক্ত সময়। পরামর্শের পর তাহারা স্থির করিল যে,

৯-

www.nagorikpathagar.org

আসরের নামাযের সময় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবে। এদিকে খোদা তা'আলা ওহী দ্বারা হযরত (দঃ)-কে কাফেরদের অভিসন্ধি অবগত করাইয়া দিলেন। সঙ্গেসঙ্গে 'সালাতুল খওফ' (যুদ্ধের সময় বিশেষ নিয়মে নামায পড়া) সম্পর্কীয় আয়াতও নাযিল হইল। তদনুযায়ী হযরত (দঃ)-এর আদেশক্রমে মুসলমানদের এক দল হযরতের সঙ্গে নামাযে রত রহিলেন, আর এক দল দুশমনের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বিধর্মিগণ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের দূরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবীগণ যুদ্ধ করার ইচ্ছা মোটেই পোষণ করেন না। বিপক্ষ একথা বুঝিতে পারিয়াও অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। হযরত (দঃ) সাহাবীগণের নিকট হইতে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, 'আমরা কেবল কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করার জন্যই মক্কায় যাইতেছি; যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য নহে। ইহাতেও যদি কুরাইশগণ বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করিতে কখনও নিবৃত্ত হইব না।' অন্যান্য সাহাবীগণও এইরূপ দৃঢ়তাপূর্ণ উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিতে লাগিলেন, দুঃখের বিষয়, কুরাইশগণ বারংবার অযথা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে আসে। তাহারা কি ভাবিয়াছে, আমাকে ইসলাম প্রচার হইতে বিরত রাখিতে পারিবে? কখনও নহে, আমরা জীবন থাকিতে কিছুতেই ধর্ম প্রচার পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

অতঃপর তিনি আদেশ করিলেন, কাফেরেরা যে পথ বন্ধ করিয়াছে, সেই পথ ছাড়িয়া হোদায়বিয়ার পথে গমন করা যাউক। নির্দেশ মতই কাজ হইল। মুসলমানগণ পাশ কাটিয়া বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বাধাদানকারী কুরাইশগণ তাহা জানিতে পারিল। হোদায়বিয়া নামক স্থানের নিকটে পৌঁছিলে হযরতের 'কাসওয়া' নামীয় বাহন-উষ্ট্র হঠাৎ পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায়ও আর সে উঠিল না। সকলে ভাবিল, হয়তো ইহা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে বসাইয়া দিলেন।" একথার তাৎপর্য এই যে, এখন আমাদের মক্কায় যাওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা নহে। তৎপরে হযরত (দঃ) বলিলেন, "কুরাইশগণ আমাকে যে কোন কথাই বলুক, যদি তাহাতে আল্লাহ্র ঘরের মর্যাদা বিনষ্ট না হয়, তাহাই আমি স্বীকার করিব।" একথার পরই উটটি গাত্রোত্থান করিল। হযরত (দঃ) হোদায়বিয়া নামক কূপের নিকট গিয়া অবতরণ করিলেন। এখানেও কুরাইশগণ বাধা দিল। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির আলাপ-আলোচনা চলিল। কুরাইশগণ অত্যন্ত কঠিন শর্তসমূহ পেশ করিল। হযরত তৎসমুদয় মানিয়া লইলেন। শর্তের সারাংশ এই—

(১) দশ বৎসর একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে না।

(২) মক্কার কোন লোক তাহার ওয়ারিশগণের অনুমতি ছাড়া মদীনায় চলিয়া গেলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(৩) মদীনা হইতে কোন লোক মক্কায় আসিলে কুরাইশগণ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে না।

(৪) এ বৎসর এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(৫) আগামীতে আসিয়া ওমরা করিতে পারিবেন। কিন্তু তিন দিনের অধিককাল মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন না। অতিরিক্ত যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে আনিতে পারিবেন না; কেবল কোষ-বদ্ধ তরবারি রাখা চলিবে।

www.nagorikpathagar.org

সন্ধি-পত্র সম্পাদিত হওয়ার পর তাঁহারা কোরবানীর জীবগুলি সেখানেই যবাহ্ করিয়া ফিরিয়া চলিলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পূর্বোল্লিখিত স্বপ্নের সুসংবাদে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের মন নিদারুণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাদের মনোবেদনার পরিসীমা রহিল না। হযরত ওমর (রাঃ) পেরেশান হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তিনি সোজা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, "আল্লাহ্র রাসূল, আমরা যখন সত্য পথে আছি, তখন কেন আমরা এতদূর অপদস্থ হইতে যাইব?" উত্তর হইল, "ওমর! আমি আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ কখনও আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। (তবে সবর করা আবশ্যক।)" অতঃপর তিনি উত্তেজিতভাবে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকটে গিয়াও সেই একই কথা বলিলেন, সেখানেও একই উত্তর শুনিয়া, ক্রোধ দমনপূর্বক চুপ করিয়া রহিলেন। হোদায়বিয়া হইতে ফিরিবার পথে 'সূরা-ফাত্হ' অবতীর্ণ হইল, যাহাতে আছেঃ

"(মুহাম্মদ!) আমি আপনাকে খোলাভাবে জয়যুক্ত করিলাম।" —সূরা-ফাত্হ

এ রকম নতি স্বীকারে সন্ধি করাকে 'খোলা জয়' মনে করা সাধারণ চিন্তাশক্তির কাজ নহে। সাহাবাগণ ইহাতে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিলেন।

হোদায়বিয়ার ঘটনা এস্থলে অত্যন্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইল। ইহাতে মোটামুটিভাবে পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, লড়াই-ঝগড়া করা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। যুদ্ধ তো দূরের কথা, তিনি অসম্ভব রকমে নতি স্বীকারে সন্ধি করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু এই নম্রতার ভিতর দিয়াই ইসলামের এরূপ অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল, যাহা যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে কখনও সম্ভবপর হয় নাই। ইসলামের সত্যতার ইহাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে, যতই বাধা দেওয়া হয়, ততই ইহা উন্নত হইতে থাকে।

হোদায়বিয়ার ঘটনার মধ্যে ইসলামের প্রচার ও আদর্শ সম্পর্কীয় যে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় রহিয়াছে, এস্থলে তাহা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই ঘটনায় জনসাধারণের মনে যে কয়েকটি সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে, তাহাও এই আলোচনা দ্বারা বিদূরিত হইয়া যাইবে।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

প্রথমঃ কোন আন্দোলন কার্যে পরিণত করিতে হইলে—সাহস, উৎসাহ্, কর্মতৎপরতা প্রভৃতি অনেক গুণের আবশ্যক হয়; কিন্তু সবচেয়ে বেশী আবশ্যক হয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার। একমাত্র হোদায়বিয়ার ঘটনা দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) ইসলাম প্রচার বিষয়ে কিরূপ অসাধারণ ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে তিনি যে রকম হেয়তা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছেন, তাহা সাধারণ স্থূল বুদ্ধিতে মোটেই সমর্থন করা যায় না। অর্ধ পৃথিবীর ভাবী শাসনকর্তা ওমর ফারূক (রাঃ) উদ্ধত-কণ্ঠে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর মত শান্তশিষ্ট মহান ব্যক্তিও আলোচনার সময় এক একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন! কিন্তু মহানবীর বিশাল হৃদয়ে সামান্য মাত্রও আলোড়ন নাই—অস্থিরতা নাই। তিনি স্বীয় লোকাতীত দূরদর্শিতা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই সাময়িক নতি স্বীকারের ভিতরে বিরাট সাফল্য নিহিত রহিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন যে, "ইহাই আমাদের পক্ষে খোলা জয়।" একথার তাৎপর্য সে সময় কেহ বুঝিতে না পারিলেও পরে তাহা স্পষ্টরূপে সকলের বোধগম্য হইয়াছিল।

www.nagorikpathagar.org

বাস্তবিকপক্ষেও ইহা বড় রকমের জয়লাভ ছিল। হিজরতের পূর্বে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারের সুযোগ হওয়া তো দূরের কথা তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করাও কঠিন ছিল। হিজরতের পরেও মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লাগিয়াই ছিল। সাধারণত এই যুদ্ধবিগ্রহগুলিকে ইসলাম প্রচারের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু ইসলাম প্রচারের সঙ্গে উহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক মোটেই ছিল না।

আরবের লোকেরা যুগ-যুগান্তরের সংস্কারবিহীন কুআচার ও কুপ্রথার পূতিগন্ধময় অন্ধ কূপে নিমজ্জিত ছিল। এই অন্ধকারের বাহিরে আর যে কোন আলো থাকিতে পারে, একথা তাহাদের ধারণা বহির্ভূত ছিল। ইসলামের আলো প্রকাশিত হওয়ার পর তাহারা এই আলোর দিকে আসিতে সুযোগ পায় নাই। অনেক ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শেষ নবী (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলামের আদর্শ অবগত হওয়ার সাহস পর্যন্ত প্রাপ্ত হয় নাই। হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়াতে মুসলমান ও কুরাইশ দলের যুদ্ধ বিরতি ঘটে। ইহার পর চতুর্দিক হইতে দলের পর দল, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় মদীনায় আসিয়া ইসলামের আদর্শ অবগত হইতে এবং সত্য ধর্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মানব জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, হোদায়বিয়া-সন্ধির পর দুই বৎসরের মধ্যে এত অধিক লোক মুসলমান হইয়াছিল, যাহা ইহার পূর্বেকার ষোল বৎসরেও সম্ভবপর হয় নাই।

দ্বিতীয়ঃ "ফতহে-মুবীন" বা খোলাভাবে জয়যুক্ত করার মর্মার্থ কি, এ সম্বন্ধে তফসীরকার আলেমগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের প্রধান মত দুইটি—মক্কা বিজয় ও হোদায়বিয়ার সন্ধি। এই আয়াত হোদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় অবতীর্ণ হয়। মক্কা বিজিত হয় ইহার কয়েক বৎসর পরে; সুতরাং যাহারা ইহার অর্থ মক্কা বিজয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা "জয়যুক্ত করিলাম" একথার অর্থ এইভাবে গ্রহণ করেন যে, "জয়যুক্ত করা সাব্যস্ত করিলাম।" কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতেই ইহার অর্থ হোদায়বিয়ার সন্ধি।

তফসীরে ফত্হুল বয়ানে আছে, "যুহরী বলেন, হোদায়বিয়া-সন্ধির চেয়ে অন্য কোন জয়লাভই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। ইহার কারণ, এই সন্ধির পরে মুশ্রিকগণ মুসলমানদের সঙ্গে মিলামিশা আরম্ভ করে এবং তাঁহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করে; ফলে বিধর্মীদের অন্তঃকরণে ইসলাম ধর্ম স্থানপ্রাপ্ত হয় এবং তিন বৎসরের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।"

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ বলেন, "তোমরা মক্কা বিজয়কে (কোরআনে উল্লিখিত) জয়লাভ বলিয়া মনে কর, কিন্তু আমরা জয়লাভ অর্থে হোদায়বিয়া-সন্ধি বুঝিয়া থাকি।" —ইবনে কাসীর

তৃতীয়ঃ ইসলাম ধর্মে এমন আকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে যে, অন্য ধর্মের লোকেরা ইহার সংস্পর্শে আসিলে এবং সত্যিকার মুসলমানদের চালচলন এবং আচার ব্যবহার দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে; অনেক স্থলে তবলীগেরও আবশ্যক হয় না। হোদায়বিয়া-সন্ধির পরে ইহাই ঘটিয়াছিল। যাঁহারা ইসলাম প্রচারকে যুদ্ধবিগ্রহ ও বলপ্রয়োগের ফল বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার ভাবিতে বলি—বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, জাভা এবং সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জে যে কোটি কোটি মুসলমানের বাস, তাহারা কোন্ যুদ্ধের ফলে মুসলমান হইয়াছিল? আদিম কাল হইতে আরব বণিকগণ জলপথে এই সমস্ত স্থানে গমনাগমন করিত। আরবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর যখন তাহারা নূতন মানুষের আকারে সে সব জায়গায় পৌঁছিল, তখন তথাকার অধিবাসীরা তাহাদের আচার ব্যবহার দৃষ্টে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মুসলিম বণিকদের দ্বারাই যে এ সমস্ত স্থানে ইসলাম প্রচারিত

www.nagorikpathagar.org

হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই। বণিকদের কোন প্রচার-মিশন ছিল না, কোন প্রকার যোগাড়-যন্ত্রও ছিল না। কিন্তু সত্যিকার ইসলামিক যুগে প্রত্যেক মুসলমান ছিলেন প্রচারক, ইসলাম ধর্ম ছিল তাঁহাদের প্রচার-মিশন; আর তাঁহাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ছিল তবলীগ বা ধর্ম প্রচার। অধুনা মুসলমানগণ বিজাতীয় অনুকরণে কত কিছু অনুষ্ঠান করিতেছে; কিন্তু তাহাদের কাজকর্মে ও আচার ব্যবহারে ইসলামের বাস্তব রূপ না থাকায় কোন কিছুতেই ফলোদয় হইতেছে না।

চতুর্থঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হোদায়বিয়া গমনের পূর্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা সে সময় কার্যে পরিণত না হওয়ায় সর্বসাধারণের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের মনেও এই সন্দেহ উদিত হইয়াছিল। এমন কি হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল মকবূল (দঃ)-এর নিকট যাইয়া কহিলেনঃ "আপনি কি আমাদিগকে সংবাদ দেন নাই যে, আমরা কা'বা গৃহে পৌঁছিব এবং উহা প্রদক্ষিণ করিব? (তবে এখন তাহা হইল না কেন?)" হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেনঃ

"অবশ্যই বলিয়াছিলাম; কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, এই বৎসরই তুমি কা'বা গৃহে পৌঁছিবে?" হযরত ওমর (রাঃ) কহিলেন, "আপনি এ রকম বলেন নাই।" অনন্তর হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, "এ বৎসর না হয় না হউক, পরে অবশ্যই আমার স্বপ্ন সফল হইবে এবং তোমরা কা'বা গৃহে প্রবেশ করিবে।" —ইবনে কাসীর

তৎপর ওমর (রাঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করিলে তিনিও একই উত্তর দিলেন।

এই কথোপকথন দ্বারা আমাদের লিখিত প্রশ্নটির মূলোৎপাটন হইয়া যাইতেছে। স্বপ্ন সঙ্গে সঙ্গেও ফলে, বিলম্বেও ফলে। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই স্বপ্ন পরে হুবহু ফলিয়াছিল। মুসলমানগণ পরের বৎসর মক্কায় প্রবেশ করিয়া কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ ও অন্যান্য ক্রিয়া সমাধা করেন। পরে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা কা'বার কর্তৃত্ব লাভ করেন—মক্কার বক্ষে ইসলামের বিজয় ধ্বজা উড্ডীন হয়।

মুনাফেক দলের কু-কীর্তিঃ

মদীনার আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক যদিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল যাহারা প্রকাশ্যে ইসলামের ভান করিয়া মুসলমানদের দলে মিলিত হইলেও তাহাদের অন্তর ধর্মহীনতা এবং হিংসা-বিদ্বেষের আবাস স্থান ছিল। এই দলকেমুনাফেক বা কপট বিশ্বাসী বলা হয়। তাহারা বাহ্যিকভাবে নামায রোযা ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মকর্ম করিত, ধর্মযুদ্ধেও মুসলমানদের সঙ্গে শরীক হইত; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। মুসলমানদের ছিদ্রান্বেষণ, কথায় কথায় কুটতর্ক, দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ইত্যাদি তাহাদের দৈনন্দিন কাজ ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই মুনাফেক সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَايَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

"একদল লোক এরূপও আছে, যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা বিশ্বাসী নহে। তাহারা কেবল আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসী-দিগকে ধোঁকা দিতে চাহিতেছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহারা নিজদিগকেই ধোঁকা দিতেছে; অথচ তাহারা বুঝিতেই পারিতেছে না (যে, এই কপটতার কুফল তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে)।" —সূরা-বাকারা

তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার এবং বিপক্ষকে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটা মন্ত্রণাগৃহ প্রস্তুত করিয়াছিল। যাহাতে মুসলমানগণ তাহাদের কুমতলব বুঝিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ঘরটি মসজিদের আকারে তৈয়ার করিয়াছিল। কোরআন শরীফে ইহাকে 'মসজিদে-যেরার' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এরূপ 'আস্তিনের সাপ' দ্বারা কতদূর অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা কোন জ্ঞানবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটই দুর্বোধ্য নহে। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওহী দ্বারা এই শ্রেণীর সকল লোকের পরিচয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানগণ বিশেষরূপে আনসারগণ মুনাফেকদিগকে ভালরূপে চিনিতেন। কারণ, মুনাফেকেরা আনসারদের বংশের লোক ছিল। ইচ্ছা করিলে মুসলমানগণ মুনাফেক দলকে অনায়াসে পিষিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদের প্রতি সামান্য রকমের কঠিন ব্যবহার করাও পছন্দ করেন নাই। তিনি ইসলাম প্রচারকে ইসলামের সত্যতা ও নিজস্ব সৌন্দর্যের উপর ন্যস্ত রাখিয়া মুনাফেকদের কুমন্ত্রণা ও প্রোপাগাণ্ডার কোন পরোয়াই করেন নাই।

একবারের ঘটনাঃ যুদ্ধোপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কয়েকজন আনসার ও মোহাজেরসহ দূরবর্তী স্থানে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে পথে এক আনসার ও এক মোহাজেরের মধ্যে বিবাদ বাধে। প্রত্যেকে নিজ নিজ দলকে সাহায্যার্থে আহবান করিতেই অনেক লোক আসিয়া একত্রিত হইল। হযরত হট্টগোল শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামের পরও তোমরা অন্ধকার যুগের মত ঝগড়ায় রত হইতেছ!" অতঃপর তিনি উভয়কে বুঝাইয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন।

মুনাফেক দলের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই নিজের দলের ভিতরে বসিয়াছিল। সে সর্বদাই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। এক্ষণে উপযুক্ত সময় দেখিয়া কহিতে লাগিল, "মদীনাবাসীরা নিতান্ত নির্বোধ, তাই তাহারা মক্কা হইতে আগত প্রবাসীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া এই অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর নিশ্চয়ই আমরা এই কপর্দকহীন প্রবাসী দলকে মদীনার ত্রিসীমা হইতে বাহির করিয়া দিব। কোরআন পাকেও তাহার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতঃপর ইবনে উবাই উপস্থিত আনসারদিগকে মোহাজেরদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য নানারূপ কৌশল করিতে লাগিল। যায়েদ ইবনে আরকাম নামক এক সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া মুনাফেক দলের কুমন্ত্রণার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একথা শুনিয়া হযরত (দঃ) সমীপে আরয করিলেন, "এই কপট বিশ্বাসী ধুরন্ধরকে বধ করার আদেশ দেওয়া হউক।" হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) শান্তভাবে বলিলেনঃ "ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। ইহাতে জনসমাজে প্রকাশ পাইবে যে, মুহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে বধ করিয়া থাকেন।" (ইহাতে ইসলাম প্রচারে বাধা পড়িবে।)

হযরত (দঃ) নিজের দূরদর্শিতা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই আলোচনা যতই বাড়ানো হইবে, ততই বিবাদ বৃদ্ধি পাইবে। এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আনসার সম্প্রদায়ের সরদার এই সময় হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামকাল পূর্ণ না হইতেই রওয়ানার আদেশ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কথা খুলিয়া বলিলে আনসার-সরদার কহিলেন, "আপনি মদীনায় গিয়াই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তাহার দলকে বাহির করিয়া দিবেন।" ইবনে উবাই যখন জানিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাহার কথা শুনিয়া ফেলিয়াছেন, তখন সে ভীতত্রস্ত ভাবে হযরতের নিকটে আসিয়া শপথ করিয়া বলিতে লাগিল, "হুযূর, আমি এমন কথা কখনও বলি নাই। গোলামের কি সাধ্য, মনিবের বিরুদ্ধে এমন কথা বলে?" উপস্থিত লোকেরাও সুপারিশ করিয়া কহিল যে, ইবনে উবাই হয়তো অন্য কিছু বলিয়া থাকিবে। যায়েদ ইবনে আরকাম ছেলে মানুষ, হয়তো সে কি শুনিয়া ফেলিয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষেই কোরআন পাকের সূরা-মুনাফিকূন (মুনাফেক অধ্যায়) অবতীর্ণ হয় এবং তাহাতে যায়েদের সত্যবাদিতা ও ইবনে উবাই-এর মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর পুত্রের নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি পাকা মুসলমান ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা অবগত হইয়া হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জানিতে পারিলাম আমার পিতা এরূপ ব্যবহার করেন। হয়তো আপনি তাহাকে বধ করার ইচ্ছা রাখেন। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি স্বহস্তে তাঁহার মাথা কাটিয়া হাযির করি।" হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, "ইহা কখনও হইতে পারিবে না; সে যখন বাহ্যিকভাবে আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, তখন তাহার সঙ্গে নম্র ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই করিতে পারি না।"

—জমউল-ফাওয়ায়েদ, এশাআতে ইসলাম

এ রকম শত্রুর সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা এবং তাহাদিগকে দলের সঙ্গে মিলিতে দেওয়া রাজনীতি ও সমাজনীতির দিক দিয়া বাহ্যিকভাবে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দূরদর্শিতার সীমা নির্ধারণ করা সাধারণ বুদ্ধির কাজ নহে। অবশ্য এই উদারতা সম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে কয়েকটি কথা আসিতেছে এবং যাহা আমাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সংস্রব রাখে, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

উদারতার সুফল ঃ

প্রথম ঃ ভালবাসা ও নম্রতার ভিতর দিয়া যেভাবে কোন মতবাদ জনসমাজে প্রচারিত হইতে পারে, কাঠিন্যের ভিতর দিয়া তেমন হইতে পারে না। এস্থলে মুনাফেকদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা দুনিয়ার আইন-কানুনের দিক দিয়া কোনই দূষণীয় হইত না সত্য, কিন্তু ইহাতে হয়তো অজ্ঞ জনসাধারণের মনে বিরূপ ভাব জাগিতে পারিত। বিধর্মীদের পক্ষেও ইসলাম এবং পয়গম্বরের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ ঘটিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যধারণ এবং নম্র ব্যবহার বজায় রাখাতে একদিকে যেমন এই সমস্ত অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া গেল; অপর দিকে তদ্রূপ সর্বসাধারণের অন্তরে সতত মুনাফেকদের প্রতি ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠিল। উল্লিখিত ঘটনার পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই জনসাধারণের নিকট সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে সে নিজের দলবলসহ সকলের নিকট অস্পৃশ্য ও ঘৃণার পাত্র হইয়া রহিল। শাসন এবং বলপ্রয়োগে যাহা সম্ভব হইত না, সদয় ব্যবহারে তাহাই সম্ভবে পরিণত হইল।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয়ঃ ইসলাম ধর্ম যে নিজের সত্যতা ও সৌন্দর্যের কল্যাণে জগৎময় প্রচারিত হইবে এবং কোন শক্তিই যে তাহাতে বাধা জন্মাইতে পারিবে না, এ বিষয়ে রাসূল (দঃ) পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতেন। সুতরাং তিনি মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টাকে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্‌বুদের চেয়ে বেশী কিছু বলিয়া ভাবিতেন না। এজন্যই ঘরের শত্রুকে সত্বর বিনষ্ট করা তো দূরের কথা, তাহাদের কার্যকলাপ ব্যাহত করার চেষ্টাকেও তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। ফল এই হইল যে, ইসলাম ধর্ম অবাধ গতিতে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এদিকে মদীনা শরীফের পবিত্র বক্ষ মুনাফেকের অস্তিত্ব হইতে স্বতঃই চিরপবিত্র হইয়া উঠিল।

দ্বীন ইসলামের জন্য অপূর্ব আত্মত্যাগঃ

বদর যুদ্ধের এক বৎসর পরে ওহুদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের আংশিক পরাজয় ঘটিয়াছিল। ওহুদের যুদ্ধে মক্কাবাসী আবু তাল্‌হা ও তাহার দুই পুত্র, মুসলিম যোদ্ধাদের হাতে নিহত হইয়াছিল। আবু তাল্‌হার স্ত্রী সলাফা শপথ করিল, তাহার পুত্রদ্বয়ের ঘাতক আসেমের মাথার খুলিতে সে মদ্যপান করিবে। যে ব্যক্তি আসেমের মাথা আনিয়া দিবে, তাহাকে একশত উষ্ট্র দান করার মর্মে সলাফা ঘোষণাবাণী প্রচার করিল। মক্কার নিকটবর্তী স্থানের সুফিয়ান ইবনে খালেদ নামক এক ব্যক্তি পুরস্কারের লোভে হযরত আসেমকে বধ করার ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

সুফিয়ান সাতজন চতুর লোক মদীনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণের ভান করিয়া বলিল, 'হুযূর ! আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক। অনুগ্রহপূর্বক কয়েকজন প্রচারক আমাদের সঙ্গে পাঠাইলে খুবই সুফলের আশা করা যায়।' এই সঙ্গে আসেমকে প্রেরণ করার অনুরোধও তাহারা করিল। তাহাদের অনুরোধ মত সরল হৃদয় আল্লাহ্‌র রাসূল আসেমসহ দশজন প্রচারককে পাঠাইয়া দিলেন। যাহা হইবার তাহাই হইল। তাহারা আসকান এবং মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিতেই সুফিয়ান বহুসংখ্যক তীরন্দাজসহ তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

আসেম (রাঃ) সঙ্গিগণসহ নিকটবর্তী একটি টিলায় আরোহণকরত শর নিক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্যক কাফের ধরাশায়ী হইল। শর নিঃশেষ হওয়ার পর তিনি বর্শা হস্তে আক্রমণ করিলেন। যখন বর্শাও ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তরবারি হাতে যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্মের জন্য অকাতরে প্রাণ দান করিলেন।

আসেম মৃত্যুর পূর্বে দো'আ করিলেন, "আয় আল্লাহ্! আমার মৃত্যুর খবর তোমার রাসূল (দঃ)-কে পৌঁছাইয়া দিও ; আর আমার মৃতদেহকে কাফেরদের অনাচার হইতে রক্ষা করিও।" তাঁহার উভয় দো'আই কবুল হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওহী দ্বারা খবর জানিতে পারিয়া সঙ্গীদিগকে এই কথা জানাইলেন। আসেমের মৃত্যুর পর একদল মধুমক্ষিকা তাঁহার মৃতদেহকে ঘিরিয়া রাখিল। কাফেরগণ নিকটেও আসিতে পারিল না। রাত্রিকালে এক ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়া তাঁহার পবিত্র দেহ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, কেহই জানিতে পারিল না।

আসেম (রাঃ)-এর আরও ছয় জন সঙ্গী এই যুদ্ধে শহীদ হইলেন। সঙ্গীদের মধ্যে হযরত খোবায়ব ও আর দুই ব্যক্তি বিধর্মীর হস্তে 'বন্দী' হইলেন। খোবায়ব (রাঃ)-এর এক সাথী কৌশলে

www.nagorikpathagar.org

হস্তদ্বয় বন্ধন মুক্ত করিয়া প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করিলেন। বিপক্ষ দল তাঁহার আক্রমণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া দূর হইতে তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে তিনিও তাঁহার অগ্রগামী ছয় শহীদের সঙ্গে বেহেশতে যাইয়া মিলিত হইলেন। এখন কাফেরগণ খোবায়ব ও তাঁহার এক সঙ্গীকে বন্দী অবস্থায় মক্কায় লইয়া চলিল। মক্কায় তাহাদিগকে বিক্রয় করা হইল। খোবায়ব (রাঃ)-কে হারেসের পুত্রগণ এবং তাঁহার সঙ্গী যায়েদ (রাঃ)-কে আর এক ব্যক্তি ক্রয় করিল। নরপিশাচগণ হযরত খোবায়বকে কিরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল এবং তিনি ধর্মের জন্য কিরূপ অবিচলিত আত্মোৎসর্গের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করাই বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্যস্থল।

হারেস ওহুদের যুদ্ধে হযরত খোবায়ব (রাঃ)-এর হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই হারেসের পুত্রগণ হযরত খোবায়বকে উচ্চমূল্যে খরিদ করিয়াছিল।

বন্দী অবস্থায় একদিন হযরত খোবায়ব হারেসের এক কন্যার নিকট হইতে নিজের ক্ষৌরকার্যের জন্য একটি ক্ষুর চাহিয়া লইলেন। এমন সময় স্ত্রীলোকটির এক শিশু সন্তান খোবায়বের ক্রোড়ে যাইয়া বসিল। স্ত্রীলোকটির ভয় হইল, হয়তো প্রাণ রক্ষায় নিরাশ বন্দী, শিশুটির অনিষ্ট করিতে পারে। হযরত খোবায়ব তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তুমি কি ভয় করিতেছ যে, আমি শিশুর প্রাণ বধ করিব? মুসলমান কখনও এমন কাজ করিতে পারে না।" উক্ত স্ত্রীলোক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, আমি কখনও এইরূপ উত্তম কয়েদী আর দেখি নাই। স্ত্রীলোকটি বলিয়াছেন—

"আমি খোবায়বকে বন্দী অবস্থায় তাজা আঙ্গুর খাইতে দেখিয়াছি। অথচ সেই মওসুমে মক্কায় কোন প্রকার ফলই ছিল না। ইহা স্থির নিশ্চিত যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা খোবায়বের জন্য এই সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" —বোখারী শরীফ

হযরত খোবায়ব (রাঃ)-কে বধ করার নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইল। খোবায়ব (রাঃ) কহিলেন, "আল্লাহ্র পথে প্রাণ দিতে আমার কোনই কষ্ট নাই। কিন্তু আমার অন্তিম অনুরোধ, আমাকে দুই রাকআত নামায পড়িতে দাও।" কাফেরগণ তাঁহাকে অবসর দিলে তিনি তাড়াতাড়ি দুই রাকআত নামায সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, নামাযের মত আনন্দদায়ক জিনিস মু'মিনের পক্ষে আর কিছুই নাই। আমার আরও নামায পড়িতে মন চাহিতেছিল; কিন্তু পাছে তোমরা মনে কর যে, আমি মৃত্যুভয়ে উপাসনার ভান করিতেছি, এজন্য আমি দ্রুত নামায সমাপ্ত করিলাম।

অতঃপর খোবায়বকে শূলদণ্ডে আরোহণ করাইয়া কেবলা হইতে তাঁহার মুখ অন্য দিকে করিয়া দেওয়া হইল। খোবায়ব (রাঃ) বলিলেন, "আমার মন যখন খোদার দিকে আছে, তখন তোমরা আমার মুখ যে দিকেই কর না কেন, সে দিকেই আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব।" কাফেরগণ কহিল, "তোমাকে এখন ছাড়িয়া দেওয়া হইলে এবং তোমার জায়গায় তোমাদের পয়গম্বরকে শূলে দেওয়া হইলে তাহাতে রাজি হইবে কি?" খোবায়ব (রাঃ) কহিলেন, "খোদার শপথ, আমার প্রাণ থাকিতে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হওয়াও আমি পছন্দ করিতে পারি না।" —মাদারেজ

ফলকথা, বহুবিধ প্ররোচনা ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা খোবায়বকে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কিছুতেই অটল বিশ্বাস টলিল না। তখন চল্লিশজন নররূপী পিশাচ এক সঙ্গে তাঁহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। হযরত খোবায়বের মধ্যে মৃত্যু ভয়ের সামান্য নিদর্শনও প্রকাশ পাইল না। অবশ্য

www.nagorikpathagar.org

তাঁহার দেহ খানিকটা স্পন্দিত হইল; ফলে তাঁহার মুখ কেবলার দিকে হইয়া গেল। তিনি অস্ফুট স্বরে শেষ বাক্য উচ্চারণ করিলেন, "আল্লাহ্‌র শোকর এক্ষণে আমার মুখও কেবলার দিকে হইল।"

হযরত খোবায়ব (রাঃ)-এর মত তাঁহার সঙ্গী যায়েদ (রাঃ)-কেও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইল। রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) ওহী দ্বারা সঙ্গেসঙ্গেই এই ঘটনা জানিতে পারিয়া সহচরবৃন্দের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন "খোবায়বের মৃতদেহ শূলবিদ্ধ অবস্থায়ই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যে তাহার মৃতদেহ কাফেরদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারে?" যোবায়র (রাঃ) এবং মেক্‌দাদ (রাঃ) গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "হুযূরের আদেশ হইলে আমরা যাইতে প্রস্তুত আছি।" হযরত (দঃ) অনুমতি দিলে তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। দিবাভাগে তাঁহারা কোন নির্জন স্থানে লুকাইয়া থাকিতেন; আবার রাত্রিতে পথ চলিতেন। হযরত খোবায়বের মৃতদেহের নিকট চল্লিশজন সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। একদা রাত্রিকালে প্রহরিগণ নিদ্রাভিভূত হইলে যোবায়র ও মেক্‌দাদ সুযোগ বুঝিয়া মৃতদেহ শূলদণ্ড হইতে তুলিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। প্রহরিগণ জানিতে পারিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। যোবায়র অনন্যোপায় হইয়া মৃতদেহ মাটিতে রাখিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মাটি উহাকে নিজের উদরে গ্রহণ করিল। যোবায়র ও তাঁহার সাথী তরবারি হস্তে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই পশ্চাদগামী বীরবৃন্দ পলায়ন করিল। যোবায়র মদীনায় আসিয়া হযরত (দঃ)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন।

এই অভাবনীয় অলৌকিক আত্মত্যাগের ঘটনা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই বর্ণনা করা হইল। এক্ষণে আমরা এই ঘটনায় শিক্ষণীয় যে সমস্ত বিষয় রহিয়াছে, উহার যৎকিঞ্চিত আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

প্রথমঃ এই ঘটনায় শহীদ সাহাবীদের কয়েকটি কারামত প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

(ক) আসেমের দো'আ অনুযায়ী তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গেই হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এই ঘটনা জানিতে পারিলেন।

(খ) আসেমের মৃতদেহকে মধুমক্ষিকার দল কাফেরদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং পরে জলপ্রবাহ উহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

(গ) বন্দী অবস্থায় খোবায়ব (রাঃ)-এর নিকট তাজা আঙ্গুর আসিত, অথচ সেই মওসুমে মক্কায় কোন প্রকার ফলই ছিল না।

(ঘ) কেবলার বিপরীত দিকে মুখ করিয়া খোবায়ব (রাঃ)-কে শূলদণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুর সময় অচিন্তনীয়ভাবে তাঁহার মুখ কেবলার দিকে ফিরিয়াছিল।

(ঙ) খোবায়বের মৃতদেহ অলৌকিকভাবে মৃত্তিকাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল।

উম্মতের ওলী-দরবেশদের সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার পয়গম্বরের মো'জেযার মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং এই ঘটনাগুলি প্রকারান্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর মো'জেযারই শামিল। ইসলামের সত্যতা অবশ্য মো'জেযার উপরে নির্ভর করে না। কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে মো'জেযাগুলিই পয়গম্বর ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের সত্যতা অনুভব করার সহায় হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি যে, একটি ঘটনায় এতগুলি অলৌকিকতার সমাবেশ, নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

www.nagorikpathagar.org

মো'জেযাগুলির বড় অংশই আমরা সহীহ্ বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঘটনাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের সীমা লঙ্ঘনকরত সামান্য অতিরঞ্জিত করার অপরাধও আমরা করি নাই। সুতরাং এইরূপ প্রামাণিক ঘটনায় কোন প্রকার সন্দেহেরই অবকাশ নাই। অবশ্য যাহারা অলৌকিক ব্যাপারকে কাটিয়া ছাটিয়া মানানসই করিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। রেওয়ায়তের দিক দিয়া কোন দুর্বলতা খুঁজিয়া না পাইলেও হয়তো তাঁহারা বলিবেন, 'ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়াছে।' হয়তো বলিবেন, 'মধুমক্ষিকারা ঘটনাক্রমেই দল বাঁধিয়া মৃতদেহের নিকট আসিয়াছিল।' খোবায়ব (রাঃ)-এর মৃতদেহও ঘটনাক্রমে মাটির ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতগুলি 'ঘটনাক্রম' একত্রিত হওয়া কি অলৌকিক এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন নহে? আল্লাহ্ তা'আলা যে এই শহীদদিগকে অত্যন্ত ভালবাসেন, এই ঘটনাগুলি দ্বারা কি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না?

দ্বিতীয়ঃ এই শহীদগণের ঘটনা একটু ধীর হৃদয়ে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় কতখানি নিঃস্বার্থ আত্মদান, নির্ভীকতা এবং ভক্তি ও স্থিরতা তাঁহাদের মধ্যে ছিল। মুখে মুখে অনেকেই আত্মত্যাগের বড় বড় বুলি আওড়াইতে পারে, কিন্তু বাস্তবজগতে এই মহান হৃদয় সাধুপুরুষদের উপমা খুঁজিয়া পাওয়া শুধু কঠিনই নহে—অসম্ভবও বটে। ভাবিবার বিষয় দুদিন পূর্বে এই লোকগুলিই লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিত। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের ভিতর এই যুগ পরিবর্তন কোথা হইতে আসিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে কি? হযরত (দঃ)-এর পবিত্র সংস্পর্শ এবং ইসলামের নিখুঁত আদর্শ কি তাঁহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্তনের একমাত্র কারণ নহে?

তৃতীয়ঃ মৃগনাভিকে যতই ঘর্ষণ করা যায়, ততই উহার সুগন্ধি অধিক প্রকাশ পায়। তদ্রূপ ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানগণের বিনাশ সাধনার্থে বিধর্মীদের পক্ষ হইতে যতই অপচেষ্টা হইয়াছিল, ততই আরও বেশী ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছিল। খোবায়বের ঘটনায়ই দেখুন, তাঁহারা মৃত্যুবরণ করিলেন সত্য, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহারা লোকদের জন্য এবং অনাগত সমাজের জন্য এক চরম মুক্তিপথের সন্ধান রাখিয়া গিয়াছেন। একমাত্র এই ঘটনার কল্যাণে কতলোক ইসলাম ধর্মের ছায়ায় আসিয়াছিল, কত লোকের ঈমান পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও করিবে, তাহার হিসাব কে করে?

■

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

সমকালীন শাসকবর্গের নামে পত্র

হোদায়বিয়ার সন্ধি হিজরী ষষ্ঠ সনে সম্পাদিত হইয়াছিল। সন্ধিপত্রের কারণে কুরাইশদের সহিত লড়াই-ঝগড়ার আশু মীমাংসা হওয়ায় হযরত নবী করীম (দঃ) দূরদেশে ইসলামের বাণী প্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। আমরা প্রথমে বলিয়াছি, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) কেবল যে আরব দেশের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, এমন নহে; তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য। সুতরাং আরবের ভিতরে ইসলাম প্রচার করাতেই তাঁহার কর্তব্য সমাপ্ত হইল না। সমস্ত পৃথিবীতেই তাঁহাকে ইসলামের বাণী পৌঁছাইতে হইবে। এই কর্তব্য পালনার্থে তিনি এক্ষণে বিভিন্ন দেশের বাদশাহ ও শাসনকর্তাগণের নামে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্র প্রেরণের কাজ হিজরী ষষ্ঠ সনের শেষাংশে অথবা সপ্তম সনের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এস্থলে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কতিপয় পত্র এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনা প্রকাশ করিব। তৎপূর্বে একথা বলিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি যে, পত্র ব্যবহারের কাজ যে সময় হইয়াছিল, সে সময় আরবের ভিতরেও মুসলমানদের শক্তি দৃঢ়ীভূত হয় নাই। ইহা এইরূপ কঠিন সময় ছিল যে, বাহির ভিতর উভয় দিকেই মুসলমানদের শত্রু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। মক্কার কুরাইশগণ প্রকাশ্য ও বড় শত্রু ছিল। মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের গৃহপশ্চাতেই অবস্থিত ছিল। ঘরের ভিতরেও মুনাফেক দল মুখোশপরা দুশমনরূপে বিরাজ করিতেছিল। এই সমস্ত দুশমনের মোকাবেলা করার মত বাহ্যিক আসবাব মুসলমানদের নিকট মোটেই ছিল না। এতদবস্থায় বাহিরের রাজা-বাদশাহগণ মুসলমানদিগকে ভয় করা তো দূরের কথা তাহাদিগকে হিসাবের মধ্যেও গণ্য করিতে পারেন না। অতএব, কোন নির্বোধ ব্যক্তিও একথা বলিতে পারিবে না যে, এই সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বাহ্যিক শক্তির ভরসায় বাদশাহগণের নামে পত্র ব্যবহার করিয়া -ছিলেন। বাস্তবপক্ষে তাঁহার এমন কোন ক্ষমতাই ছিল না। তৎকালে রোমান এ্যামপায়ার এবং পারস্যের কায়ানী বংশের রাজত্ব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাজশক্তি ছিল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য এবং তদনুরূপ সাজ-সরঞ্জাম তাহাদের নিকট বিদ্যমান ছিল। এদিকে মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, তাহাদের নিকট এ সময় পর্যন্ত হাজার যোদ্ধাও একত্রিত হয় নাই। এক বেলা আহার জুটিলে আর এক বেলা উপবাস করিতে হয়। গায়ে জামা থাকিলে পরনে লুঙ্গি থাকে না; লুঙ্গি থাকিলে জামার অভাব ঘটে। এরূপাবস্থায় উল্লিখিত অজেয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাওয়া অথবা ভয় প্রদর্শনে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করার কল্পনা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এই কাজ বাহ্যিক উপকরণ ও উপলক্ষ্যের উপরে ন্যস্ত ছিল না; তাহা কেবল আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থেই করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি খোদা তা'আলার আদেশ ছিলঃ

www.nagorikpathagar.org

يَـٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط

"হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা প্রচার কর।"
—কোরআন, সূরা-মায়েদা

হযরত (দঃ) এই হুকুম পালন করার জন্যই সকলের নিকট প্রায় একই রকমের মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। জগতের সাধারণ নিয়ম এই যে, যাহার নিকট পত্র লেখা হয়, তাহার অবস্থার উপর পত্রের মন্তব্য অনেকখানি নির্ভর করে। সম্রাটের নিকট যে পত্র লেখা হয়, তাহা গভর্নরের নিকট লিখিতে গেলে বোকামি প্রকাশ পায়; তদ্রূপ গভর্নরের নিকট লেখার যে নিয়ম, সেই নিয়মে সর্ব-সাধারণের নিকট লিখিতে যাওয়াও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি ও আদব-কায়দা থাকে। রাজ-রাজড়াদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে সেই সমস্ত আদব -কায়দা ও নিয়ম পদ্ধতি প্রথমে জানিয়া লওয়াই জগতের সাধারণ নিয়ম। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এই নিয়মের অনুসরণ করেন নাই। কারণ, তিনি কাহারও নিকট হইতে নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ উদ্ধারের আশা করেন নাই। তিনি খোদার ফরমান সকলের নিকট পৌঁছানের জন্যই পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ এক, তাঁহার বিধান অভিন্ন। হযরত (দঃ) সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন—সকলের প্রতি খোদার হুকুম পৌঁছাইতে তিনি সমানভাবে আদিষ্ট ছিলেন; সুতরাং এখানে রাজা-প্রজা ও ধনী-দরিদ্রের তফাৎ থাকিতে পারে না, ছোট বড়র মধ্যে প্রভেদ করা চলে না। অতএব, সকল পত্রের ভাব ও ভঙ্গী একই ধরনের ছিল। সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জনিত যেমন পত্রের ভাব ও ভাষা সামান্য মাত্র ব্যাহত হয় নাই, তেমনি দৈন্য ও অনুকম্পা প্রার্থনার বিন্দুমাত্র আভাষও তাহাতে প্রকাশ পায় নাই। একথা সহজেই বুঝা যায় যে, কোন অদৃশ্য শক্তির সংমিশ্রণ ভিন্ন মানুষের মনে এরূপ অচিন্তনীয় নিঃশঙ্কভাব ও সাহস কিছুতেই আসিতে পারে না।

পত্রগুলির মন্তব্য যদিও অত্যন্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু এগুলির ভিতর এমনি অদৃশ্য আধ্যা-ত্মিক শক্তি নিহিত ছিল যে, যাহাদের মাথায় সত্যাসত্য ও হক না-হকে পার্থক্য করার মত বিচারবুদ্ধি আছে, তাহারা কখনও অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না। পত্র-গ্রহীতা বাদশাহদের মধ্যে যাঁহাদের মনে এই অদৃশ্য শক্তি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহারা আনত মস্তকে সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। আর যাহারা মোহান্ধতাবশতঃ বহির্শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই সন্ধান করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারাই পত্রবাহক ও পত্রের অমর্যাদা করত স্বীয় ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছিল।

রোম সম্রাটের নিকট পত্র ঃ

রোমের 'কায়সর' (সম্রাট) হেরাক্লের (হিরাক্লিয়াসের) নিকট যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে লিখা ছিল—

مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَسْلِمْ
تَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ـ وَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ اِثْمَ الْاَكَّارِيْنَ عَلَيْكَ ○

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের (দঃ) পক্ষ হইতে রোমের সরদার হেরাক্লের প্রতি। যাহারা সোজা-পথে চলে তাহাদের উপর সালাম। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে এবং খোদা তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দিবেন (তোমার ইসলাম গ্রহণের এবং তোমার প্রজাদের ইসলাম গ্রহণের)। আর যদি ইহা মান্য না কর, তবে তোমার প্রজাদের গোনাহও তোমার উপর বর্তিবে।" —বোখারী শরীফ

www.nagorikpathagar.org

অতঃপর কোরআন শরীফের একটি আয়াতও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পত্রসহ দাহিয়া কালবী (রাঃ)-কে পাঠান হইল। পথিমধ্যে প্রসিদ্ধ দাতা হাতেম তাইর পুত্র আদিও তাহার সহযাত্রী হইলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে রোম সম্রাট বায়তুল মুকদ্দসে গিয়াছিলেন। দাহিয়া সেখানেই পৌঁছিলেন। কথিত আছে, এই সময় হেরাক্‌ল এক রাত্রে নক্ষত্রের অবস্থান দৃষ্টে জ্যোতিষী বিদ্যা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে এক অস্বাভাবিক বিপ্লব দেখা দিবে। ইহাতে তাঁহার মানসিক অবস্থার ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এতদবস্থায় কেহ আসিয়া তাহাকে দাহিয়া কালবীর আগমনের সংবাদ দিল। আদেশমত হযরত দাহিয়াকে দরবারে আনয়ন করা হইল এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পত্র পাঠ করা হইল। পত্র শ্রবণে হেরাক্‌লের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। অনন্তর হেরাক্‌ল কহিলেন, 'আমার রাজ্যে আরব দেশের এমন কোন লোক পাওয়া যাইবে কি, যাহার নিকট এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানিতে পারি?' হোদায়বিয়া সন্ধির পরই মক্কার আবু সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে খোঁজ করিয়া হেরাক্‌লের নিকট আনয়ন করা হইল। হেরাক্‌ল আবু সুফিয়ানের নিকট হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু সুফিয়ানও যথাযথভাবে সমস্ত কথা খুলিয়া কহিলেন। সব কথা শুনিয়া হেরাক্‌লের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, তিনি সত্য নবী। হেরাক্‌ল আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তাঁহার ধর্ম ও রাজত্ব আমার পদতল (অর্থাৎ, রোম রাজ্য) পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিবে। আমি তাঁহার পদযুগল ধৌতকরত সেই পানি পান করিতে পারিলে আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইত।" —বোখারী প্রভৃতি দ্রঃ

হেরাক্‌লের মত প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ যিনি এশিয়া ও ইউরোপের সম্রাট ছিলেন, তাঁহার মুখে এ রকম উক্তি শুনিয়া আবু সুফিয়ান অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সঙ্গিগণকে কহিলেন, "ভাইগণ, আবু কাবশার পুত্রের (অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদের [দঃ]) কাজ তো অত্যন্ত মজবুত হইয়া পড়িয়াছে।"

সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অতি সহজে বুঝিতে পারিবে যে, কায়সরের মত দুর্দম ক্ষমতাশালী সম্রাট হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পত্রে ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কাসেদ দাহিয়া কালবী সৈন্য বাহিনী লইয়া কায়সরের রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই; পত্রের ভিতরেও এরূপ কোন কথা ছিল না যাহাতে ভাবী আক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তদ্রূপ ইঙ্গিত থাকিলেও তাহাতে কায়সরের ভীত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কারণ, হযরত (দঃ)-এর রাজ্যও তেমন প্রশস্ত ছিল না, তাঁহার নিকট সৈন্য-সামন্ত এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণও ছিল না। কায়সর ইতিপূর্বেই পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয় গর্বে বায়তুল মুকদ্দসে উপাসনা করিতে আসিয়াছিলেন। এরূপাবস্থায় তিনি কোন নগণ্য শক্তির যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িবেন, ইতিহাস সমালোচক কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই এমন কথা বলিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ কায়সর নিজেই যখন বলিতেছেন যে, 'আমি তাঁহার পা-ধৌত পানি পান করিতে পাইলে ধন্য হইতাম।' তখন হযরত (দঃ)-এর প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি সম্পর্কে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কায়সর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ দ্বারা শেষ নবীর নিদর্শন স্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন; তৎসঙ্গে জ্যোতিষী গণনা দ্বারা তাঁহার এই ধারণা আরও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিশেষরূপে হযরত দাহিয়ার বায়তুল মুকদ্দসে পৌঁছার পূর্বেই কায়সর আকাশে কোন বিশেষ নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া জ্যোতিষী গণনা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিবে; হয়তো কোন নূতন জাতির উত্থান হইবে।

www.nagorikpathagar.org

দাহিয়া কর্তৃক আনীত পত্র পাঠে এবং আবু সুফিয়ানের নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়ার পর তাহার ধারণা অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজত্বের মমতা এবং প্রাণের ভয়ে ঈমানরূপ অমূল্য ধন হইতে বিমুখ রহিলেন। বিশ্বাস করা এক কথা, গ্রহণ করা ভিন্ন কথা। কেবল বিশ্বাসেই ঈমান হয় না; বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করিলেই ঈমান অস্তিত্ব লাভ করে।

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কায়সরের যে বাক্যালাপ হইয়াছিল এবং তৎপরে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা না করিলে বিষয়টি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পাঠকগণ ইহা দ্বারা কতিপয় নূতন নূতন তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

কায়সর ও আবু সুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর ঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য কায়সর আবু সুফিয়ানকে আহ্বান করিলে তিনি কয়েকজন মক্কাবাসীসহ দরবারে উপস্থিত হইলেন। কায়সর তাঁহাকে সসম্মানে নিজের সম্মুখে বসাইলেন। সঙ্গিগণ আবু সুফিয়ানের পশ্চাতে উপবেশন করিল। কায়সর দোভাষীর মধ্যস্থতায় আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "আমি আবু সুফিয়ানকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; তিনি কোন প্রকার মিথ্যা উত্তর দিলে তোমরা প্রতিবাদ করিও।"

আবু সুফিয়ান বলেন, "আমার মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হওয়ার ভয় না হইলে এই সময় মিথ্যা বলিয়া কায়সরের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা উৎপন্ন করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। অবশ্য কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে হযরত (দঃ)-এর অবস্থা যথাসাধ্য বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু কায়সর তৎপ্রতি মোটেই লক্ষ্য করেন নাই।"

কায়সর ও আবু সুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর এইভাবে হইয়াছিল—

কায়সর—তোমাদের দেশে যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিতেছেন, তাঁহার বংশমর্যাদা কিরূপ?

আবু সুফিয়ান—তিনি বংশমর্যাদা হিসাবে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

কায়সর—তাঁহার বংশে কি পূর্বে আরও কেহ নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল?

আবু সুফিয়ান—কেহই না।

কায়সর—তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কি কখনও রাজত্ব ছিল?

আবু সুফিয়ান—না, তাঁহাদের বংশে কখনও রাজত্ব ছিল না।

কায়সর—কোন্ শ্রেণীর লোকেরা অধিক সংখ্যায় তাঁহার অনুগামী হইতেছে—ধনবান লোকেরা নাকি গরীব লোকেরা?

আবু সুফিয়ান—দুর্বল ও গরীব লোকেরাই বেশী সংখ্যায় তাঁহার তাবেদার হইতেছে।

কায়সর—অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; না হ্রাস পাইতেছে?

আবু সুফিয়ান—দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কায়সর—যাহারা তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করে, তাহারা কি উহাতে স্থায়ী থাকে; নাকি অপছন্দ হওয়ার দরুন তাহা পরিত্যাগ করে?

আবু সুফিয়ান—কেহই তাহা পরিত্যাগ করে না।

কায়সর—নবুওয়ত দাবীর পূর্বে তাঁহার কি মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল?

আবু সুফিয়ান—না।

কায়সর—তোমাদের সঙ্গে যে এই দলের যুদ্ধ হয়, তাহাতে কাহাদের জয়লাভ হয়?

www.nagorikpathagar.org

আবু সুফিয়ান—কখনও আমাদের হয়, কখন তাহাদেরও হয়।

কায়সর—তাহারা কি কখনও সন্ধি ভঙ্গ করে?

আবু সুফিয়ান—এ পর্যন্ত কখনও করে নাই; কিন্তু ইতিমধ্যে উভয় দলের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে; তাহারা ইহা রক্ষা করিবে কিনা বলিতে পারি না।

আবু সুফিয়ান বলেন, অন্য কোন প্রশ্নের উত্তরেই মিথ্যা বলার কোন সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু এস্থলে সুযোগ পাইয়া কথার একটু ফাঁক রাখিয়া দিয়াছিলাম।

প্রশ্নোত্তরের পর কায়সর দোভাষীর সহায়তায় কহিতে লাগিলেন,"প্রশ্নগুলির উত্তর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি সত্যই আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছ, তিনি বংশ-মর্যাদা হিসাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আল্লাহ্র রাসূলগণ উত্তম বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তোমরা বলিয়াছ, তাঁহার বংশে পূর্বে কেহই নবুওয়তের দাবী করে নাই; এরূপ হইলে বুঝিতাম, তিনি বংশগত কথার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। যদি তাঁহার বংশের পূর্বপুরুষদের রাজত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকিত, তবেও ভাবিতে পারিতাম যে, ধ্বংসীভূত রাজত্ব পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তোমরা বলিয়াছ, তিনি ঐহিক ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে কখনও মিথ্যাকথা বলেন নাই। তবে তিনি খোদার উপর কিরূপে মিথ্যা আরোপ করিতে পারেন? আল্লাহ্ তা'আলা যে তাঁহাকে রাসূলরূপে পাঠাইয়াছেন, একথা মিথ্যা হইলে কিরূপে তিনি তাহা বলিতেন? তোমরা বলিয়াছ যে, দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁহার তাবেদারী করিতেছে; চিরকালই গরীবগণ সর্বাগ্রে পয়গম্বরদের তাবেদার হইয়া থাকে। তোমাদের কথায় বুঝিলাম, তাঁহার ধর্ম দিন দিন উন্নত হইতেছে; এই ধর্ম গ্রহণ করার পর কেহই তাহা বর্জন করে না। ঈমানরূপ অমৃতের আস্বাদ যে একবার প্রাপ্ত হয়, কখনও সে তাহা ছাড়িতে পারে না। সত্যের অনুগামী দল ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া থাকে। তোমাদের কথায় প্রকাশ—তিনি এ যাবৎ সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। পয়গম্বর কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।" —বোখারী শরীফ দ্রষ্টব্য

এই কথোপকথন পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সত্য পয়গম্বর হওয়াতে কায়সরের মোটেই সন্দেহ ছিল না। নিম্নোক্ত ঘটনা পাঠে পাঠকগণ একথা আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবেন।

পয়গম্বরগণের প্রতিকৃতি ঃ

মোহাদ্দেসে দেহলবী (রঃ) মাদারেজুন্ নবুওয়ত কিতাবে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১) বায়হাকী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, দাহিয়া কালবীর হাতে পত্র পাওয়ার পর এক রাত্রে কায়সর পত্র বাহকদিগকে এক নিভৃত কক্ষে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে একটা বড় সিন্দুক আনা হইল। ইহার ভিতরে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ ছিল। কায়সর সিন্দুক খুলিয়া ইহার এক কুঠরী হইতে একটি কাল বর্ণের রেশমী রুমাল বাহির করিলেন। তাহাতে একটি মানুষের ছবি ছিল। কায়সর বলিলেন, ইহা কাহার ছবি, বলিতে পার কি? পত্রবাহকগণ কহিলেন, আমরা চিনিতে পারিলাম না। তখন কায়সর বলিতে লাগিলেন, ইহা আদি পিতা আদম (আঃ)-এর ছবি। অতঃপর অন্য কুঠরী হইতে আর এক কাল রেশমী রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে একটি ছবি দেখাইয়া বলিলেন, ইহা হযরত নূহ পয়গম্বরের ছবি। তৎপরে আর এক প্রকোষ্ঠ হইতে একটি ছবি বাহির করা হইল। বর্ণনাকারী বলেন, "আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, ইহা অবিকল হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রতিকৃতি ছিল। কায়সর জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছবি চিনিতে পারিয়াছ কি? আমরা বলিলাম,

www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছি, ইনিই আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)।" কায়সর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, ইনিই কি তোমাদের পয়গম্বর? আমরা বলিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন, এই ছবি দেখা আর হযরত (আঃ)-কে দেখা একই কথা। কায়সর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় উপবেশন করিলেন এবং কিছুক্ষণ ছবিটিকে ভালরূপে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই ইনি শেষ নবী। আমার নিকট আরও অনেকগুলি ছবি আছে; এখন সবগুলি খুলিয়া দেখাইতেছি।

অনন্তর কায়সর একটির পর একটি রুমাল খুলিয়া হযরত মূসা, হযরত ঈসা, হযরত সোলায়মান এবং অন্যান্য অনেক পয়গম্বরের ছবি দেখাইলেন। পত্রবাহকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সমস্ত ছবি কিরূপে আপনার হস্তগত হইল? কায়সর কহিলেন, হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধর পয়গম্বরগণের ছবি যেন তাঁহাকে দান করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট এই ছবিগুলি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত আদম (আঃ) ছবিগুলি স্বীয় বাসস্থানে রাখিয়া যান। যুলকারনাইন বাদশাহ্ স্বীয় ভ্রমণকালে এই সিন্দুক উদ্ধারকরত দানিয়ালকে দান করেন। আমার পূর্বপুরুষগণ সেখান হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক পাদরীর ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু বরণঃ

সে সময় রোমদেশে জাগাতের নামক এক প্রবীণ পাদরী ছিলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্মের অভিজ্ঞ বিদ্বান ছিলেন। কায়সর পত্রবাহক দাহিয়া কালবীকে কহিলেন, "তোমরা জাগাতেরের নিকট তোমাদের পয়গম্বরের অবস্থা বিবৃত কর। তিনি সমস্ত খৃষ্ট সমাজের মান্যমান গুরু। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে আর কাহারও আপত্তি করার অবকাশ থাকিবে না।"

পরামর্শ মত হযরত দাহিয়া (রাঃ) পাদরীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র শত বৎসরের বৃদ্ধ পাদরী শ্বেত বসনাবৃতাবস্থায় যষ্ঠি হস্তে বহির্গত হইলেন। গীর্জাগৃহে আরও অনেক শীর্ষ-স্থানীয় খৃষ্টান উপস্থিত ছিলেন; জাগাতের দাহিয়া কালবীসহ সেখানেই উপবেশন করিলেন। দাহিয়া কালবী স্বীয় বক্তব্য সমাপ্ত করিলে পর পাদরী বলিতে লাগিলেন, "হযরত ঈসা (আঃ) যেই পয়গম্বর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং যাহার সংবাদ অনেক ধর্ম পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, ইনিই সেই নবী। আমি পয়গম্বরে-আরবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম গ্রহণ করিলাম।"

ধর্মপরায়ণ পাদরীর এবংবিধ বাক্য শুনিয়া উগ্র প্রকৃতির খৃষ্ট যুবকগণ তাঁহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিল। তাঁহার দুর্বল দেহ এই অমানুষিক আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া বেহেশতে চলিয়া গেল। কায়সর এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া দাহিয়া কালবীকে কহিলেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহরূপে আমারও এই দশা ঘটিত।"

ঘটনাবলী পর্যালোচনায় বুঝা যায়, কায়সরের এই উক্তি মোটেই অমূলক ছিল না। তিনি চাক্ষুষ প্রমাণাদির বলে ইসলাম ধর্মের উপর পূর্ণ আস্থাবান হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজত্বের মায়া ও প্রাণের মমতা কাটাইতে না পারায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা প্রথমে বলিয়াছি যে, কেবল বিশ্বাস করাতেই 'ঈমান আনা' হয় না; বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণও করিতে হয়। এক কায়সরের কথাই বা বলি কেন, আরও এ রকম কত দুর্ভাগ্য পুরুষ মনের কোণে বিশ্বাসকে চাপাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কে জানে? পরবর্তী যুগে খৃষ্টান জগতে ইসলাম প্রচার ব্যাপারে যে এই পূর্বলব্ধ বিশ্বাস অনেকখানি সহায় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

হাবশী রাজ 'নাজ্জাশী'র নিকট পত্রঃ

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পত্র পৌঁছিতেই তিনি তাহা পাঠ করিয়া জা'ফর ইবনে আবু তালিবের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করিলেন। হযরত জা'ফর কতিপয় মুসলমানসহ পূর্ব

www.nagorikpathagar.org

হইতেই হাবশায় অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের হাবশায় গমনের ঘটনা পুস্তকের প্রথম অংশে বিবৃত হইয়াছে। তৎকালে হাবশায় প্রত্যেক বাদশাহের উপাধিই নাজ্জাশী ছিল। এই নাজ্জাশীর নাম ছিল আসহামা। তাঁহার রাজত্বকালেই মক্কার কতিপয় মুসলমান হযরত জা'ফরের সঙ্গে হাবশায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। আসহামার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গেসঙ্গে হাবশার খৃষ্টান বাসিন্দাগণও বিনা দ্বিধায় মুসলমান হইল। আসহামা তাঁহার পুত্রকে কতিপয় হাবশী গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ মদীনায় পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহারা পথিমধ্যে নদীতে ডুবিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

পারস্য রাজ 'কেসরার' নিকট পত্র ঃ

সেকালে রোমের কায়সর এবং পারস্যের কেসরা এই দুইজনই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। কায়সরের অবস্থা আমরা বর্ণনা করিয়াছি। কেসরার রাজত্ব অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। এমন কি আরব দেশেরও অধিকাংশ অঞ্চল কেসরার অধীন ছিল। ইয়ামন প্রভৃতি বড় বড় প্রদেশে কেসরার গভর্নর অবস্থান করিত।

ইবনে হোযায়ফা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পত্র লইয়া কেসরার নিকট গিয়াছিলেন। পত্রের এবারত ও মন্তব্য কায়সরের নামে লিখিত পত্রের অনুরূপই ছিল। আরব দেশের প্রথানুযায়ী পত্র প্রেরকের নাম উপরে এবং গ্রাহকের নাম নিম্নে লিখিত হইয়াছিল। কেসরা পত্র পাঠে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছিল এবং পত্রটি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল। হযরত রাসূলে মকবুল (দঃ) এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "পত্রের মত কেসরার রাজ্যও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে।"

এদিকে দুর্দান্ত পারস্যরাজ ইয়ামনের গভর্নর বাযানের নিকট লিখিল যে, আরবে যে লোকটি পয়গম্বরীর দাবী করিতেছে; তাহাকে অতি সত্বর আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। আদেশ মত বাযান দুইজন ভীমকায় ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠাইয়া দিল। তাহাদের সঙ্গে একটি পত্রও লিখিয়া দিল। পত্র বাহকদ্বয়ের নাম নাবুহ ও খরসরা ছিল। বাযান নাবুহের নিকট বলিয়া দিয়াছিল যে, মদীনায় গিয়া সে যেন পয়গম্বর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে ত্রুটি না করে। এই সংবাদে মক্কার কুরাইশগণেরও আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। কেসরার মত প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট মুসলমানগণকে নিপাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এখন আর তাহাদিগকে কে রক্ষা করিতে পারে? এবার কুরাইশগণের চিরশত্রু সমূলে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে; সুতরাং তাহাদের আনন্দ হইবারই কথা।

বাযানের প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় মদীনায় পৌঁছিয়া হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পত্র স্থাপনকরত মৌখিকও বলিল যে, "মহামান্য সম্রাটের আদেশক্রমে আমরা আপনাকে পারস্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আপনি স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে চলুন, তবে আমাদের সুবাদার (বাযান) সম্রাটের নিকট সুপারিশকরত আপনাকে মুক্ত করিয়া দিবেন। আর যদি আপনি স্বেচ্ছায় যাইতে সম্মত না হন, তবে আমরা বলপ্রয়োগে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইব। এরূপাবস্থায় সম্রাট আপনাকে এবং আপনার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন।" হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "তোমরা আজ অপেক্ষা কর, আগামী কল্য একথার উত্তর দিব।" পরদিন তাহারা উপস্থিত হইলে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যে, "কেসরাকে তাহার পুত্র শিরোয়য়া অদ্যরাত্রে বধকরত স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। অতিশীঘ্রই আমার ধর্ম ও রাজত্ব কেসরার রাজধানী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিবে।"

www.nagorikpathagar.org

বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়া এই অত্যাশ্চর্য কথার উপর বিশ্বাস করার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু পবিত্র মুখের বাণীতে এমনই অনির্বচনীয় প্রভাব ছিল যে, শ্রোতৃদ্বয় বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া পারিল না। তাহারা ইয়ামনে ফিরিয়া গিয়া হযরতের বাণী সুবাদার বাযানের নিকট যথাযথ ব্যক্ত করিল। বাযান শুনিয়া কহিলেন—

وَاللّٰهِ مَاهٰذَا كَلَامُ الْمَلِكِ وَاِنِّىْ لَاَرَاهُ نَبِيًّا ○

"আল্লাহ্‌র শপথ, তাঁহার কথাবার্তা রাজা-বাদশাহ্‌র কথাবার্তার মত নহে। আমি তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়াই মনে করি।" —তারিখুল কামেল ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৮১

বাযান আরও বলিলেন, "আমি কিছুদিন অপেক্ষা করিব। তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার ঈমান আনিতে আর কোনই আপত্তি থাকিবে না।"

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল, সত্যসত্যই সেই রাত্রে শিরোয়য়া তাহার পিতা কেসরা পারভেযকে নিহতকরত স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। নূতন সম্রাট বাযানকে স্বপদে বহাল রাখিয়া এক আদেশ পত্র পাঠাইয়াছে। পত্রে ইহাও লিখিয়া দিয়াছে যে, আরবে যে লোকটি নিজেকে নবী বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি যেন অত্যাচার করা না হয়। ইয়ামনপতি বাযান এই সংবাদ প্রাপ্তে গণ্যমান্য রাজপুরুষগণ সহ শুদ্ধ হৃদয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

(১) এই ঘটনার উপর অধিক টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক মনে করি। সুধী পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাযানের ইসলাম গ্রহণ এই দিক দিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি ইয়ামনের মত সমৃদ্ধিশালী প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ এক হিসাবে পারস্য সাম্রাজ্যে ইসলামের ভিত্তি স্থাপনরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। পারস্য সম্রাট হযরত (দঃ)-এর পত্রে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হইলেও বাযান ও তৎসঙ্গে রাজ পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ করায় হযরত (দঃ)-এর এই পত্র সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে একথা প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য নহে। আমরা কেবল একথার প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি যে, কি রকম সরল পদ্ধতির ভিতর দিয়া ইসলামের প্রাথমিক প্রচার লাভ হইয়াছিল। বাযানের মত প্রতাপশালী গভর্ণর মদীনার নগণ্য সংখ্যক মুসলমানের ভয়ে অথবা কোন প্রকার লালসার বশে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা বলিতে যাওয়া তো কোন রকমেই শোভনীয় হইতে পারে না; অধিকন্তু এরূপ বলা চলে, পারস্য রাজ্যের অধীনস্থ শাসনকর্তা হইয়া তাঁহার পক্ষে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ ভয়ানক বিপদসঙ্কুলই ছিল।

(২) ইসলাম প্রচার ব্যাপারে যত প্রকার বাহ্যিক উপলক্ষের প্রতিই আমরা দৃকপাত করি না কেন; তৎসঙ্গে যে অদৃশ্য জগতের এক শক্তিমান হস্ত পদে পদে এ বিষয়ে সহায় ছিল একথায় সন্দেহ মাত্র নাই। ভাবিয়া দেখুন, পারস্যরাজ যখন কুপিত হইয়া হযরত (দঃ)-কে গ্রেফতার করার আদেশ জারি করিয়াছিল, তখন হযরত (দঃ) তথা মুসলমানগণের আত্মরক্ষার কোন বাহ্যিক উপলক্ষই ছিল না। মক্কার লোকেরাও এই সংবাদে মুসলমানদের নিশ্চিত ধ্বংস ভাবিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু নূরনবী (দঃ) যেমন অটল ছিলেন, এই ভীতি সঙ্কুল সংবাদের পরও তেমনি অটল রহিলেন। আবার প্রাতে ধীরস্থির ও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিয়া দিলেন যে, কেসরা নিহত হইয়াছে, তাহার রাজত্বও ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপারের আভাস পাইলেই পাশ কাটিয়া পথ চলায় অভ্যস্ত, তাঁহারা এই ঘটনার কি রকম অর্থ করিবেন—বলিতে পারি না; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কেসরার নিহত হওয়ার ঘটনা একদিকে যেমন হযরত (দঃ)-এর অসাধারণ অলৌকিক শক্তি বা মো'জেযার মধ্যে গণ্য, অপর দিকে তেমনি ইসলাম প্রচারে অদৃশ্য জগতের সাহায্য বা তায়ীদে-গায়বীর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

(৩) কেসরা পারভেয হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র তাচ্ছিল্যের সহিত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, এই সংবাদ শ্রবণে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপে বদ দো'আ করিয়াছিলেন—

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ○

"আয় আল্লাহ্! তাহাদিগকে খণ্ড-বিখণ্ড কর।"

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দো'আ কবুল হইয়াছিল এবং সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই সহস্র বৎসরের পুরাতন ও শক্তিশালী রাজত্ব দুনিয়ার বুক হইতে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। রোমের কায়সর ইসলাম গ্রহণ না করিলেও হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল এবং পত্রটি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল। ফলে অধিকাংশ স্থান তাহার হস্তচ্যুত হইলেও তাহার বংশধরদের রাজত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় নাই।

বাহ্‌রাইনের শাসনকর্তার নিকট পত্র ঃ

বাহ্‌রাইন প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন মোনযের ইবনে সাবী। হযরত আলা ইব্‌নে হায্‌রমী (রাঃ) পত্র বাহকরূপে তাহার দরবারে গিয়াছিলেন। পত্র-প্রাপ্তে শাসনকর্তা স্বয়ং এবং অন্যান্য সকলে সানন্দে ইসলাম গ্রহণকরত ধন্য হইলেন। —তারিখুল কামেল

মিসর রাজ মুক্বাওক্বাসের নিকট পত্র ঃ

মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার রাজা মুক্বাওক্বাসের নিকটও পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি সসম্মানে পত্রটি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বহুমূল্যের উপঢৌকন প্রেরণকরত আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি বাঁদী ও একটি অশ্বতর বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বাঁদীদ্বয়ের মধ্যে মারিয়া কিব্‌তিয়াকে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদরে নবী তনয় হযরত ইবরাহীম (রাঃ)-এর জন্ম হইয়াছিল। অশ্বতরটির নাম ছিল 'দুল্‌দুল্'। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হযরত আলী (রাঃ)-কে দান করিয়াছিলেন। ইহাই হযরত আলীর প্রসিদ্ধ 'দুল্‌দুল্' ঘোড়া বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পারস্য কবি শায়খ সা'দী বলেন ঃ چهارم على شاه دلدل سوار

ফলকথা, মুকাওকাস হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রের প্রতি সম্মান দেখাইতে মোটেই ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তাহার ভাগ্য অপ্রসন্ন ছিল, এজন্য বুঝিতে পারিয়াও সে ইসলামরূপ অমূল্য ধন হইতে বিমুখ রহিল।

গাস্‌সান রাজ হারেসের নিকট পত্র ঃ

শামদেশের সীমান্তে গাস্‌সানীদের রাজত্ব ছিল। এই সময় হারেস ইবনে আবি শেমর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল। সে পত্র পাঠে অগ্নি শর্মা হইয়া কহিল, "আমি নিজেই যাইয়া মদীনা আক্রমণ করিব

www.nagorikpathagar.org

এবং মুসলমানগণকে ধ্বংস করিব।" হযরত (দঃ) এই খবর শুনিয়া বলিলেন. "তাহার রাজত্ব বিনষ্ট হইল।"

বুসরায় পত্র ও মূতা যুদ্ধঃ

হারেস ইবনে উমায়র (রাঃ) বুসরার হাকেমের নিকট পত্রসহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মূতা নামক স্থানে তথাকার শাসনকর্তা শরাহবিল গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া হারেসকে দরবারে হাযিরকরত প্রকৃত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিল। হারেসও সত্য কথা খুলিয়া বলিলেন। শরাহবিল ক্রোধান্ধ ও বিবেক রহিত হইয়া হারেস (রাঃ)-কে বধ করিল। ইতিপূর্বে হযরত (দঃ)-এর আর কোন কাসেদ নিহত হন নাই। কাসেদ বা পত্রবাহককে বধ করা রাজ-সমাজে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত হইলেন। শরাহবিল রোম সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিল। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ প্রকারান্তরে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এদিকে নিরপরাধ পত্রবাহক হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বিরত থাকাও নিতান্ত কাপুরুষতার পরিচায়ক। একথা সত্য যে, ইতিপূর্বেও মুসলমানগণ কয়েকবার জেহাদ-সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। দুই একবার জয়লাভও করিয়াছিলেন; কিন্তু এ রকম শিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত বাহ্যিক ক্ষমতা তাঁহাদের নিকট মোটেই ছিল না। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, জগতের সাধারণ ইতিহাস বাহ্যিক উপকরণ ও উপলক্ষের উপর যতখানি ন্যস্ত থাকে, পয়গম্বরের ঘটনাবলী ততখানি নহে।

হযরত নবী করীম (দঃ) তিন হাজার সৈন্যের একটি সংক্ষিপ্ত দল গঠনকরত প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শরাহবিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। যায়েদ ইবনে হারেসা দলপতি হইলেন। গমনকালে হযরত (দঃ) বলিয়া দিলেন, যায়েদ শহীদ হইলে জা'ফর ইবনে আবি তালিব পতাকা ধারণ করিবেন। তিনি শহীদ হইলে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। তিনিও শহীদ হইলে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাহারই হস্তে পতাকা অর্পণ করিবেন।

এই সময় জনৈক ইহুদী সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একথা শুনিয়া কহিল, 'ইনি যদি সত্য নবী হন, তবে উল্লিখিত তিনজন দলপতিই নিহত হইবেন। কারণ বনী ইসরায়ীলদের কোন পয়গম্বর যখন এভাবে বলিতেন, তখন সকলেই যুদ্ধে নিহত হইত।' অতঃপর ইহুদী হযরত যায়দ ইবনে হারেসাকে বলিল, 'আপনার কোন অন্তিম কথা থাকিলে বলিয়া যাইতে পারেন। কারণ, আপনি আর মদীনায় ফিরিয়া আসিবেন না।'

যাত্রাকালে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কিছুদূর পর্যন্ত সৈন্যদের সহযাত্রী হইলেন এবং তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। উপদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই কয়েকটি কথা ছিল—

'তোমরা খৃষ্টানদের গীর্জার মধ্যে কিছু লোক দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে বধ করিও না, শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও বধ করিও না।'

এই সৈন্যদল শামদেশের সীমান্তে পৌঁছিতেই জানিতে পারিল যে, রোম সম্রাট কায়সর মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য রাজধানী হইতে এক লক্ষ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত

www.nagorikpathagar.org

আরও এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। এত বড় সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হইবে, এ রকম ধারণা তাহাদের মোটেই ছিল না। এক দিকে তিন হাজার অপর পক্ষে দুই লক্ষ—সংখ্যার এই অভাবনীয় তফাৎ দেখিয়া অনেকের মনে মানবোচিত ভয়-বিহ্বলতার উদ্রেক হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিল, সম্প্রতি অগ্রগতি বন্ধ রাখিয়া মদীনায় খবর দেওয়া হউক। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দ্বিতীয় আদেশ আসিলে পরে বিবেচনা করিয়া যাহা হয় করা যাইবে। বীর শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা কহিলেন, "ভাইগণ! এখন আমাদের ঈমানের পরীক্ষার যথাযথ সময়। আমরা কখনও সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করিয়া যুদ্ধ করি না। আমরা তো ধর্মের জন্য যুদ্ধ করি। জয়লাভ হয়—ভাল, আর যদি মৃত্যু হয় তাহাও আমাদের পক্ষে মঙ্গল—পরকালের অনন্ত সুখ আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। সুতরাং ভীত ও শঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নাই।"

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ করাই সাব্যস্ত হইল। পূর্ব বন্দোবস্ত মত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) সৈন্যাধ্যক্ষরূপে পতাকা উত্তোলন করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং উভয় পক্ষের বীর দাপটে মূতা প্রান্তর কম্পিত হইয়া উঠিল।

শত্রুপক্ষের প্রথম লক্ষ্য হইল ইসলামী পতাকা। হযরত যায়েদ (রাঃ) প্রাণপণে পতাকা রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গবৎ অগণিত শত্রু সেনার আক্রমণে তিনি বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তিনি শত্রু হস্তে শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গেসঙ্গেই হযরত জা'ফর (রাঃ) পতাকা উত্তোলনকরত অগ্রগামী হইলেন। অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া কিছুক্ষণ পরে তিনিও যায়েদের অনুগমন করিলেন। এক্ষণে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর সময় আসিল। তিনিও অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় পূর্ণভাবে স্বীয় কর্তব্য সমাধাকরত ধরাশায়ী হইলেন।

এই সময় উভয় দলে ভয়ানক সংঘর্ষ চলিতেছিল। মুসলিম বাহিনী দলপতিবিহীন অবস্থায় পতিত হওয়ায় বিপক্ষের সীমাহীন সৈন্যশ্রেণীর ভিতরে নিজদিগকে হারাইয়া ফেলা অথবা ছত্রভঙ্গাবস্থায় পলায়মান হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এ রকম সময়েই সত্য ধর্মের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অকূল পাথারে নৌকা ডুবি হওয়ার আশঙ্কা হইলেই ইসলামের কোন নিদ্রিত ব্যাঘ্র জাগ্রত হইয়া থাকেন। এস্থলেও তাহাই হইল। একটি নিদ্রিত শের ব্যাঘ্র গাত্রোত্থানকরত স্বীয় অভূতপূর্ব ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্ব দ্বারা মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনাকে পঙ্গপালসম বিপক্ষ বাহিনীর কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

বীর কুল-তিলক খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) এই সৈন্য বাহিনীর মধ্যে ছিলেন। ইতিপূর্বে আর কখনও তিনি মুসলিম সৈন্যদলে সেনাপতিত্ব করেন নাই। এক্ষণে সকলের দৃষ্টি তাঁহারই প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) একথা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, অদ্যকার যুদ্ধের পট পরিবর্তন করা নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল আত্মরক্ষায় চেষ্টিত রহিলেন। মুসলিম সৈন্য যে রকম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল, তদবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করাকেও এক হিসাবে জয়লাভ বলিয়া ধরিতে হইবে। পরদিন সেনাপতি খালেদ নিজের সূক্ষ্মদর্শিতা দ্বারা ব্যূহ পরিবর্তনকরত সৈন্যগণকে নূতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। রোম সৈন্যগণ দেখিয়া ভাবিল, রাত্রে মুসলমানদের নিকট নূতন সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্ববর্তী কয়েক দিনের যুদ্ধে মুসলমানগণকে পরাজয়ের দ্বারদেশে পৌঁছাইলেও রোম সৈন্যগণও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে

www.nagorikpathagar.org

আবার নূতন সৈন্যের আমদানী ভাবিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সামান্য আক্রমণের পরই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পথ পাইল, ছুটিয়া পালাইল।

এদিকে মূতার মাঠে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেদিকে হযরত নবী করীম (দঃ) মদীনায় থাকিয়া শত শত মাইল দূরের ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত সাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, 'যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) শহীদ হইল, জা'ফর পতাকা গ্রহণ করিল, সে-ও শত্রু হস্তে শহীদ হইল, আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর হাতে পতাকা উঠিল, তাহারও শাহাদত হইল। এক্ষণে আল্লাহ্র অসিসমূহের মধ্যে এক অসি سيف من سيوف الله পতাকা গ্রহণ করিল, তাঁহার হাতেই মুসলমানগণের জয়লাভ হইল।' 'আল্লাহ্র অসি বা সাইফুল্লাহ' দ্বারা খালেদ ইবনে ওলীদকে বুঝান হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তাঁহার 'সাইফুল্লাহ্' উপাধি লাভ হয়।

যুদ্ধের অবস্থা আমরা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়াছি। কারণ, ইহার পূর্ণ বিবরণ লেখা ঐতিহাসিকদের অংশে থাকাই শ্রেয়ঃ। কারণ, বোখারী শরীফের দুইটি রেওয়ায়ত এস্থলে উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ এই যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থা কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন।

খালেদ ইবনে ওলীদ মূতা যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

اِنْقَطَعَتْ فِىْ يَدِىْ يَوْمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ اَسْيَافٍ فَمَا بَقِىَ فِىْ يَدِىْ اِلَّا صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ

'মূতা যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভগ্ন হইয়াছিল। একটি ইয়ামন দেশে নির্মিত তরবারি ব্যতীত আর কোন তরবারিই আমার হাতে ছিল না।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'যুদ্ধশেষে আমরা মৃত দেহগুলি অন্বেষণকরত দেখিতে পাইলাম, জা'ফরের দেহে নব্বইয়ের উপর বর্শা ও তরবারির আঘাত চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।'

তার এক রেওয়ায়তে আছে, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেনঃ

فَعَدَدْتُ خَمْسِيْنَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَّضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَىْءٌ فِىْ دُبُرِهٖ يَعْنِىْ ظَهْرِهٖ

'জা'ফরের মৃতদেহে বর্শা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাত গণনা করিলাম; তন্মধ্যে একটিও তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ছিল না।' —বোখারী (কিতাবুল-মাগাযী)

আমাদের মূল বক্তব্য—ইসলাম প্রচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ঘটনা হইতে যে কয়েকটি উপদেশ পাইতে পারি, তাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া এই আখ্যায়িকা সমাপ্ত করা কর্তব্যের পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করি।

(১) সর্বাগ্রে আমরা পাঠক মহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাহি যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় শ্রেষ্ঠ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জাবিহীন সামান্য তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন, সাধারণ রাজনীতির ভিত্তিতে আলোচনা করিতে গেলে ইহার যৌক্তিকতা উদ্ধার করা কঠিন। নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ বিবেক বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়। তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য হইতে হয় তিন হাজার সৈন্যকে দুই লক্ষের অর্থাৎ, প্রায় সত্তর গুণ বেশী সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে দেখিয়া। এই এক যুদ্ধের কথাই বলি কেন, ইসলামের উন্নতির যুগে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ সংখ্যায় কম ছিলেন। সেকালে মুসলমানগণ সংখ্যা ও সাজসজ্জার উপর নির্ভর করিতেন না। অবশ্য আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, ইসলামে সংখ্যা এবং বাহ্যিক সাজসজ্জার কোনই স্থান নাই। বাহ্যিক সাজসজ্জা ও উপলক্ষ গ্রহণ করিতে ইসলামই নির্দেশ দিতেছে। কিন্তু তৎসঙ্গে আমাদের একথাও দেখিতে হইবে যে, প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিতেন; বাহ্যিক উপলক্ষ গ্রহণেও যত্নবান হইতেন; কিন্তু এতদুভয়ের কোনটির উপরেই তাঁহাদের নির্ভরতা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা নিজেদের সংখ্যাল্পতা অথবা সজ্জাহীনতার কারণে কখনও উৎসাহহারা হইতেন না। তাঁহাদের প্রকৃত ভরসা ছিল, আল্লাহ্‌র মদদের উপর। বর্তমানকালে আমরা যখন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও সংখ্যা লঘিষ্ঠতার আলোচনা পাঠ করি, তখন আমাদের ভয় হয় যে, নির্ভরশীলতার প্রকৃত লক্ষ্যস্থল হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি হয়তো স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এরূপাবস্থায় আমরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়াও বিপক্ষের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিব না। আমরা অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—সেকালে আর একালে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে সংখ্যার উপরেই জয়-পরাজয় নির্ভর করে। বন্ধুদের এই কথার আর কি প্রতিবাদ করিব? সেকালে জয়-পরাজয় নির্ভর করিত তরবারির উপর, আর একালে নির্ভর করে গণভোটের উপর। গণভোটের ধার যে তরবারির ধার হইতে তীক্ষ্ণ, একথা আর কিরূপে অস্বীকার করা চলে? কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য হইলে সর্বাবস্থায়ই আমরা জয়যুক্ত হইতে পারি।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতে পূর্ব যুগে মুসলমানগণের অসাধারণ উন্নতি ও অভাবনীয় সাফল্যের মূলে দুইটি জিনিস ছিল। (১) তকদীরের প্রতি বিশ্বাস এবং (২) পরকালের প্রতি অনুরাগ। আশ্চর্যের বিষয়, অধুনা এই দুইটি জিনিসকেই অবনতির কারণ বলিয়া ব্যক্ত করা হয়। তকদীরের দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা, সাহসিকতা এবং ভয়হীনতা উৎপন্ন হয়। পরকালের প্রতি ভালবাসা দ্বারা দুনিয়ার মায়া কাটিয়া যায়, তৎসঙ্গে ধর্মপরায়ণতা ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কর্ম তৎপরতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মানুষ যখন একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করিতে শিখে যে, অদৃষ্ট লিপির বিরুদ্ধে কোন কিছুই সংঘটিত হইতে পারে না, তখন আর তাহাকে ভয় ও অমূলক সন্দেহ স্পর্শ করিতে পারে না। মুসলিম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরপুরুষগণের অভাবনীয় সাহস ও বীরত্বের মূলে এই বিশ্বাসই কার্যকরী ছিল। দুঃখের বিষয়, আজ আমরা তকদীরবাদকে কর্মহীনতার সমার্থবোধক মনে করিয়া ইসলামের এই স্তম্ভটির ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছি।

পরকালের প্রতি ভালবাসা উন্নতির উপকরণ। মানুষের মনে যখন ইহজগতের প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, তখন তাহার দ্বারা নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠান আশা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে আখেরাতের প্রতি পূর্ণ অনুরাগ থাকিলে মানুষ অকাতরে ধন, জন ও প্রাণ দিয়া সেবা করিতে শিখে। মুসলমান যোদ্ধাগণ প্রত্যেকেই এমন আকাঙ্ক্ষা করিত যে, আমার প্রাণ ধর্মের জন্য সর্বাগ্রে উৎসর্গীকৃত করিয়া পরকালের পথ সুগম করি; আর বিপক্ষের লোকেরা প্রত্যেকেই চাহিত যে, অন্যের দ্বারা কর্মোদ্ধার হউক, আর আমি বাঁচিয়া থাকিয়া ইহার ফল ভোগ করি। উভয় পক্ষের এই উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণেই এক পক্ষের জয় এবং অপর পক্ষের পরাজয় ঘটিত। আবার যে সময় হইতে মুসলমানদের তকদীরবাদ ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার মায়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন হইতেই তাহাদের প্রকৃত বীরত্ব বিদায় লাভ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের উন্নতিও অবনতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। যে পর্যন্ত আবার তাহারা পূর্ব পথে ফিরিয়া না যাইবে, সে পর্যন্ত তাহাদের উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

আসুন, আর একবার আমরা মূতা প্রান্তরের সমর দৃশ্য অবলোকন করি। ঐ দেখুন, রোম সৈন্য প্রান্তময় ছাইয়া রহিয়াছে। তেজিয়ান অশ্বের দাপটে রণোন্মত্ত যোদ্ধৃবৃন্দের হুঙ্কারে দামামার

www.nagorikpathagar.org

গগণভেদী শব্দে ধরা-পৃষ্ঠ মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিত হইতেছে। নবীন তপনের কিরণ সৈন্যদের লৌহবর্ম ও লৌহ শিরস্ত্রাণে পতিত হইয়া সারা মাঠে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। আর ঐ এক প্রান্তে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্য, শত শত মাইল দূরের মুসাফের তাহারা। নিকটে নাই কোন আশ্রয় স্থান, নাই যুদ্ধোপযোগী সাজ-সরঞ্জাম এবং খাদ্য সম্বল। এরূপাবস্থায় তাঁহাদের পরামর্শ সভা বসিয়াছে। কেহ কেহ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া মদীনায় খবর দিতে পরামর্শ দিতেছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা গাত্রোত্থানকরত বলিলেন, "ভাইগণ! আমরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করি —দুনিয়ার জন্য নহে। জয় হয় ভাল; আর যদি মৃত্যু হয় তাহাও পরকালের জন্য মঙ্গলজনক।" একথা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; কিন্তু বাঁচিবার জন্য নহে, মরিবার জন্য। পরিণাম যাহা হইল তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় মুসলমানদের ক্ষতি হইলেও পরিণামে তিন হাজার পরকালকামী ফকিরের জয় হইল; আর ইহকালাকাঙ্ক্ষী দুই লক্ষ ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

(২) সৈন্যদল মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত নবী করীম (দঃ) ফরমাইয়াছিলেনঃ 'যায়েদ ইবনে হারেসা সেনাধ্যক্ষ হইবে। তাঁহার মৃত্যু হইলে জা'ফর এবং তৎপরে আবদুল্লাহ্ স্থলাভিষিক্ত হইবেন। তাঁহারও মৃত্যু হইলে মুসলমানগণ অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দলপতি করিবেন।' কার্যতঃও তাহাই ঘটিয়াছিল। উল্লিখিত তিনজনই মূতার যুদ্ধে পরপর শহীদ হইয়াছিলেন। উপস্থিত ইহুদী সে সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, নবীর মুখে এ রকম বাক্য উচ্চারিত হওয়ার ভিতরে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হইবেন। বলাবাহুল্য, ইহা নূরনবী (দঃ)-এর মো'জেযার মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত শত শত মাইল দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রের খবর হযরত (দঃ) মদীনায় বসিয়া উপস্থিত সহচরবৃন্দের নিকট বলিতেছিলেন—যেন স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বলিতেছেন। অধুনাসুলভ জড়বাদী মানব সমাজ এই মো'জেযার তাৎপর্য বুঝিতে না পারে না পারুক, কিন্তু তাহা ঐতিহাসিক সত্য। শেষোক্ত ঘটনা সহীহ্ বোখারী শরীফের মত অভ্রান্ত হাদীস গ্রন্থেও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

বক্ষ্যমান আলোচনায় কিন্তু মো'জেযার পর্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া ইহুদী পণ্ডিত বলিয়াছিল, 'ইনি [হযরত (দঃ)] যদি নবী হন, তবে আপনি আর মদীনায় ফিরিয়া আসিবেন না।' হযরত (দঃ)-এর নবুওয়তে ইহুদীর কোন সন্দেহ থাকিলেও যায়েদের ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং এক হিসাবে মৃত্যু অনিবার্য করিয়াই তিনি যুদ্ধগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে সামান্য মাত্র ভীতি বিহ্বলতাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মযুদ্ধে মৃত্যু হওয়াতে পরকালের অফুরন্ত নেয়ামত লাভ হয়। আরও বিশ্বাস ছিল, অদৃষ্টলিপি কিছুতেই খণ্ডন হয় না। কাপুরুষতায়ও আয়ু বৃদ্ধি পায় না; আর বীরত্বেও আয়ু ক্ষয় হয় না। সুতরাং মৃত্যু ভয় তাঁহাকে কিরূপে পশ্চাৎপদ করিতে পারে? সেকালে প্রত্যেক মুসলমানের মনোবলই এ রকম অদম্য ছিল। অতএব, তাঁহাদের অগ্রগতিতে বাধা দান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারিত?

(৩) অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে বলে, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে জেহাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমাংশে আমরা যুক্তি-তর্ক দ্বারা একথা খণ্ডন করিয়াছি। এক্ষণে আবার তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করি। মূতা যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলী পাঠ করিলে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ কখনও সংঘটিত হয় নাই।

www.nagorikpathagar.org

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিরপরাধ দূত মৃতায় অন্যায়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন; দূত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যুদ্ধ যাত্রাকালে নবী করীম (দঃ) উপদেশ দিয়াছিলেন, 'গীর্জার ধর্মযাজকগণকে বধ করিও না, শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, রুগ্নকেও হত্যা করিও না।' ইহা কি বলপূর্বক ধর্মান্তর করণের লক্ষণ? যদি তাহাই হইত, তবে গীর্জার লোকেরা অব্যাহতি পাইবে কেন? বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক এবং রুগ্নকেই বা রেহাই দেওয়া হইবে কেন? ফলকথা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই একথা বুঝিতে পারেন যে, জেহাদের দ্বারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা কখনও উদ্দেশ্য নহে।

■

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহান বিজয় পর্ব

তিন বন্ধুর ইসলাম গ্রহণঃ

মূতার যুদ্ধ হিজরী ৮ম সনে সংঘটিত হইয়াছিল; তৎপূর্ব বৎসর হযরত খালেদ ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত খালেদ ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের ইসলাম গ্রহণ সাধারণ ব্যাপার নহে। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসিলে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেনঃ 'মক্কা তাঁহার কলিজাকে মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছে।'

খালেদ ইবনে ওলীদ অনন্য সাধারণ বীর পুরুষ ছিলেন। পারস্য ও সিরিয়া বিজয়ে তিনি যে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, সে সমস্ত সত্য কাহিনী আজ উপন্যাসের চমকপ্রদ গল্পের মতই বোধ হয়। কুরাইশদের সঙ্গে মুসলমানদের যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছিল তৎসমুদয়ের মধ্যেও তিনি কুরাইশদের পক্ষে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আমর ইবনে আসও সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। উত্তরকালে তিনি মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় আমরকে সেনানায়করূপে যুদ্ধে পাঠাইতেন। আমর ইবনে আসের বুদ্ধিমত্তা এবং সৎসাহসের পরিচয় ইহাতেই পাওয়া যায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণোদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলে 'বায়আত' করার (দীক্ষা দানের) উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) হাত বাড়াইলেন; কিন্তু আমর নিজের হাত সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমর, এ রকম করিলে কেন?' আমর কহিলেন, "হুযূর! আমি 'বায়আত' হওয়ার পূর্বে একটি শর্ত করিতে চাহি।" হযরত (দঃ) ফরমাইলেনঃ 'কি শর্ত করিতে চাহ, খুলিয়া বল।' আমর বলিলেন, 'আমার বিগত কালের সমস্ত গোনাহ যেন মাফ করা হয়।' হযরত (দঃ) তখন বলিলেনঃ ইসলাম গ্রহণ করিলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। হিজরত দ্বারাও বিগত কালের পাপ মোচন হয়। আর হজ্জ সমাধা করিলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়। —মেশকাত, কিতাবুল ঈমান

ওসমান ইবনে তালহা কা'বা শরীফের শ্রেষ্ঠ খাদেম ছিলেন। তাঁহারই নিকট কা'বা শরীফের চাবি থাকিত। অন্ধকার যুগেও ইহা অতি সম্মানিত পদ বলিয়া গণ্য ছিল। ইনিও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

এক্ষণে অনুমান করা কঠিন নহে যে, এক সঙ্গে এই তিনজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির স্বেচ্ছায় মক্কা ত্যাগকরত মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। হযরত খালেদ স্বীয় ইসলাম গ্রহণ ব্যাপার নিজে যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহাই এস্থলে অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করিতেছি। খালেদ ইবনে ওলীদ বলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"আমার ইসলাম গ্রহণ যখন আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত হইল, তখন সততই আমার মনে বিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইল। ভাবিলাম, আমি হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ)-এর বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় যুদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু যখনই কোন যুদ্ধ সমাপ্তকরত প্রত্যাবর্তন করিয়াছি, তখনই আমার মনে অত্যন্ত অনুশোচনার উদয় হইয়াছে এবং আমার অন্তরের অন্তস্থল হইতে কেহ যেন বলিয়া দিয়াছে যে, 'খালেদ! তুমি খোদাদত্ত শক্তি সামর্থ্য, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তাকে নিতান্ত অনুপযুক্ত স্থানে ব্যয় করিতেছ।' এইভাবে ক্রমশঃ আমার হৃদয়ে ইসলামের মমত্ব ও মহত্ব বোধ প্রবেশ করিল; তৎসঙ্গে শির্ক ও বুত পরস্তির প্রতি বিতৃষ্ণা ভাব জাগিয়া উঠিল।

আমার ভাই ওলীদ ইতিপূর্বে মুসলমান হইয়াছিল। আমার মনের এই ভাবান্তরের সময় ওলীদের লিখিত একটি পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল—

'ভাই খালেদ! ইহা হইতে আশ্চর্যজনক আর কিছুই দেখিতেছি না যে, আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইসলামের মত সর্বাঙ্গ সুন্দর জিনিস হইতে বিমুখ রহিয়াছেন। হযরত রাসূলে খোদা (দঃ) আমার নিকট আপনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'খালেদ এ রকম মানুষ নহে যে, ইসলামের আলো হইতে দূরে থাকিতে পারে। নিশ্চয়ই সে অতিসত্বর ইসলাম গ্রহণপূর্বক সৌভাগ্য অর্জন করিবে। সে যদি নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় ব্যয়িত করে, তবে তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।'

হযরত খালেদ বলেন, 'আমার মনে তো ইতিপূর্বেই ইসলামের প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হইয়াছিল। এক্ষণে এই পত্র পাঠে মনের মধ্যে যে গ্লানি, লজ্জা ও সঙ্কোচ ছিল তাহাও বিদূরিত হইয়া গেল। ইসলাম গ্রহণের প্রতি মনে দৃঢ় সঙ্কল্প দেখা দিল। এমন সময় একদিন এক স্বপ্ন দেখিলাম, আমি যেন এক অন্ধকার সংকীর্ণ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া এক শস্য-শ্যামল প্রদীপ্ত ও সুবিস্তৃত জনাকীর্ণ স্থানে পৌঁছিয়াছি। এই স্বপ্নের পর আমার মন অত্যন্ত অধৈর্য হইয়া উঠিল। আমি সত্য সত্যই পূতিগন্ধযুক্ত অন্ধকার স্থান পরিত্যাগকরত আলোকের সন্ধানে বহির্গত হইলাম।' পথে সাফওয়ানের সঙ্গে দেখা হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, 'ভাই, তুমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছ, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব ও আজমে সর্বত্রই প্রাবল্য লাভ করিতেছেন। আমরা শত্রুতা বর্জনকরত তাঁহার তাবেদার হইলে ভাল হইত।' সাফওয়ান ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিতে লাগিল' 'ভাই খালেদ! সমস্ত দুনিয়ার মানুষ যদি মুসলমান হইয়া যায়, আর আমি যদি একা থাকি, তবুও মুসলমান হওয়ার কল্পনা করিব না।' আমি মনে মনে ভাবিলাম, তাহার বাপ এবং ভাই বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হইয়াছে; এখনও তাহার মনে প্রতিশোধ কামনা ও জাতক্রোধ পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। তৎপরে আবু জাহলের পুত্র ইকরিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকটেও মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু সে-ও সাফওয়ানের মতই উত্তর দিল। অতঃপর তালহার পুত্র ওসমানের সঙ্গে দেখা হইল। একবার ভাবিলাম, তাহার নিকট বলি। আবার ভাবিলাম, ওসমানের পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য বংশধর মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে; তাহার নিকট প্রকাশ করায় কোনই ফল হইবে না। যাহা হউক, ইতস্ততের পর মনের কথা প্রকাশ করিলাম। সাফওয়ান এবং ইকরিমা যে উত্তর দিয়াছিল তাহাও খুলিয়া বলিলাম। কিন্তু ওসমান তৎক্ষণাৎ আমার কথা গ্রহণ করিল। তৎপরে উভয়ের মধ্যে পরামর্শ হইল যে, প্রাতঃকালে উভয়ে এক স্থানে মিলিত হইয়া মদীনা যাত্রা করিব। যেমন কথা তেমনি কাজ; —আমরা নির্দিষ্ট সময়ে একত্রে মদীনা যাত্রা করিলাম।

www.nagorikpathagar.org

পথিমধ্যে আমর ইবনে আসের সঙ্গে দেখা। আমর আমাদিগকে দেখিয়া কহিল, 'ভাই আবু সুলায়মান! (খালেদের ডাক নাম) সকাল সকাল কোথায় চলিয়াছ?' আমি খোলাখুলিভাবে বলিলাম, 'ভাই আমর! তোমার নিকট লুকোচুরি করিয়া কি লাভ হইবে? মুহাম্মদ (দঃ) যে পয়গম্বর একথায় আর কোনই সন্দেহ নাই; সুতরাং আর বৃথা হঠকারিতায় কি ফল হইবে? আমরা মুসলমান হইতে মদীনায় চলিয়াছি।' আমর বলিল, 'ভাই আমিও এই ইচ্ছায়ই বাহির হইয়াছি।' তখন আমরা তিন বন্ধু এক সঙ্গে পথতিক্রমকরত মদীনায় উপস্থিত হইলাম।

হযরত নবী করীম (দঃ) আমাদের আগমন বার্তা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। আমরা স্নানকরত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া হযরত (দঃ)-এর খেদমতে হাযির হইতে চলিয়াছি। পথে আমার ভাই ওলীদের সঙ্গে দেখা হইল। ওলীদ কহিল, 'আপনাদের জন্য হযরত (দঃ) অপেক্ষা করিতেছেন।' আমরা তৎক্ষণাৎ খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। আমি সালাম করিতেই প্রফুল্ল বদনে সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন। আমরা সকলে কলেমা শাহাদত পাঠকরত মুসলমান হইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলাকে ধন্যবাদ যে, তিনি তোমাকে সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আমি তোমার মধ্যে সুলক্ষণ দৃষ্টে একথার উপর আস্থাবান ছিলাম যে, তুমি নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করিবে।'

আমি অনুরোধ করিলাম, 'হযরত! আমি আপনার বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করিয়াছি। এই পাপ হইতে আমার মুক্তির জন্য খোদার দরবারে দো'আ করুন।' নবী করীম (দঃ) বলিলেনঃ 'ইসলাম পূর্বকৃত সমস্ত গোনাহ নির্মূল করিয়া দেয়। অতএব, এ বিষয়ে তোমার অনুশোচনা অনাবশ্যক।' আমার পরে আমরও ইসলাম গ্রহণ করিল।" —তারিখুল কামেল, এশাআতে ইসলাম

একথা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, পূর্ব হইতেই খালেদের ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আশান্বিত ছিলেন। হযরত খালেদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের কি রকম অভাবনীয় উন্নতি সাধন হইবে, একথাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একথাও ধ্রুব সত্য যে, ইসলামের নিজস্ব সৌন্দর্য এবং হযরত রাসূল মকবূলের আত্মিক আকর্ষণ ছাড়া অন্য কোন জিনিসই খালেদের মত অর্ধ পৃথিবী বিজেতা মহান পুরুষের বীর হৃদয়কে পৈতৃক ধর্ম বর্জনে প্রস্তুত করিতে পারিত না। যাহারা ইসলাম প্রচারের মূলে তরবারির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এস্থলে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন—সন্দেহ নাই।

হযরত খালেদ মুসলমান হওয়ার পরেই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাহাকে এ রকম ক্ষমতা ও মর্যাদায় ভূষিত করিলেন, যাহা তিনি মক্কায় ভোগ করিতেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় খালেদের পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হইল। অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর পরিচালনার ভার খালেদের হাতেই অর্পণ করা হইয়াছিল।

আমর ইবনে আসও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের মুসলমান হওয়ার পর হইতে যুদ্ধ সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে আমার এবং খালেদের পরামর্শকেই অগ্রগণ্য করা হইত।'

আমরা হযরত ওমর ফারূকের ইসলাম গ্রহণ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে হাদীস পাঠ করিয়াছিলাম, এখন উহার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হয়—

خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقُهُوْا فِى الدِّيْنِ ○

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ, অন্ধকার যুগে যাহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, ধর্মজ্ঞান লাভের পর ইসলামেও তাহাদের আসন উপরেই স্থাপিত হইয়া থাকে। —মেশকাত শরীফ, কিতাবুল এল্‌ম

মক্কা বিজয় ও ক্ষমার ঘোষণা ঃ

মুসলমানদের কা'বা ও আল্লাহ্‌র ঘর মক্কা শরীফে অবস্থিত। এজন্য মক্কা শরীফ ইসলাম জগতের কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য। ইসলামের পূর্বে অংশীবাদীদের জন্যও কা'বা শরীফ এবং মক্কা তীর্থস্থান ছিল। মক্কার কুরাইশ বংশের এক শ্রেষ্ঠ গৃহে যেমন ইসলামের বাতি জ্বলিতেছিল, তেমনি কুরাইশ বংশের লোকেরাই ইসলামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রুতা প্রদর্শন করিয়াছিল। মুসলমানগণ কুরাইশদের হাতে যে রকম কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, এ রকম আর কাহারও হাতে করিতে হয় নাই। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, মক্কা বিজয় মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের বিষয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের দ্বারাই মক্কার কাফেরদের শক্তি চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সমগ্র আরব দেশে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের প্রচার ও সংস্রব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমানগণ মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার কারণে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবসর পান নাই। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা অনেকে ইসলামের সত্যতা বুঝিতে পারা সত্ত্বেও মুসলমান এবং কুরাইশদের জয়-পরাজয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। মক্কা বিজয় এবং মক্কাবাসিগণ ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর আরবময় ইসলাম গ্রহণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম প্রচার যেমন কষ্টকর ছিল, পরে আর তেমন ছিল না। এজন্যই মক্কা জয় হওয়ার পূর্বে যাহারা ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ইসলাম প্রচারে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা যেমন সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন, পরে আর তদ্রূপ সওয়াব পাওয়া যাইবে না। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ

'তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে এবং যাহারা পরে খরচ ও চেষ্টা করিতেছে, এই উভয় সম্প্রদায় সমান নহে; বরং পূর্বে ব্যয়কারিগণ পদমর্যাদা হিসাবে পরে ব্যয়কারিগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' —সূরা-হাদীদ

আদিকাল হইতে মক্কা শরীফ 'হরম' বা রক্ষিত শহর বলিয়া গণ্য ছিল। মক্কার ভিতরে লড়াই করা এবং মক্কার বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল। জগতের রাজা-বাদশাহের মধ্যেও কেহ কোন সময় মক্কার উপর আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। বহু পূর্বকাল হইতে আরব দেশ লড়াই-ঝগড়া খুন-খারাবী ও লুঠ-তরাজ ব্যাপারে কুখ্যাত ছিল, কিন্তু এ রকম যুদ্ধপরায়ণ জাতিও কোন সময় মক্কার ভিতরে যুদ্ধবিগ্রহ করিত না। পথিক আরবেরা সমস্ত পথ-ঘাট এবং অলি-গলিতে নিজের প্রাণ ও অর্থকে বিপন্ন মনে করিত, কিন্তু মক্কার ভিতর প্রবেশ করিতেই নিজকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিত। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় সারা বৎসর পরস্পর লড়াই-বিবাদে লিপ্ত থাকিত, কিন্তু হজ্জের সময় মক্কায় আসিয়া কিছুকালের জন্য ভাই ভাই রূপে মিলিত হইত।

www.nagorikpathagar.org

আমরা পুস্তকের প্রথমাংশে লিখিয়াছি যে, খৃষ্টীয় বহু শতাব্দী পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) মক্কার কা'বা গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তফসীরের রেওয়ায়তে জানা যায়, ইহারও বহু পূর্বে ফেরেশতাগণ কর্তৃক কা'বা শরীফ নির্মিত হইয়াছিল। কালের করাল গ্রাসে তাহা কয়েকবার ভগ্ন ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সহযোগিতায় কা'বা গৃহ নির্মাণ করার সময় দো'আ করিয়াছিলেন, 'আয় আল্লাহ্! এই স্থানটি আবাদ করিয়া দাও, আমি এই ঘাটি তোমার এবাদতের জন্য নির্মাণ করিতেছি। আমার বংশধরের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিও, যাহারা এই পবিত্র গৃহে তোমার নামায সমাধা করিবে, তোমার উদ্দেশ্যে হজ্জ করিবে।'

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরেরা বহু কালাবধি কা'বা গৃহে এক আল্লাহ্র এবাদত করিতেন, কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম ক্রমশঃ বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়া পড়ে। তওহীদের স্থলে শিরক—এক আল্লাহ্র এবাদতের জায়গায় নানাবিধ দেব-দেবীর অর্চনা আরম্ভ হয়। কা'বা শরীফ একটা বুত খানায় পরিণত হয়। বহু শতাব্দী পরে আবার হযরত ইবরাহীমের এক কীর্তিমান বংশধর পিতামহের নির্মিত কা'বাগৃহ মূর্তিপূজকদের হাত হইতে উদ্ধারকরত চিরতরে পবিত্র করিয়া দেন। সেই কীর্তিমান পুরুষ হইয়াছেন, আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজ্তবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমরা প্রথমে বলিয়াছি, রাজা-বাদশাহ্গণ মক্কা আক্রমণ করিতে সাহস করিত না। অবশ্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব যখন মক্কার সরদার ছিলেন, তখন একবার হাবশার বাদশাহের প্রতিনিধি ইয়ামনের শাসনকর্তা আবরাহা মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিল। কা'বাগৃহ ধ্বংস করার নিমিত্ত সৈন্যদল ও বহু হস্তী সঙ্গে আনিয়াছিল। মক্কাবাসিগণ কা'বাগৃহের প্রতি অসাধারণ ভক্তি পোষণ করিলেও আবরাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। আবরাহা মক্কা হইতে কিছু দূরে অবতরণকরত মক্কাবাসীদের নিকট এক কাসেদ (দূত) প্রেরণ করিল। কাসেদ আবরাহার আগমন ঘোষণাকরত একথা জানাইয়া দিল যে, আমরা কেবল কা'বাগৃহ ধ্বংস করিতে আসিয়াছি; কাহারও জান-মালের কোন ক্ষতি করা আমাদের ইচ্ছা নহে। কিন্তু যাইবার সময় মাঠ হইতে মক্কাবাসীদের একপাল উট ও একপাল ছাগল লইয়া যাইতেও ত্রুটি করিল না। তন্মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উষ্ট্র ছিল।

এই সংবাদে মক্কাবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। সকলে আসিয়া দলপতি আবদুল মুত্তালিবের নিকট অভিযোগ জানাইল। পরামর্শের পর আবদুল মুত্তালিব স্বয়ং আবরাহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আবদুল মুত্তালিব আরবের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী লোক ছিলেন; দেখিতেও সুশ্রী এবং সম্ভ্রান্ত আকৃতির ছিলেন। আবরাহা তাঁহাকে দেখিয়া সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ফরাশের উপর উপবেশন করাইল ও তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আবদুল মুত্তালিব বলিলেনঃ 'আপনার দূত অন্যায়ভাবে আমাদের পশু লইয়া আসিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক।' একথা শুনিয়া আবরাহা কহিলঃ 'আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতেছি—আপনার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কোন লক্ষণই নাই। আপনি নগণ্য পশুর জন্য আমার নিকট অনুরোধ করিতেছেন, অথচ যেই কা'বা আপনাদের কেবলা ও দেবালয় উহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছেন না।' আবদুল মুত্তালিব তদুত্তরে বলিলেনঃ

أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ

অর্থাৎ, আমি উটের মালিক, এজন্যই আমি উট সম্পর্কে কথা বলিতেছি। কা'বার মালিক হইয়াছেন আল্লাহ্; তিনিই উহা রক্ষা করিবেন। —তারিখুল কামেল

আবরাহা অহঙ্কারের সহিত কহিল ঃ 'কেহই আমার হাত হইতে কা'বাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।' অতঃপর পশুগুলি ফিরাইয়া দিতে আদেশ প্রদান করিল। আবদুল মুত্তালিব ফিরিয়া আসিয়া কুরাইশগণের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং মক্কার সমস্ত লোক লইয়া পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। গমনকালে কা'বা শরীফের চৌকাঠ ধরিয়া আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনাস্বরূপ এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

يَا رَبِّ لَاأَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا   يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا

'হে প্রভু! তাহাদের সহিত মোকাবিলা করার জন্য তোমা ভিন্ন আর কাহারও উপর ভরসা রাখি না। হে প্রভু! তাহাদের অত্যাচার হইতে তোমার রক্ষিত স্থানকে রক্ষা কর।'

اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا   اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُّخَرِّبُوْا فِنَاكَ

'নিশ্চয়ই, কা'বা শরীফের শত্রু তোমারও শত্রু। তোমার গৃহ বিনষ্ট করিতে তাহাদিগকে বাধা দান কর।'

আবরাহা ভাবিয়াছিল, মক্কার লোকেরা নিশ্চয়ই বাধা দিবে এবং তাহাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে। এক্ষণে সে প্রান্তর জনমানব শূন্য দেখিয়া সানন্দে মক্কায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তাহার সঙ্গে যে সমস্ত হস্তী আনিয়াছিল, তন্মধ্যে বড় হাতীটির নাম ছিল মাহমুদ। মাহমুদ মক্কা শহরের দরজায় পৌঁছিয়াই বসিয়া পড়িল। বহু চেষ্টায়ও আর তাহাকে উঠাইতে পারা গেল না। এমন সময় সাগরের দিক হইতে এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখী উড়িয়া আসিল। প্রত্যেক পাখীর দুই পায়ে দুইটি, ঠোঁটে একটি, এই তিনটি করিয়া কঙ্কর ছিল। পক্ষিগণ আবরাহার সৈন্যের উপর সেগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এক সামান্য মসুরিকাবৎ প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে আবরাহার যাবতীয় সৈন্য নিধনপ্রাপ্ত হইল। আবরাহার উপরও প্রস্তর খণ্ড পতিত হইল। ইহাতে তাহার দেহ পচিয়া মাংস খসিয়া পড়িতে লাগিল। এরূপাবস্থায়ই তাহাকে তাহার রাজধানী 'সানআ' শহরে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। খোদা তা'আলা নিজের ঘরকে যে অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা করিলেন, উহার তাৎপর্য উদঘাটন করা মানব বুদ্ধির অসাধ্য।

আবরাহা ও তাহার সৈন্যবাহিনী পক্ষী কর্তৃক প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নিহত হওয়ার কথা কোরআন পাকের সূরা-ফীলে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। দুনিয়ায় এ রকম কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে আল্লাহ্ পাকের অসীম ক্ষমতার নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং আল্লাহ্র কালামে স্পষ্ট বর্ণিত ঘটনার কদর্য অর্থ করার শ্রম করিতে যাওয়া বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নহে। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। হযরত (দঃ)-এর সময় এই ঘটনার চর্চা লোকমুখে প্রচলিত ছিল। হয়তো এ রকমও অনেক লোক থাকিবে যাহারা এই ঘটনা সচক্ষে দেখিয়াছিল। অতএব, হযরত (দঃ)-এর সহচরবৃন্দ সূরায়ে ফীলের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করত তের শত বৎসর পরের কোন নূতন গবেষণা বনাম বিকৃতার্থ গ্রহণ করিতে যাওয়া কিরূপে শোভনীয় হইতে পারে? আমাদের এই কয়েক পঙক্তি এজন্য লিখিত হইল যে, অধুনা কতিপয় নব্যপন্থী লেখক 'আসহাবে ফীলের' ঘটনাকে অলৌকিকতার সীমা হইতে বহিষ্কৃতকরত লৌকিকতার সীমারেখার ভিতরে রাখার উদ্দেশ্যে অনেকখানি শক্তি ব্যয় করিয়াছেন।

www.nagorikpathagar.org

এস্থলে অধিক দূর তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসাময়িক বলিয়া মনে করি।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য একটি বিশেষ কথা এই যে, আবদুল মুত্তালিব আবরাহার প্রশ্নের উত্তরে যে বলিয়াছেন, কা'বার মালিকই কা'বা রক্ষা করিবেন; আরও তিনি কা'বার দরজায় যে দো'আ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—তাহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখিতেন। আরবের প্রতিমা পূজকদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং ধর্ম-বিশ্বাসের সূত্র আলোচনা করিলে একথা আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠে যে, আল্লাহর অস্তিত্বে ও ক্ষমতায় তাহাদের কোনই সন্দেহ ছিল না। তাহারা একথাও স্বীকার করিত যে, আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা—

وَلَئِنْ سَئَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ○

'যদি তাহাদিগকে (মুশ্‌রিকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যে, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করিয়াছে?' নিশ্চয়ই, তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ (সৃষ্টি করিয়াছেন)।' —কোরআন

তাহারা দেবতা ও প্রতিমাদিগকে 'খালেক মালেক' অথবা সর্বশক্তিমান বলিয়া মোটেই বিশ্বাস করিত না। তাহারা কেবল দেবতাদের অস্থায়ী ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখিত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রকাশ স্থান বলিয়া বিশ্বাসকরত তাহাদের প্রতি সীমাতিরিক্ত সম্মান উপাসনা আরাধনায় লিপ্ত হইত। এই কারণেই তাহারা মুশ্‌রিকরূপে গণ্য হইয়াছে। সৃষ্ট জীবের প্রতি সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের পরিণামেই 'শিরক' উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শিরকের মূলোৎপাটনই ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আরববাসীদের অন্তরে কা'বা শরীফের প্রতি পূর্ব হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে ভক্তি বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে আবরাহা নিপাতের অলৌকিক ব্যাপারে তাহাদের ভক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। আমরা বলিয়াছি, মক্কা শরীফের ভিতরে সৈন্য চালনা ধর্মতঃ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ধর্মীয় আবশ্যকবশতঃ অল্প সময়ের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এ সম্পর্কে হযরত (দঃ) নিজেই বলিয়াছেনঃ

اِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ مِّنْ قَبْلِىْ وَلَا بَعْدِىْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ○

'মক্কায় যুদ্ধ করা আমার পূর্বে কাহারও জন্য বৈধ ছিল না। পরেও কাহারও জন্য বৈধ হইবে না। কেবল আমার জন্য দিনের সামান্য অংশে তাহা বৈধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।'

—বোখারী শরীফ

বুঝা গেল, মক্কা বিজয়ের সময় হযরত (দঃ)-এর জন্য মক্কার ভিতরে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি একথায় দৃঢ় সংকল্প ছিলেন, যাহাতে যথাসম্ভব পবিত্র স্থানে নরহত্যা হইতে না পারে এবং মক্কাবাসিগণকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট উপায় করিয়া দেওয়া হয়। এখন আমরা মক্কা বিজয়ের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিব, তাহাতেই অনায়াসে একথা বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইসলামের যুদ্ধাভিযান অশান্তি সৃষ্টির জন্যও নহে; পশুচিত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যও নহে। তাহা ছিল ভাবী শান্তি ও শৃঙ্খলা বহাল করার উদ্দেশ্যে।

আমরা হোদায়বিয়ার ঘটনায় বর্ণনা করিয়াছি যে, কুরাইশগণের সঙ্গে মুসলমানদের দশ বৎসরের জন্য সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। এ সন্ধির পরে মুসলমানগণ এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহা সন্ধির বিপরীত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু কুরাইশগণই সন্ধি পত্রের শর্ত ভঙ্গ ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

অগ্রণী হইয়াছিল। এই কারণে হযরত (দঃ) একথা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, মক্কাবাসীদের গর্ব পূর্ণভাবে খর্ব না করা পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি বহাল হইতে পারিবে না। সত্য ধর্মের অবাধ প্রচারও সম্ভবপর হইবে না। এই কারণেই তিনি মক্কা জয় করার সংকল্প করিলেন। হযরত (দঃ) দো'আ করিলেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা ও অভিযান মক্কার লোকেরা জানিতে না পারে। হযরত (দঃ) সসৈন্যে মক্কার সন্নিকটে না পৌঁছা পর্যন্ত মক্কাবাসীরা ইহার খবর ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি—এই দো'আর উদ্দেশ্যও ইহাই ছিল যে, কুরাইশগণ মুসলমান-দের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পূর্বাহ্নে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইত এবং ফলে উভয় পক্ষে বহু প্রাণ বিনষ্ট হইত। আল্লাহ্র মূর্তিমান রহ্মত হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ) নরহত্যা হইতে যথাসাধ্য বিরত থাকাকেই পছন্দ করিতেন। ফলকথা, হযরত নবী করীম (দঃ) দশ সহস্র সৈন্যসহ রওয়ানা হইলেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সপরিবারে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হযরত (দঃ) কহিলেন, 'আপনি মোহাজেরগণের মধ্যে সর্বশেষ মোহাজের; আর আমি নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।' অতঃপর হযরত আব্বাসের আসবাবপত্র মদীনায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তিনি মুজাহেদ দলের সঙ্গে মক্কা চলিলেন।

হারেস-পুত্র আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণঃ

হযরত (দঃ)-এর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইসলামের শত্রুদের অন্যতম ছিলেন। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর মিথ্যা কুৎসা রটনা করা তাঁহার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে গণ্য ছিল। আবু সুফিয়ানের সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়াও ছিলেন। আবদুল্লাহ্ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খালাত ভাই ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, পুত্র এবং আরও কয়েকজন লোক তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাঁহারা হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে হযরত (দঃ) তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। হযরত (দঃ)-এর স্ত্রী উম্মে-সালামা এ বিষয়ে সুপারিশ করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। আবু সুফিয়ান একথা শুনিয়া কহিতে লাগিল, 'হযরত (দঃ) যদি অধীনকে দরবারে হাযির হইতে অনুমতি না দেন, তবে আমি স্ত্রী-পুত্র লইয়া জঙ্গলে চলিয়া যাইব। পরে হয় কোন হিংস্র জন্তু আমাদিগকে বধ করিবে; আর না হয় অমনি অনাহারে প্রাণ হারাইব।' একথা শুনিয়া রহমতুল্লিল আলামীন আর কিরূপে রহমতের দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন? উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হইল। অনন্তর তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। মুহূর্তে তাঁহাদের অতীত সমস্ত পাপরাশি বিধৌত হইয়া গেল।

আবু সুফিয়ানের অতীত ইতিহাস নিতান্ত কালিমাময় ছিল। পূর্ব ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া ইসলামের কলেমা পাঠের পরেও তিনি লজ্জা বশতঃ মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি নত মস্তকেই হযরত (দঃ) সমীপে এই কবিতা নিবেদন করিলেনঃ

لَعَمْرُكَ اِنِّىْ يَوْمَ اَحْمِلُ رَايَةً ‌ لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدٍ

'তোমার প্রাণের শপথ, যেদিন আমি 'লাতের' সৈন্য মুহাম্মদের সৈন্যের উপর জয়যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়া পতাকা উত্তোলন করিতাম।'

www.nagorikpathagar.org

لَكَالْمُدْلَجِ الْحَيْرَانِ اَظْلَمَ لَيْلُهُ   فَهٰذَا اَوَانِىْ حِيْنَ اُهْدِىَ وَاَهْتَدِىْ

'সেদিন আমার অবস্থা এ রকম লোকের মত ছিল, যে ব্যক্তি অন্ধকার অমানিশায় লক্ষ্যহীন-ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। অনন্তর এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, আমাকে সুপথ প্রদর্শন করা হইতেছে এবং আমিও সুপথে চলিতেছি।'

হরব-পুত্র আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণঃ

উপরে যে আবু সুফিয়ানের ঘটনা বর্ণিত হইল, তিনি হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই ছিলেন। এক্ষণে আমরা আর এক আবু সুফিয়ানের ঘটনা বর্ণনা করিব, ইনি হরবের পুত্র এবং হযরত মুআবিয়ার পিতা ছিলেন। আবু জহলের মৃত্যুর পর ইনিই কুরাইশ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সরদার ছিলেন। মুসলমানদের প্রতি তাঁহার যে রকম শত্রুতা ছিল ইতিহাস পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন। মুসলমানদের সঙ্গে কুরাইশগণ যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই আবু সুফিয়ান কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের আংশিক পরাজয় হইয়াছিল, তখন ইনিই উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেনঃ

اعل هبل 'হে হোবল! তুমি উন্নত হও।' তৎপরে আর একবার পনর, ষোল হাজার সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণকরত অনেক দিন অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময় মুসলমানগণ তিন পার্শ্বে পরিখা খননপূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাই খন্দকের যুদ্ধ নামে খ্যাত। খন্দক অর্থ পরিখা। এ রকম ভয়ানক শত্রুকে হাতে পাইলে কেহই প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়ে না। কিন্তু আবু সুফিয়ান যেমন সহজে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইসলামের ইতিহাস ছাড়া অন্যত্র তাহার নজির পাওয়া দুষ্কর।

হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমানদের সৈন্যবল ও যুদ্ধ-সজ্জা দেখিয়া ভাবিলেন, যদি কুরাইশগণ যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তবে তাহাদের একটি প্রাণীও বাঁচিতে পারিবে না। কোন প্রকারে তাহারা যদি সন্ধি স্থাপন করিতে পারে তবেই রক্ষা। দেখি, 'কোন উপায়ে মক্কাবাসীদের নিকট খবর পৌঁছানো যায় কিনা।' এই ভাবিয়া আব্বাস (রাঃ) শিবির হইতে বাহির হইয়া চলিলেন। কিছুদূর যাইতেই কিছু লোকের কথোপকথন শব্দ শুনিতে পাইলেন। তন্মধ্যে আবু সুফিয়ানকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে গুপ্ত সন্ধান লইতে বাহির হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের আগমন সংবাদ ইতিপূর্বে মক্কায় প্রচারিত হয় নাই। ইতিপূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ হওয়ায় কুরাইশগণ সর্বদা শঙ্কিত থাকিত এবং রাত্রিতে প্রহরী নিযুক্ত করা হইত। দশ হাজার (মতান্তরে বার হাজার) মুসলিম সৈন্যের পাশাপাশি দশটি শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালের প্রথানুযায়ী প্রত্যেক শিবিরের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গিগণ প্রান্তরময় অগ্নি দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থে এইদিকে আসিয়াছিলেন। আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাসের সম্মুখীন হইতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। আব্বাস (রাঃ) যে মুসলমান হইয়াছেন, একথা আবু সুফিয়ান এখনও জানিতে পারেন নাই। আবু সুফিয়ান আব্বাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আবুল ফযল[১]! প্রান্তরময় আগুন ও তৎপশ্চাতে শিবিররাজি দেখা যাইতেছে, শত সহস্র অশ্বের হ্রেসারব

টীকা

১ আবুল ফযল—ফযলের বাপ। আব্বাসের ছেলের নাম ফযল ছিল।

www.nagorikpathagar.org

শুনা যাইতেছে—ব্যাপার কি?' হযরত আব্বাস (রাঃ) কহিলেন, 'তুমি অধঃপাতে যাও, এখনও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দশ সহস্র সৈন্যসহ তোমার দর্প চূর্ণ করিতে আসিয়াছেন।' সংবাদ শুনিয়া আবু সুফিয়ানের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, 'এক্ষণে উপায় কি? কিরূপে হযরত (দঃ)-এর কোপানল হইতে রক্ষা পাইতে পারি?' আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, 'তোমার কোন ভয় নাই। হযরত দয়ার সাগর, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক, তুমি আমার অশ্বে আরোহণ কর; আমি তোমাকে হযরত (দঃ)-এর নিকট পৌঁছাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিব।' আবু সুফিয়ান দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া আব্বাস (রাঃ)-এর সহযাত্রী হইলেন।

মুসলিম সৈন্যের প্রহরিগণ শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রহরীদলের পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা কিছুদূর যাইতেই হযরত ওমর (রাঃ) যমের মত সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আবু সুফিয়ানকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এতদিন পরে পরম শত্রুকে আয়ত্তে পাইয়া তাঁহার আনন্দ হইবারই কথা। তিনি ক্রোধে অসি কোষমুক্ত করত আবু সুফিয়ানকে বধ করিবার অনুমতি লইতে হযরত (দঃ)-এর নিকট চলিলেন। আব্বাস (রাঃ) তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দ্রুত অশ্ব চালনাকরত ওমরের পূর্বেই হযরত সমীপে উপস্থিত হইয়া আবু সুফিয়ানের জন্য 'আমন' (প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি) চাহিলেন। এদিকে ওমর (রাঃ)-ও নিষ্কোষিত অসি হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হুযূর! আল্লাহ্‌র কৃপায় দুর্দান্ত আবু সুফিয়ান 'আমন' ব্যতীত আমাদের হাতে পড়িয়াছে; অনুমতি পাইলেই তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিতে পারি।' হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) অদ্যকার মত তাঁহাকে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট আবদ্ধ রাখার হুকুম দিয়া সকলকে বিদায় দিলেন। পরদিন আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে হাজির করিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, 'আবু সুফিয়ান! এখনও কি তোমার বুতপরস্তি পরিত্যাগকরত এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনের সময় হয় নাই?' আবু সুফিয়ান বলিতে লাগিলেনঃ

بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ مَااَحْلَمَكَ وَاَكْرَمَكَ وَاَوْصَلَكَ لَقَدْ ظَنَنْتُ اَنْ لَّوْ كَانَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا غَيْرَهٗ لَقَدْ اَغْنٰى شَيْئًا بَعْدُ ○

"আপনার উপর আমার পিতা ও মাতা উৎসর্গীকৃত হউক! আপনার সহিষ্ণুতা, দয়া ও আত্মীয়োচিত ব্যবহারের তুলনা নাই। আমি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য দেবতা থাকিলে নিশ্চয় এই সময় আমার উপকারে আসিত।"

—তারিখে ইবনে-কাইয়িম, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪২২

অতঃপর আবু সুফিয়ান ইসলামের কলেমা পাঠকরত সত্য ধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্মের সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই কলেমা পাঠ করিয়াছিলেন, একথায় কোনই সন্দেহ নাই। প্রথম দিন অবশ্য তাঁহার মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা যদি কেবল শত্রু নিপাত ও রাজ্য জয় করাই উদ্দেশ্য হইত, তবে সে সময় হযরত নবী করীম (দঃ) ওমরের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত করিলেই মুহূর্তে কার্য সিদ্ধি হইতে পারিত। যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গেসঙ্গে ইসলাম প্রচারের একটি স্বতন্ত্র ধারা সর্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা ইসলামী জেহাদকে সাধারণ যুদ্ধবিগ্রহের মত পাঠ করেন, তাঁহাদের হয়তো

www.nagorikpathagar.org

এদিকে দৃকপাত করার অবসর হয় না। কিন্তু একথা নিছক সত্য যে, ইসলাম প্রচারে ধারাল তরবারির কাঠিন্য মোটেই নাই, তাহাতে আছে কেবল—কোমলতা, দয়া এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ। উদ্ধৃত ঘটনায়ই চিন্তাশক্তি পরিচালনা করুন। আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারে কাহারও দৃষ্টিপথে ওমর ফারূকের রক্তচক্ষু ও শানিত কৃপাণের চাকচিক্য ভাসিয়া উঠিতে পারে; কিন্তু ধীর হৃদয়ে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, ওমরের তরবারি যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, রহমতুল্লিল আলামীনের কোমল স্বরে মধুর বাণী তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এক রাতের জন্য অবসর পাইয়া আবু সুফিয়ান তাহার আজন্ম পূজিত ইষ্ট দেবতাকে কায়মনোবাক্যে ডাকিয়া সাহায্য চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সাহায্য করিল না। প্রস্তর মূর্তিতে সাহায্য করার ক্ষমতাই বা থাকিবে কিরূপে? এই সমস্ত ভাবনায় আবু সুফিয়ানের হৃদয়ে তুফান চলিতেছিল। এদিকে আবার হযরত ওমরের ভয়াবহ আকৃতি থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরাত্মাকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। একটি মাত্র রাত্র—ইহার অবসান হইতেই তাঁহার কোন্ দশা হইবে, কে জানে? ফলকথা, নির্জীব অপদার্থ পাথর প্রতিমাগুলির প্রতি সততই তাঁহার মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণ ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পরদিন যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সৌম্যমূর্তি তাঁহার সম্মুখে আসিল, পবিত্র মুখের পবিত্র বাণী—একেশ্বরবাদের নির্মল ও অভ্রান্ত কথা তাঁহার কানে পড়িল, তখন তাঁহার অন্ধকার হৃদয়ে সত্যসত্যই তওহীদের অত্যুজ্জ্বল বর্তিকা জ্বলিয়া উঠিল—তিনি অকূল পাথারে কূল পাইলেন।

চিকিৎসক রোগারোগ্যের পরও চিকিৎসিত ব্যক্তিকে কিছুকাল বিবিধ নিয়ম পালনে বাধ্য করেন এবং হিতকর উপদেশ দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহার শারীরিক শক্তি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয় না থাকে। পয়গম্বরগণও মানবজাতির আত্মার চিকিৎসক। আত্মার প্রধান রোগ হইল—আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া এবং তজ্জনিত গায়রুল্লাহ্‌র এবাদতে মনোনিবেশ করা। এতদ্ব্যতীত—অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা, বিলাস-ব্যসন ইত্যাদি বহুবিধ রোগ মানবাত্মায় আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের ভিতরে আত্মার যাবতীয় রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

হযরত নবী করীম (দঃ) দেখিলেন, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করিলেও তাঁহার অন্তরে আভিজাত্য, অহংকার এবং বহুকাল সঞ্চিত জাতক্রোধ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মার চিকিৎসক হযরত নবী করীম (দঃ) আবু সুফিয়ানের প্রতি ইসলাম গ্রহণের পরে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষ্য করিলে সমগ্র পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি প্রত্যেক কাজেই সহচরবৃন্দের তথা মানবজাতির আত্মার সংশোধন করিতে যত্নবান ছিলেন।

আবু সুফিয়ান ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর হযরত রাসূল মকবূল (দঃ) ঘোষণা করিলেনঃ

'মক্কাবাসীদের মধ্যে যাহারা আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় লইবে তাহাদের প্রাণ নিরাপদ। এতদ্ব্যতীত যাহারা হাতিয়ার রাখিয়া দিবে, যাহারা নিজ নিজ গৃহদ্বার বন্ধ রাখিবে, যাহারা হরম শরীফে প্রবেশ করিবে, যাহারা হাকিম ইবনে হেযামের গৃহে প্রবেশ করিবে, যাহারা আবু রোয়ায়হার পতাকাতলে আসিবে, তাহাদের প্রাণও নিরাপদ।'

কথিত আছে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত (দঃ)-এর মক্কায় অবস্থান কালে একদিন তিনি শত্রুপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত ও নির্যাতিত হইতেছিলেন, এমন সময় আবু সুফিয়ান তাঁহাকে

www.nagorikpathagar.org

নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এক্ষণে হযরত (দঃ) উক্ত ঘোষণা দ্বারা সেই উপকারের প্রতিদান করিলেন। তৎসঙ্গে ইহা দ্বারা নিম্নোক্ত উপকারও হইল—আবু সুফিয়ান মক্কার সরদার ছিলেন। তাঁহার অন্তর আভিজাত্য ও আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ ছিল। ইসলাম গ্রহণের সঙ্গেসঙ্গে তাঁহার সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণরূপে বিদূরীত হইতে গেলে তাঁহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইত; অধীনস্থ মক্কাবাসীদের নিকটও তাঁহাকে লজ্জানুভব করিতে হইত; সুতরাং তাঁহার গৃহে আশ্রয় প্রার্থীদের নিরাপত্তামূলক ঘোষণা দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু যাহাতে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখিয়া তাঁহার মনে অহঙ্কার না জন্মে, এই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকজনের প্রতিও এই সম্মানজনক ঘোষণা করা হইয়াছিল।

হযরত নবী করীম (দঃ) একথাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আবু সুফিয়ানের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি বহুকালের সঞ্চিত জাতক্রোধ ও তাচ্ছিল্যভাব এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাতে মুসলমানদের শৌর্য ও ঐশ্বর্য দৃষ্টে তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এজন্য হযরত আব্বাসের প্রতি আদেশ হইল যে, এখনই যেন তাঁহাকে মক্কায় যাইতে দেওয়া না হয়; মুসলিম সৈন্যের মক্কা যাত্রাকালে যেন তাঁহাকে এক স্থানে রাখিয়া সৈন্যদের অবস্থা অবলোকন করার সুযোগ দেওয়া হয়। হযরত আব্বাস (রাঃ) আদেশমত সৈন্যদের গমন পথের এক স্থানে আবু সুফিয়ানকে খাড়া করিয়া দিলেন।

সর্বপ্রথম খালেদ তাঁহার অধীনস্থ সহস্র সৈন্যসহ আত্মপ্রকাশ করিলেন। আবু সুফিয়ানের সম্মুখীন হইতেই খালেদ এবং তৎসঙ্গে সমস্ত সৈন্য তিনবার তকবীর ধ্বনি করিলেন। আবু সুফিয়ানের বোধ হইল যেন তকবীর শব্দে সপ্ততল কম্পিত হইয়া উঠিল। আব্বাস (রাঃ) কহিলেন, ইনি মুসলিম সৈন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক 'সাইফুল্লাহ' খালেদ ইবনে ওলীদ। তাহার পতাকাতলে বনী সোলায়ম সম্প্রদায়ের এক হাজার সৈন্য রহিয়াছে। খালেদের পরে যোবায়র ইবনে আওয়াম পাঁচ শত সৈন্যসহ তকবীর ধ্বনি করিতে করিতে কাল বর্ণের পতাকাসহ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। আব্বাস (রাঃ) তাঁহারও পরিচয় বলিলেন। তৎপর বনী গেফার গোত্রের সহস্র সৈন্য আবু যর গেফারীর অধিনায়কত্বে কাল পতাকা উড়াইয়া তকবীর ধ্বনিসহ অগ্রগামী হইল। অতঃপর ক্রমশঃ বনী কা'ব, বনী মোজায়না এবং বনী যোহায়না সম্প্রদায় বিজয় গর্বে 'না'রায়ে তকবীর' সহ মক্কার দিকে ধাবিত হইল। হযরত আব্বাস (রাঃ) একে একে সকলেরই পরিচয় বলিলেন। তৎপশ্চাতে বনী আশজা' বংশের তিন শত যোদ্ধা বীর দর্পে সম্মুখীন হইলে আব্বাস (রাঃ) তাহাদেরও পরিচয় দান করিলেন। আবু সুফিয়ান বনী আশজা'র নাম শ্রবণে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেনঃ

বনী আশজা' তো মুসলমানদের ভয়ানক শত্রু; তাহারা আবার কিরূপে মুসলমান হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, 'অবশ্যই তাহারা শত্রু ছিল; কিন্তু ইসলামের সত্যতা ও স্বাদ অনুভূত হওয়ার পর আর কাহারও মনে শত্রুতা থাকিতে পারে না।' সর্বশেষে নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পাঁচশত মোহাজের ও আনসার সৈন্য বেষ্টিত হইয়া 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রপৃষ্ঠে তকবীর ধ্বনির ভিতরে প্রকাশিত হইলেন—দক্ষিণে আবু বকর সিদ্দীক, বামে উসাইদ ইবনে হুযাইর। হযরত (দঃ) তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে বলিতে চলিয়াছেন। আবু সুফিয়ান ইতিপূর্বে ইসলামী সৈন্যের এমন ঐশ্বর্য দেখা তো দূরের কথা ধারণাও করিতে পারেন নাই। এক্ষণে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া ভীত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ কম্পিত ও

www.nagorikpathagar.org

কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মুখ ফুটিয়া কহিতে লাগিলেন, ভাই আব্বাস! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজত্ব দেখিতেছি সত্যসত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আব্বাস (রাঃ) তদুত্তরে কহিলেনঃ

يَا اَبَا سُفْيَانَ اِنَّهَا النُّبُوَّةُ

'আবু সুফিয়ান! ইহা রাজত্ব নহে, নবুওয়ত।' আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করার সময় সা'দ ইবনে ওবাদা নামক মুসলিম সেনানায়ক নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিতেছিলেন,

اَلْيَوْمُ يَوْمُ مُلْحِمَةٍ اَلْيَوْمَ تَسْتَحِلُّ الْحُرْمَةُ

'অদ্য যুদ্ধের দিন, অদ্য নিষিদ্ধ স্থানে (হরম শরীফে) যুদ্ধ করাও সিদ্ধ হইবে।'

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সা'দের এই উক্তি শুনিয়া বলিলেন, সা'দ মিথ্যা বলিতেছেঃ

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ

'অদ্য দয়া ও ক্ষমার দিন।'

অতঃপর সা'দের হাত হইতে পতাকা লইয়া হযরত আলীর হাতে দেওয়া হইল।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণ যেন শান্ত ও অহিংসভাবে মক্কায় প্রবেশ করে—কাহারও উপর যেন আক্রমণ না করে। অবশ্য বিপক্ষের কেহ আক্রমণ করিলে তাহার উপর প্রত্যাক্রমণ করা চলিবে। সুতরাং মুসলমানগণ এক প্রকার বিনা রক্তপাতে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। অবশ্য যেই দিক দিয়া খালেদ ইবনে ওলীদ প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই দিকে আবু জহল-পুত্র ইকরিমা কতিপয় যোদ্ধাসহ বাধা প্রদান করায় সামান্য সংঘর্ষ ও উভয় পক্ষে কয়েকজন হতাহত হইয়াছিল।

মুসলিম সৈন্য মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আত্মরক্ষার এমন ব্যাপক ও সহজ উপায়সমূহ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে কাহারও কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। কেহ অসাবধানতা অথবা অজানা অবস্থায় মুসলিম সৈন্যদের দৃষ্টি পথে পতিত হইলেও নিজের হাতিয়ার ফেলিয়া দিলেই তাহার প্রাণ নিরাপদ হইতে পারে। এরূপাবস্থায় এমন কোন্ নির্বোধ থাকিবে, যাহার প্রাণনাশের আশঙ্কা হইবে?

মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সর্বশেষে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রবেশের সময় আসিল। বহুবিধ নির্যাতন নিপীড়নের পর আজ তিনি বিজয়ী বেশে মাতৃভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন। যেখান হইতে একদিন নিরাশ্রয়ভাবে বাহির হইয়াছিলেন, আজ তিনি সেখানে সর্বেসর্বা। এমনও হইতে পারিত যে, তিনি এই অভাবনীয় সফলতার সময় উৎফুল্ল ও উল্লাসিত হইতেন, আল্লাহ্র অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ চেহারা মোবারকে প্রফুল্লতা প্রকাশ পাইত, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া বিনয় ও নম্রতা তাঁহার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিল। বিজয় গর্বে মস্তক উন্নত হওয়ার পরিবর্তে অস্বাভাবিকরূপে নত হইয়া পড়িল।

নূরনবী (দঃ) মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু তৎসঙ্গে পবিত্র মুখে বারংবার উচ্চারিত হইতেছিল—

اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

'আয় আল্লাহ্! পরকালের সুখ-শান্তিই প্রকৃত শান্তি।'

www.nagorikpathagar.org

মক্কাবাসিগণকে সাধারণভাবে ক্ষমা করা হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্য হইতে এগারজন পুরুষ এবং ছয়জন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই যেন বধ করা হয়। পুরুষদের মধ্যে আবু জহ্লের পুত্র ইকরিমা, উমাইয়ার পুত্র সাফওয়ান এবং ওয়াহ্শীও ছিলেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে হেন্দা বিন্তে ওতবার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই লোকগুলির অপরাধ নিতান্ত জঘন্য ও অমার্জনীয় ছিল, কিন্তু পরিণামে ইহাদের অধিকাংশ ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এস্থলে আমরা দুই একজনের ঘটনা মাত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ইকরিমা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণঃ

ইকরিমা (রাঃ) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও নির্যাতন ব্যাপারে তাঁহার পিতা আবু জহলের পর সকলের অগ্রণী ছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়কালেও একমাত্র তিনিই বাধা প্রদানে সাহসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হাতে এই সময় একজন মুসলমান শহীদ হইয়াছিলেন। হযরত (দঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি মৃদু হাস্য করিলেন। উপস্থিত লোকেরা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি দেখিতে পাইলাম, ঘাতক ও নিহত উভয়ে একসংগে হাত ধরাধরি করিয়া বেহেশতে যাইতেছে।'

আর একবারের ঘটনা—হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখিলেন, কেহ তাঁহার হাতে একটা বেহেশতী আঙ্গুর ফলের খোসা দিয়া বলিল, ইহা আবু জহ্লের পক্ষ হইতে আপনাকে দেওয়া হইতেছে। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বপ্নের তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারেন নাই। আবু জহল-পুত্র ইকরিমা মুসলমান হওয়াতেই এই স্বপ্নের ফল প্রকাশ পাইয়াছিল। —মাদারেজ

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা শুনিয়া ইকরিমা মক্কা ত্যাগকরত ইয়ামন গমনের উদ্দেশ্যে নৌকারোহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় ভয়াবহ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আরোহিগণ আল্লাহ্র নাম জপ করিতে লাগিল। সকলে ইকরিমাকেও আল্লাহ্র নাম লইতে বলিল। ইকরিমা বলিলেন, 'তবে কি আমাকে এখন মুহাম্মদের প্রভু আল্লাহ্র নামই লইতে হইবে?' ইকরিমা মুখে একথা বলিলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাহ্য জগতের তুফানের সঙ্গে তাঁহার অন্তর রাজ্যেও তুফান চলিতেছিল। আল্লাহ্ ছাড়া যে আশ্রয়স্থল নাই, একথার প্রতি বিশ্বাস তাঁহার অন্তস্থল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? এক্ষণে আর তিনি কিরূপে আল্লাহ্র পথে ফিরিয়া আসিতে পারেন? তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, সুতরাং তিনি অকূল পাথারে কূল পাইলেন।

ইকরিমার স্ত্রী উম্মে-হাকিম ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হযরত (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামীর জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। হযরত (দঃ)-ও তাহার আরয কবুল করিলেন। ইকরিমা জাহাজে থাকিতেই তাঁহার স্ত্রী আসিয়া সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ইকরিমা আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিলেন, 'আমার ন্যায় জঘন্যতম অপরাধীও কি ক্ষমা পাইতে পারে?' উম্মে-হাকিম তদুত্তরে বলিলেনঃ

جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ اَحْلَمِ النَّاسِ وَاَوْصَلِهِمْ وَاَكْرَمِهِمْ ○

'আমি এমন লোকের নিকট হইতে আসিয়াছি, যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল, আত্মীয়োচিত ব্যবহারকারী এবং দয়াবান।' —তারিখ ইবনুল আসির

অনন্তর ইকরিমা নির্ভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ ঃ

এই ব্যক্তিও হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিশোধের ভয়ে পলায়নকরত জিদ্দায় পৌঁছিলেন এবং অন্যত্র গমনের উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ওমায়র সুপারিশকরত তাঁহার জন্য 'আমান' (নিরাপত্তা) লইলেন। আমানের নিদর্শনস্বরূপ মক্কা প্রবেশের সময় হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথায় যে পাগড়ি ছিল, তাহা ওমায়রের নিকট দেওয়া হইল।

সাফওয়ান নিরাপত্তার সংবাদ শুনিয়া এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার পাগড়ি দেখিয়া অতীব চমৎকৃত হইলেন। ওমায়র কহিলেন, 'ভাই সাফওয়ান! হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত দয়াবান ও অনুগ্রহপরায়ণ আর কেহই হইতে পারে না।' সাফওয়ান হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'হুযূর! আমি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আমাকে আরও দুই মাসের সময় দিন।' হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দুই মাসের স্থলে চার মাসের সময় দিয়া বলিলেন, 'নিজের স্বাধীন চিন্তা শক্তি দ্বারা ইসলাম ধর্মের সত্যতা বিচার করিয়া দেখ।'

সাফওয়ান স্বধর্মে বহাল থাকিয়াই হোনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকরত পাক্কা ঈমানদাররূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

ওয়াহশীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

বর্ণিত এগারজন পুরুষের মধ্যে ওয়াহশীও ছিলেন। ইনি হাবশী গোলাম ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামযা (রাঃ) তাঁহারই হাতে শহীদ হন। মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিলেন। তিনি ভয়ে মক্কা ত্যাগকরত তায়েফে আশ্রয় লইলেন। কিছুদিন পরে তায়েফের একদল লোক মুসলমান হওয়ার জন্য যাইতেছিল। তিনি তাহাদের দলে মিশিয়া, হযরত রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াই কলেমা পাঠ করিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি ওয়াহশী নহে?' তিনি বলিলেন, 'জি হাঁ, আমারই নাম ওয়াহশী।' হযরত (দঃ) বলিলেন, 'তুমিই আমার চাচা হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করিয়াছিলে?' ওয়াহশী নত মস্তকে স্বীকারোক্তি করিলে পর হযরত (দঃ) তাঁহাকে ওহুদ যুদ্ধের সেই করুণ কাহিনী বর্ণনা করিতে কহিলেন। ওয়াহশী তাহা যথাযথ খুলিয়া বলিলে হযরত (দঃ)-এর চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। হযরত (দঃ) পিতৃব্য হামযাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যখনই তাঁহার হৃদয় বিদারক কাহিনী স্মরণ পথে উদিত হইত, তখনই অশ্রুবারিতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত হইয়া যাইত। ওয়াহশী (রাঃ)-এর মুখে শাহাদতের ঘটনা শুনিয়া হযরত (দঃ) বলিলেন, 'ওয়াহশী! তুমি কখনও আমার সম্মুখে বসিও না।' কারণ, তোমাকে দেখিলেই পিতৃব্য হামযার শোক মনে জাগিয়া আমার মনঃকষ্টের কারণ হইবে।

www.nagorikpathagar.org

ওয়াহ্শী সর্বদাই লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকিতেন। হযরত আবু বকরের খেলাফতের সময় নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার মোসায়লামা কায্যাবের সঙ্গে ইয়ামামার ময়দানে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ বাধে। ওয়াহ্শী হযরত হামযার কতলের প্রতিকার করার সুযোগ তালাশ করিতেছিলেন। এক্ষণে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া যে বর্শা দ্বারা হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করিয়াছিলেন, তাহাই হাতে লইয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ওয়াহ্শী মোসায়লামার উপর বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। ওয়াহ্শী বর্শা চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন; বর্শা মোসায়লামার দেহ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া বহির্গত হইল। সঙ্গেসঙ্গেই এক আনসারী যোদ্ধা তরবারির আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। ওয়াহ্শী এই ঘটনার পর অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করিলেন। তিনি বলিতেন, 'কুফরের অবস্থায় আমি যেমন সর্বোত্তম মানুষকে নিহত করিয়াছিলাম, তেমনি ইসলামের অবস্থায় নিকৃষ্টতম মানুষ বধ করিয়াছি।'

হেন্দা বিনতে ওতবার ইসলাম গ্রহণঃ

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দার নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশগণকে উত্তেজিত করা তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল। ওহুদের যুদ্ধে তাঁহার নারী কণ্ঠে উচ্চারিত যুদ্ধ-গীতি কুরাইশ যোদ্ধাদের জন্য অগ্নিবীণার কাজ করিয়াছিল। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কুকীর্তি এই যে, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রিয় চাচা হামযার নিধন প্রাপ্তির পর তাঁহার নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি কাটিয়া নিজের গলায় পরিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হওয়ায় মৃতদেহের বক্ষ বিদীর্ণকরত কলিজা বাহির করিয়া চর্বণ করিয়াছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় পর্যন্ত তাঁহার অবস্থার মোটেই পরিবর্তন ঘটে নাই। আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পূর্ব রাত্রে মক্কার নিকটস্থ প্রান্তরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা বর্ণিত হইয়াছে। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবু সুফিয়ানকে মক্কায় সকলের (কয়েকজন ব্যতীত) নিরাপত্তামূলক ঘোষণাবাণী প্রচার করার আদেশ দিলে তিনি যাইয়া কা'বা শরীফের নিকট তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। সকলে নির্বাক অবস্থায় ঘোষণা শুনিল, কিন্তু আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা তাঁহার দাড়ি টানিয়া ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, 'কে আছ তোমরা? এই নির্বোধ বুড়োকে মারিয়া ফেল।'

হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কয়েক জন স্ত্রীলোককে বধ করার আদেশ দিয়াছিলেন, হেন্দা তাহাদের অন্যতম। হেন্দার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র হইলেও সৌভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত তাঁহার সুবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। তিনি ঘরে প্রবেশকরত সমস্ত প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, 'এই অপদার্থ মূর্তিগুলির জন্যই আমাদের এই দুর্দশা। ইহাদের সামান্য মাত্র ক্ষমতা থাকিলেও এখন নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করিত।' হেন্দা নিজের বুদ্ধিমত্তা দ্বারা একথাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একবার হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলে মার্জনা লাভ করা কোনই কষ্টকর হইবে না। সুতরাং তিনি ইসলাম গ্রহণেচ্ছুক একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিতাবস্থায় দরবারে উপস্থিত হইয়াই কলেমা পাঠ করিলেন। তিনি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুইটি ছাগশাবক উপহার দিয়া তাহার ঘরে ছাগল কম হওয়ার অভিযোগ জানাইলেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য দো'আ করিলেন, ইহার পর হইতে হেন্দার ঘরে অস্বাভাবিকভাবে

www.nagorikpathagar.org

ছাগল বৃদ্ধি পাইল। হেন্দা নিজেই বলিতেন যে, 'হযরত রাসূলুল্লাহ্র দো'আতেই এ রকম বরকত প্রকাশ পাইয়াছে।'

যাহাদের সামান্য মাত্রও বিবেক বুদ্ধি আছে, তাঁহারা এই ঘটনাগুলি পাঠকরত সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইসলাম প্রচার ব্যাপারে কতদূর নম্রতা অবলম্বন করা হইয়াছে। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজনৈতিক জীবনে মক্কা বিজয়ের সাফল্যই শ্রেষ্ঠ সাফল্য। কিন্তু আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, এখানেই তাঁহার আদর্শ সর্বাপেক্ষা অধিক নম্রতা ও বিনয়পূর্ণ। ইহাতেই স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, তিনি রাজ্য জয় করিতেন, কিন্তু রাজা হিসাবে নহে ধর্ম প্রচারক হিসাবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানের কথার উত্তরে সত্য কথাই বলিয়াছিলেন যে, 'ইহা রাজত্ব নহে—নবুওয়ত।'

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এই শ্রেষ্ঠতম বিজয় কাহিনীর যে যে অংশে অস্বাভাবিক রকমের নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি।

(১) মুসলমানদের প্রতি মক্কাবাসীদের অত্যাচার নিতান্ত অমানুষিক ও পশুচিত ছিল। পাঠকগণ একবার ইসলাম প্রচারের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মক্কা বিজয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত যে যে ঘটনাবলী ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় স্মরণ পথে আনয়নকরত বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, এরূপ ভয়ানক শত্রুকে হাতে পাইয়া এ রকম সহজে ছাড়িয়া দেওয়ার নমুনা জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। কিন্তু রাসূলে মকবূল (দঃ) মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই ব্যাপকভাবে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সামান্য কয়েকজন ব্যক্তি যাহাদের জীবন নরহত্যা, পাশবিক ব্যবহার এবং অমানুষিক নির্যাতনে কলুষিত হইয়াছিল, তাহারাই কেবল সাধারণ ক্ষমা ও মার্জনা হইতে বিমুখ হইতেছে। কিন্তু পরিণামে তাহাদেরও অধিকাংশ নিজেদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করায় ক্ষমা লাভকরত নিমেষে বন্ধু শ্রেণীতে গণ্য হইতেছেন।

বিশেষরূপে সাফওয়ানের ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন! সাফওয়ানকে তাঁহার বন্ধুর অনুরোধে ক্ষমা করা হইল। তদুপরি যাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে নিজের মাথার পাগড়ি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া দুই মাসের অবকাশ চাহিলে দুই মাসের পরিবর্তে চার মাসের অবকাশ দেওয়া হইল। ইহার অর্থ এই ছিল না যে, চার মাস পরে ইসলাম গ্রহণ না করিলে তাহাকে বধ করা হইত; বরং তিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিরাপদে সেখানে ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হইত। এই রকম স্পষ্ট ঘটনাবলী থাকিতেও যাহারা একথা বলিতে চাহেন যে, ইসলাম প্রচারে বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আরও দেখিবার বিষয় সাফওয়ান স্বধর্মে থাকিয়াই হোনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যোগদানকরত যুদ্ধ করিতেছেন। যাদুল মা'আদ প্রণেতা ইবনুল-কাইয়্যেম লিখিতেছেন, সাফওয়ান হোনাইনের যুদ্ধে একশত লৌহবর্ম এবং তদনুরূপ অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ঘটনায় ইহাও বুঝা যায় যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কি রকম কড়া নিয়ম ইসলাম ধর্মে আছে; মুসলমানগণও তাহা কত কঠোরভাবে পালন করিতেন। বিধর্মীরা একথায় নিঃসন্দেহ ছিল যে, মুসলমানগণ কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারে না। দেখুন ইকরিমার মত সুচতুর লোক যখন তাঁহার স্ত্রীর নিকট শুনিলেন যে, তাঁহাকে 'আমান' দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি দ্বিধাহীনভাবে হযরত (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন।

www.nagorikpathagar.org

(২) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিজয়ীবেশে জন্মস্থান মক্কায় প্রবেশ করিতেছেন, এরূপাবস্থায় বিজয় গর্বে তাঁহার মস্তক উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র ভয় ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার মাথা এতদূর নত হইয়া পড়িয়াছে যে, দাড়ি মোবারক আসন স্পর্শ করিতেছে। হোদায়বিয়া সন্ধির পর বৎসর মুসলমানগণসহ হযরত (দঃ) মক্কায় 'ওমরা' ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য গিয়াছিলেন। তখন মক্কার লোকেরা মুসলমানগণকে দারিদ্র্য ও দুর্বলতার জন্য তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিত। এজন্য হযরত (দঃ) আদেশ করিয়াছিলেন, মুসলমানগণ যেন কা'বা প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করার সময় বাহু চালনাসহ সবল পদক্ষেপ করিয়া চলে। মুসলমানদিগকে তদবস্থায় চলিতে দেখিয়া মক্কার লোকেরা নিজেদের ধারণা অমূলক বলিয়া বুঝিয়াছিল। আর অদ্যকার একদিন, যখন বিজয়ী মুসলিম সৈন্য শৌর্য-বীর্য সহকারে মক্কায় প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু এখন তাহাদের প্রতি নির্দেশ হইতেছে যে, নম্রতা ও বিনয়ের নিদর্শন যেন তাহাদের যাবতীয় কার্যকলাপে প্রকাশ পায়। ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, কোন কারণে সাময়িক কঠোরতার বিধান থাকিলেও খোদা-ভীতি জনিত নম্রতাই ইসলাম ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্যস্থল। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রত্যেক কার্যকলাপের লক্ষ্যস্থলই ছিল খোদার সন্তুষ্টি এবং সত্যধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করণ। আত্মগৌরব অথবা আত্মস্বার্থের খাতিরে তিনি জীবনে কোন সময় কোন কাজই করেন নাই। বাদশাহী ও নবুওয়তের মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

নবুওয়তের পদাঙ্ক অনুসরণে যে সমস্ত খলীফাদের খেলাফত গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরও এই একই লক্ষ্যস্থল ছিল। যে সময় হইতে মুসলমানগণ তাহাদের লক্ষ্যস্থল ত্যাগ করিয়াছে, তখন হইতেই ইসলামের প্রকৃত উন্নতি লোপ পাইয়াছে। পরবর্তী যুগের মুসলমানদের উন্নতি-অবনতির ভিতরে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ অনুসন্ধান করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মক্কাবাসীদের জন্য ব্যাপক ক্ষমার ঘোষণায়ই একথা প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইসলামের উদ্দেশ্য শান্তি; অশান্তি নহে। এই ব্যাপারে আর একটি দৃশ্যপট পাঠক সম্মুখে স্থাপন না করিলে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

হযরত (দঃ) বিজয়ী বেশে কা'বা শরীফের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। বহু বৎসরের অত্যাচারী কুরাইশ সম্প্রদায় নত মস্তকে লজ্জিতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান। মহা নবী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন ঃ

'কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বংশ-গৌরবজনিত অহঙ্কার এবং আভিজাত্যাভিমান বিনষ্ট করিয়াছেন। তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে, বংশ-গৌরব নিয়া গর্বিত হওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ। সকল মানুষই এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা মাটি দ্বারা পয়দা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা সকলেই যখন মাটির মানুষ, তখন আবার আমাদের আত্মগৌরব করার কি অধিকার?'

অতঃপর হযরত (দঃ) কোরআন পাকের এই আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন—

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ○

'হে লোকগণ! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোক (আদম ও হাওয়া) হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সম্প্রদায় ও গোত্রসমূহে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পারস্পরিক

www.nagorikpathagar.org

পরিচয় পাইতে পার। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট কেবল তাহারাই অধিক সম্মান পাওয়ার যোগ্য যাহারা আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে।'

অনন্তর কুরাইশগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বল তো আমি এখন তোমাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করিব?' তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভ্রাতুষ্পুত্র।' তখন হযরত (দঃ) জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন—

اِنِّىْ اَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لِاِخْوَتِهٖ لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ○

'হযরত ইউসুফ তাঁহার ভাইগণকে যে কথা বলিয়াছিলেন, আমিও এখন তোমাদিগকে তাহাই বলিব। তিনি বলিয়াছিলেন, 'অদ্য প্রতিশোধ গ্রহণের দিন নহে—মিলনের দিন।' এই ক্ষমাবাণী প্রকাশ হওয়ার পর মক্কার সমস্ত নর-নারী সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করিল।

পাঠকগণকে একবার ধীরচিত্তে বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, ইসলাম ধর্মে যদি বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিত, তবে এই সময়ের চেয়ে বলপ্রয়োগের উপযুক্ত সময় আর কখন হইতে পারে? ইসলাম গ্রহণের জন্য না হউক, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও এই সময়ে কুরাইশদের উপর কঠোর ব্যবহার করা চলিত। তাহারা এই সময় সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের মুঠার ভিতরেই ছিল; কিন্তু তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ তো দূরের কথা সাধারণভাবেও ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে না। ধর্ম ব্যাপারে তাহাদিগকে তাহাদের স্বাধীন মতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পুনরায় পড়িয়া বলুন, ইহাতে কি বিজয় গর্ব, প্রতিহিংসাপরায়ণতা অথবা আত্মম্ভরিতার সামান্য মাত্রও আভাস পাওয়া যাইতেছে?

জাতি, সম্প্রদায় অথবা গোত্র বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা ইসলামের আদর্শ নহে। এই সমস্ত জিনিস কেবল পরিচয়ের সুবিধার জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব কেবল খোদা-ভীতি এবং খোদার আদেশ পালনের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের মনে খোদা-ভীতি উৎপন্ন করাই ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। ইহা কোন সম্প্রদায় বিশেষ অথবা গোত্র বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ইহাতে সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় ও সকল মানুষের সমান অধিকার রহিয়াছে। এজন্যই কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে মানব জাতিকে সাধারণভাবে আহ্বানকরত বলা হইয়াছে যে, মানুষ হিসাবে সকলেই সমান, সকলেই ভাই ভাই, কিন্তু আল্লাহর নিকট মর্যাদা পাইতে হইলে 'তাক্ওয়া' বা খোদার ভয়কে অন্তরে স্থান দিতে হইবে। ভয়ের নিদর্শন আনুগত্য দ্বারা প্রকাশ পায়। ইসলাম অর্থ অনুগমন। সুতরাং খোদা-ভীরু মানুষকেই মুসলিম বা অনুগামী বলা হয়।

(৩) খোদা তা'আলা যখনই কোন বড় কাজ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই প্রথমে উহার পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদনুযায়ী হোদায়বিয়া-সন্ধি মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস ও ভূমিকাস্বরূপ ছিল। হোদায়বিয়া-সন্ধি দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে অস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সর্বসাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে মিলামিশা করিতে পারিয়াছিল। ইহাতে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানদের শক্তি অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এজন্যই হোদায়বিয়া-সন্ধিকে 'ফতহে মুবীন' বা প্রকাশ্য জয় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অবশ্য ফতহে মুবীন দ্বারা হোদায়বিয়া-সন্ধি বুঝান হইয়াছে; নাকি মক্কা বিজয় বুঝান

www.nagorikpathagar.org

হইয়াছে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আমাদের মতে, মক্কা বিজয়ের ভিত্তিও যখন হোদায়বিয়া -সন্ধির উপরেই স্থাপিত, তখন হোদায়বিয়া-সন্ধিকে 'ফতহে মুবীন' বলাতে কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না।

আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আরও উপরে চালিত করিলে খোদা তা'আলার অনেক বৃহৎ কাজেই আমরা পূর্বাভাস ও ভূমিকা দেখিতে পাইব। ইসলামের প্রথম অবস্থায় এক সময় মুসলমানদের কেবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দস। তৎপরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কেবলা—কা'বা শরীফের দিকে মুখ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বিধান পরিবর্তনের পূর্বক্ষণেই কা'বা শরীফের মর্যাদা ইহার ভিত্তি স্থাপনের অলৌকিক ঘটনা, ইহার নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈলের কাহিনী বিবৃত করা হইয়াছিল। এ রকম না হইলে কেবলা পরিবর্তনের আদেশ বাস্তবিকই কঠিন বলিয়া বোধ হইত।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হওয়া আরবের লোকদের ধারণা মতে অভিনব ব্যাপার ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই বৃহত্তম ব্যাপারের পূর্বেও বহুবিধ ভূমিকা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যথা—হযরত (দঃ)-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেই 'আসহাবে ফীল' বা আবরাহার অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল; হযরত (দঃ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার রাত্রে বহুবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছিল। হযরত (দঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সংবাদ দিয়াছিল যে, জগতে অসম্ভব রকমের একটা পরিবর্তন দেখা দিবে। সে সময় এই ভূমিকাসমূহের প্রতি লোকদের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট না হইলেও হযরত (দঃ) নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর তৎপ্রতি লোকেরা দৃকপাত করিয়াছিল।

বৃক্ষ ফলবান হওয়ার পূর্বে পুষ্প, পল্লবে শোভিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে ফল হওয়ার ভূমিকা বলা যাইতে পারে। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবনেও নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে নবুওয়তের ভূমিকা দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি তাঁহার জন্মস্থানে 'আমীন' বা বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মানুষ যখন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ হয়, তখন তাহার ধারণা, কল্পনা এমন কি তাহার স্বপ্ন পর্যন্ত সত্য হইয়া থাকে। হযরত (দঃ)-এর জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। নবুওয়ত প্রাপ্তির ছয়মাস পূর্ব হইতে তিনি বহুবিধ স্বপ্ন দেখিতেন। যাহা দেখিতেন, হুবহু তাহাই ফলিত। এই অবস্থা ছয়মাস ছিল। তৎপরে তাঁহার নিকট ওহী আসিয়াছিল।

মক্কা বিজয় পরিশিষ্ট

কা'বা শরীফ পবিত্রকরণ ঃ

মক্কা বিজয় হওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কা'বা শরীফের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় ওসমান ইবনে তালহার নিকট কা'বা শরীফের চাবি ছিল। হযরত (দঃ) 'তওয়াফ' (কা'বা প্রদক্ষিণ) সমাধা করত ওসমানের নিকট হইতে চাবি লইয়া বায়তুল্লাহ্‌র দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া দেখেন, তাহাতে বহুবিধ মূর্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মূর্তিও আছে। পয়গম্বরদ্বয়ের মূর্তি এরূপে তৈয়ার করা হইয়াছে, যেন তাঁহারা 'আযলাম' নামক তীরের ফলা দ্বারা জুয়া খেলায় লিপ্ত রহিয়াছেন। এতৎদৃষ্টে নবী করীম (দঃ)

www.nagorikpathagar.org

বলিলেন, নির্মাতাদের সর্বনাশ হউক, পয়গম্বরদ্বয়ের মূর্তি এভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে, অথচ তাঁহারা জীবনে কখনও জুয়া খেলার কল্পনাও করেন নাই। মূর্তিগুলির মধ্যে একটি কাঠের কবুতরও ছিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা স্বহস্তে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অন্যান্য মূর্তিগুলিও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। এইভাবে বহু শতাব্দী পরে আল্লাহ্‌র ঘর আবার পবিত্র আকার ধারণ করিল। অনন্তর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা গৃহে নামায পাঠকরত বাহিরে আসিলেন।

ওয্‌যা প্রতিমা ধ্বংস ঃ

কা'বা শরীফ ব্যতীত মক্কা এবং আরবের অন্যান্য আরও কয়েক জায়গায় অনেক দেব-মন্দির তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছিল। দেবতাদের মধ্যে লাত এবং ওয্‌যা শীর্ষস্থানীয় দেবতা ছিল। আরবের লোকেরা কা'বা শরীফকে যেভাবে মান্য করিত, এই দেবতাদিগকে সেরূপ শ্রদ্ধা করিত। পূর্ব যুগে আমর ইবনে লুহাই যখন আরব দেশে প্রথম প্রতিমা পূজার প্রবর্তন করে, তখন সে লোকদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, খোদা তা'আলা শীতকালে "লাত" দেবতার ভিতরে এবং গ্রীষ্মকালে "ওয্‌যা" দেবতায় থাকেন। লাত দেবতার কেন্দ্রস্থল তায়েফে ছিল। এই বাতিল খেয়াল আরববাসী সর্বসাধারণের মনে এমনিভাবে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহারা দেবতাগুলিকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিত।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদেশে সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদ ত্রিশজন তেজস্বী যুবকসহ ওয্‌যা দেবতা ধ্বংস করিতে চলিলেন। মন্দিরসহ দেবতা বিনষ্টকরত প্রত্যাবর্তন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) খালেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'সেখানে আশ্চর্যরকমের কোনকিছু দেখিতে পাইলে কি?' খালেদ বলিলেন, "কিছুই না।" তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, 'তবে আবার ফিরিয়া যাও। তুমি প্রকৃত ওয্‌যাকে বিনষ্ট কর নাই; এবার বিনষ্ট করিয়া আইস।' খালেদ একথা শুনিয়া তরবারি কোষমুক্তকরত আবার ফিরিয়া গেলেন। এবার যাইয়া দেখেন, ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে একটি কাল কুৎসিত ও উলঙ্গ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাহির হইয়া নিজের মাথায় মৃত্তিকা নিক্ষেপকরত শোক প্রকাশ করিতেছে। মন্দিরের খাদেমরা তাহাকে দেখিয়া চীৎকারকরত বলিতে লাগিল, "হে আমাদের ইষ্টদেব! খালেদকে অন্ধ করিয়া ফেল।" হযরত খালেদ তরবারির এক আঘাতে বৃদ্ধাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

يَا عُزّٰى كُفْرَانَكِ لَاسُبْحَانَكِ   اِنِّىْ رَاَيْتُ اللهَ قَدْ اَهَانَكِ

'হে ওয্‌যা, তোমাকে বর্জন করিতেছি, তোমার পবিত্রতা কীর্তন করিতেছি না; যেহেতু আমি দেখিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করিতেছেন।'

খালেদ ফিরিয়া আসিয়া হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ)-এর নিকট ঘটনা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, 'ইহাই তাহাদের ওয্‌যা দেবতা ছিল।'

—এশাআতে ইসলাম, মাদারেজুন্নবুওয়ত ২য় খণ্ড পৃঃ ৩০৬

সুওয়া' দেবতা বিনাশ ও পূজারীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

অতঃপর আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর প্রতি সুওয়া' (سواع) দেবতা বিনষ্ট করার আদেশ হইল। আমর মন্দিরের নিকট পৌঁছিলে পূজারী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার অভিপ্রায় কি?' আমর

(রাঃ) বলিলেন, 'হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে প্রতিমা ধ্বংস করিতে আদেশ করিয়াছেন।' পূজারী কহিল, 'আপনি কখনও একাজ করিতে পারিবেন না। নিশ্চয়ই, দেবতা আপনাকে বাধা দিবে।' আমর কহিতে লাগিলেন, 'রে নির্বোধ! তুমি কি এখনও এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছ যে, একটি প্রস্তর-মূর্তি বাধা দিতে পারে। তাহার কি শুনিবার অথবা দেখিবার ক্ষমতা আছে? তবে দেখ ভাঙ্গিতে পারি কিনা।' এই বলিয়া আমর এক আঘাতে প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তৎপর পূজারীকে কহিলেন, 'এখন তো তোমার বাতিল ধারণা দূর হইয়াছে? কেন নিরর্থক পাথর পূজায় অমূল্য জীবন বিনষ্ট করিতেছ? ওয়াহেদ লা-শরীক আল্লাহ্র এবাদত অবলম্বন করত জীবনের উদ্দেশ্য সফল কর।'

পূজারী হযরত আমরের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, প্রস্তর-মূর্তির অর্চনায় কোনই সার্থকতা নাই। অনন্তর সে বিশুদ্ধচিত্তে কলেমা পাঠকরত ইসলাম গ্রহণ করিল।

—তারিখে ইবনে কাইয়্যেম, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২৬

মনাত দেবীর পরিণাম ঃ

ওয্যা ও লাতের পরেই মনাত প্রতিমার স্থান ছিল। মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে মোশাল্লাল নামক স্থানে উহা অবস্থিত ছিল। সা'দ ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর আদেশে মনাত মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলে মন্দির রক্ষক কহিল, 'সাবধান, মনাত দেবীর ক্ষমতা অতুল; তিনি কুপিতা হইলে তোমার সর্বনাশ হইবে।' সা'দ একথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রতিমা ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইলেন, 'তখন একটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক যাহার বর্ণ কাল, মাথার চুল এলোমেলো, বক্ষে করাঘাত ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল।'

—তারিখে ইবনে কাইয়্যেম, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪২৬

সা'দের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই প্রেতিনীই প্রস্তর মূর্তিটির ভিতরে থাকিয়া লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছিল। হযরত খালেদের হাতে ওয্যাদেবীর যেই পরিণাম হইয়াছিল, ইহারও সেই পরিণাম হইল। অনন্তর সাদ প্রতিমা ও মন্দির বিধ্বস্তকরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে যাইয়া সংবাদ দিলেন।

প্রতিমা ধ্বংসের সূক্ষ্মতত্ত্ব ঃ

আরব দেশ বিশেষরূপে মক্কা-মদীনা সত্য ধর্মের কেন্দ্রস্থল। এখান হইতে সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মের আলোক বিকীর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হইবে; ইহাই খোদা তা'আলার অভিপ্রেত। সমগ্র রাজ্যের জন্য সাধারণ আইন প্রচলিত থাকিলেও রাজধানীর জন্য কোন বিশেষ নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া কোনই দূষণীয় নহে। সুতরাং ধর্ম ব্যাপারে সকল মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলেও ধর্ম রাজ্যের রাজধানী 'জযিরাতুল আরব'কে প্রতিমা পূজা হইতে পবিত্র করা ইসলামের প্রথম লক্ষ্য।

অন্ধকার যেমন রবিকর সহ্য করিতে পারে না। তেমনি শিরকও ইসলামের আলোক বরদাশ্ত করিতে অক্ষম। ইসলাম রবি আরবের আকাশে উদিত হইয়াছে। অতএব, সেখানে শিরকের অন্ধকার কিরূপে থাকিতে পারে, এজন্যই হযরত (দঃ) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে—

اِنَّ الشَّيْطَانَ اَيِسَ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ○

"শয়তান একথা হইতে চিরতরে নিরাশ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্র সত্যিকার উপাসকগণ জযিরাতুল আরবের ভিতরে তাহার পূজার্চনা করিবে।" —মেশকাত কিতাবুল ঈমান

www.nagorikpathagar.org

একথা বলা বাহুল্য যে, শয়তানের পূজা দ্বারা প্রতিমা অথবা অন্য যে কোন সৃষ্ট জীবের পূজা বুঝান হইয়াছে। প্রায় চৌদ্দশত বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; এখনও নূরনবীর সেই পবিত্র বাণী অক্ষত রহিয়াছে, শেষ প্রলয়কাল পর্যন্ত এ রকমই থাকিবে। যুগে যুগে দুনিয়ায় কত পরিবর্তন ঘটিতেছে, কত রাজ্যের উত্থান এবং কত রাজ্যের পতন হইতেছে। মুসলমানদেরও কত উত্থান পতন ঘটিল, কিন্তু জযিরাতুল আরব শয়তানের পূজা তথা বুতপরস্তি হইতে যেমন পবিত্র হইয়াছিল, তেমনি পবিত্র রহিয়াছে। ইহা কি মহা নবীর মো'জেযা বা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য নহে? ইহা দ্বারা কি ইসলাম ধর্মের সত্যতা দিবাকর সম সুপ্রকাশিত হইতেছে না?

ওয্যা ও মনাত প্রতিমাদ্বয়ের ভিতর হইতে যে কৃষ্ণ বর্ণের উলঙ্গ স্ত্রীলোক বাহির হইয়া শোক প্রকাশ করিতেছিল। আমাদের ধারণা মতে তাহা প্রেতিনী নিম্ন শ্রেণীর জিন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শয়তান লোকগণকে'পথভ্রষ্ট করার নিমিত্ত প্রতিমার ভিতরে ইহাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। অধুনা বৈজ্ঞানিক যুগের লোকেরা হয়তো ভূত প্রেতের কথা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। হয়তো তাহারা বলিবে যে, কোন মানবী সেখানে লুকাইয়া ছিল। তা' বিজ্ঞান যখন জিন বা ভূত প্রেতের সন্ধান এখনও পায় নাই, তখন তাহাদিগকে জোর করিয়া একথার উপর বিশ্বাস করান যাইবে কিরূপে? কিন্তু আমরা তাহাদিগকে সংক্ষেপে এতদূর বলিয়া রাখিব যে, বিজ্ঞান যে সকল পদার্থেরই সন্ধান করিতে পারিয়াছে, একথার কি প্রমাণ তাহাদের নিকট আছে? উপমাস্বরূপ দেখুন, বিদ্যুত আমাদের চতুর্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা দেখিতে পাই না। এই সেদিন মাত্র বিজ্ঞান উহার সন্ধান পাইয়াছে। এখন বিজ্ঞান বিদ্যুৎ দ্বারা আলো জ্বালাইতেছে; পাখা চালাইতেছে; গাড়ী টানিতেছে; আরও কত কিছু করিতেছে। একদিন যে জিনের সন্ধান পাইবে না এবং উহাকে খাঁচায় পুরিয়া পোষ মানাইতে চেষ্টা করিবে না, একথা কিরূপে বলা চলে?

যাহা হউক বিজ্ঞান এক্ষণে ওয্যা ও মনাত হইতে বহির্গত বৃদ্ধাদ্বয়কে মানবী বলুক অথবা তাহাদের জন্য প্রতিমার ভিতরে জীবনযাপনের কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য খোঁজ করুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা কেবল বহির্গত বৃদ্ধাদ্বয়ের বক্ষে করাঘাত এবং ক্রন্দনের অনুসন্ধান করিব। ইসলামের আধ্যাত্মিক আলোক আরবের আকাশ-বাতাস আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছিল। বৃদ্ধারূপী শয়তানী অথবা মানবীর পক্ষে ইসলামের অত্যুজ্জ্বল আলোক অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা একথাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই প্রদীপ নির্বাপিত হইবার নহে। আরবে সত্যধর্মের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং বাতিলের প্রভাব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ○

'সত্য আসিয়াছে এবং বাতিল বিনষ্ট হইয়াছে।'

হযরত খালেদ ও বনী খুযায়মা ঃ

বনী খুযায়মা আরব দেশের এক গোত্রের নাম। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাহারা মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছে নাই। এই সম্প্রদায় সমগ্র আরবে অত্যন্ত দুর্দান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবিলেন, হয়তো বনী খুযায়মা

www.nagorikpathagar.org

অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং এখনই তাহাদিগকে শায়েস্তাকরত ভাবী অশান্তির পথ বন্ধ করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া খালেদ ইবনে ওলীদের অধীনে তিন শত পঞ্চাশ জন মুসলিমসেনা প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে আনসার, মোহাজের এবং বনী সলিম সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অন্ধকার যুগে বনী খুযায়মার লোকেরা হযরত খালেদের দুই চাচাকে বধ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বনী সলিমেরও কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল। বনী খুযায়মা সম্প্রদায় শুনিল, খালেদ ইবনে ওলীদ এবং বনী সলিমের বহু সংখ্যক লোক তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের ভয় হইল যে, হয়তো তাহারা পুরাতন অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোন সৈন্যদল কোথাও যুদ্ধার্থে পাঠাইবার সময় দলপতিকে সাবধান করিয়া দিতেন যে, প্রথমে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে কিনা। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে বলিয়া স্বীকারোক্তি করে অথবা তাহাদের আবাদী হইতে আযান ধ্বনি শুনা যায়, তবে আর অস্ত্রধারণ করিবে না। হযরত খালেদের প্রতিও এই হুকুম দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এদিকে বনী খুযায়মার সজ্জিতাবস্থায় বহির্গত হওয়া তাহাকে সন্দেহে পতিত করিয়াছিল। তদুপরি তাহাদিগকে মুসলমান হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা اسلمنا। (মুসলমান হইয়াছি) বলার পরিবর্তে صبانا বলিয়া উত্তর দিল। صبانا অর্থ—ধর্মত্যাগ করিয়াছি। তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমাদের পুরাতন ধর্ম পরিত্যাগকরত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু খালেদ তাহাদের কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। শেষরাত্রে আদেশ করিলেন যে, যাহার নিকট কয়েদী আছে, তাহাকে বধ করিয়া ফেল। বনী সলিমের সৈন্যগণ আদেশ প্রতিপালন করিলেন। কিন্তু মোহাজের ও আনসার সম্প্রদায়ের প্রবীণ লোকেরা এই কাজ হইতে বিরত রহিলেন।

হযরত (দঃ)-এর নিকট এই নিদারুণ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাত উঠাইয়া তিনবার বলিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ○

'আল্লাহ্, খালেদের এই কাজ হইতে আমি নির্দোষ।' —মাদারেজুন্নবুওয়ত দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৩০৭

অতঃপর হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে বহু সংখ্যক উষ্ট্র, অর্থ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ সেখানে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, 'তাহাদের ধন ও প্রাণের বিনিময় পূর্ণরূপে যেন বুঝাইয়া দেওয়া হয়।' হযরত আলী (রাঃ) তথায় পৌঁছিয়া প্রত্যেক প্রাণের পরিবর্তে একশত উষ্ট্র এবং ছোট বড় সকল জিনিসের মূল্য বুঝাইয়া দিলেন। এক বাড়ীতে কুকুরের পানি দেওয়ার একটি পেয়ালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহারও মূল্য দেওয়া হইল। বিনিময় দেওয়ার পর যে মাল বাঁচিয়াছিল তাহাও তাহাদিগকে দিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে কর্তব্য সমাধাকরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া সংবাদ দিলে তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

হযরত খালেদ (রাঃ) এই কাজ ভুলবশত করিয়াছিলেন। এইজন্য হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলেন নাই। কিন্তু প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুর রহমান

www.nagorikpathagar.org

ইবনে আওফ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'খালেদ! তুমি ইহা অন্ধকার যুগের অনুরূপ করিয়াছ।' খালেদ বলিলেন, 'আমি তো আপনার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছি।' (আবদুর রহমানের পিতা আওফকেও বনী খুযায়মার লোকেরা হত্যা করিয়াছিল।) আবদুর রহমান তদুত্তরে খালেদকে কহিলেন, 'তোমার একথা ঠিক নহে। একে তো আমার পিতার প্রতিশোধ আমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছি; দ্বিতীয়তঃ, জাহেলিয়তের সময় যে খুন হইয়াছে, ইসলামের সময় উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করার বিধান নাই।'

হযরত আবদুর রহমানের কথা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ছিল। কারণ, তিনি নিজেই পিতৃ হন্তাকে বধকরত প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ অন্ধকার যুগে অজ্ঞতাবশতঃই তাহারা আবদুর রহমানের পিতাকে বধ করিয়াছিল। তাহার পিতাও সে সময় কাফের ছিল। এখন বনী খুযায়মা বংশীয় লোকেরা ইসলামের আলোতে আসিয়াছে; সুতরাং সেই অপরাধে তাহাদিগকে হত্যাকরা কিছুতেই ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু হযরত খালেদের অর্থ কখনও এই নহে যে, তিনি আবদুর রহমানের পিতার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে একাজ করিয়াছিলেন; বরং ইহার অর্থ এই যে, যে উদ্দেশ্যেই বধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকুক না কেন, ইহাতে তাহার পিতার প্রতিশোধ হইয়া গিয়াছে। সর্বাবস্থায়ই হযরত খালেদ কাফের ভাবিয়া বধ করিয়াছিলেন। নতুবা অন্ধকার যুগের একজন কাফেরের পরিবর্তে একজন মুসলমানকে তিনি কখনও বধ করিতেন না।

তাঁহাদের তর্কবিতর্কের কথা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কানে পৌঁছিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেনঃ

مَهْلًا يَا خَالِدُ دَعْ عَنْكَ اَصْحَابِىْ فَوَاللهِ لَوْكَانَ لَكَ اُحُدٌ ذَهَبًا فَاَنْفَقْتَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ
مَاَادْرَكْتَ غُدْوَةَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَلَا رَوْحَةً ○

'খালেদ, সাবধান! আমার আসহাবদের বিষয়ে কিছু বলিও না। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমার নিকট যদি ওহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ থাকে এবং তুমি তাহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, তবেও তাহাদের এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা ধর্মের সেবায় বাহির হওয়ার সওয়াবও পাইতে পার না।'

একটি সমস্যা ও উহার সমাধানঃ

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে খালেদ (রাঃ)-কে বলিলেন, আমার আসহাবদের সম্বন্ধে কিছু বলিও না, একথায় এমন বুঝা যায় যে, নিশ্চয়ই, খালেদ আসহাবদের মধ্যে গণ্য নহেন। অথচ একথা সর্ববাদী সম্মত যে, তিনি নিশ্চয়ই আসহাবের অন্তর্গত ছিলেন।

এশাআতে ইসলাম প্রণেতা মাওলানা হাবিবুর রহমান দেওবন্দী এই প্রশ্নের যে চমৎকার উত্তর দিয়াছেন, আমরা তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যথেষ্ট মনে করি। মওলানার উত্তরের সারমর্ম এই—

হযরত খালেদ অবশ্যই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। নবী করীম (দঃ) অনেক বড় বড় কাজের দায়িত্বও তাঁহার উপর অর্পন করিতেন। তাঁহারই বাহুবলে রোম ও পারস্যের সিংহাসন মুসলমানদের আয়ত্তে আসিয়াছিল। তাঁহার কীর্তি-কলাপ স্বর্ণাক্ষরে মুসলিম জাহানের ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলী সত্ত্বেও তিনি আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং তাঁহার সমকক্ষ সাহাবাদের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা এ রকম সময় মুসলমান হইয়াছিলেন এবং ধন-প্রাণ দ্বারা ইসলামের সাহায্য করিয়াছিলেন, যখন মুসলমানদের জীবন রক্ষা

www.nagorikpathagar.org

কঠিন ছিল। তাঁহাদের কষ্টের অন্ত ছিল না—আত্মীয় স্বজনের বিদ্রূপ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত, অনাহার, অর্ধাহার বরণ করিতে হইত। মাতৃভূমি ছাড়িয়া প্রবাসে জীবনযাপন করিতে হইত। এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করার কারণে তাঁহাদের মর্যাদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিশেষরূপে আবদুর রহমান ইবনে আওফ মুসীবতে ধৈর্য্য ধারণের পুরস্কারস্বরূপ ইহজগতেই পরকালে বেহেশত লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খালেদ ইবনে ওলীদ মর্যাদাসম্পন্ন বহু গুণাবলীতে ভূষিত সাহাবী হইলেও হোদায়বিয়া সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের সময় অতিক্রম হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব, খালেদ ইবনে ওলীদ সাহাবী হইলেও এবং তাঁহার প্রতি হযরত নবী করীম (দঃ)-এর অগাধ স্নেহ থাকিলেও তিনি হযরত আবদুর রহমান -এর তুলনায় নগণ্য ছিলেন। এই হিসাবে কেবল তুলনামূলকভাবে তাহাকে ইহা বলা হইয়াছিল।

ইহাতে একথা স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, সাহাবাগণের মধ্যে সকলের মর্যাদা সমান নহে। তাঁহাদের মধ্যে ঐ সমস্ত ভাগ্যবান পুরুষের মর্তবাই (সম্মান) বেশী, যাঁহারা প্রাথমিক নিঃসহায় অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করত দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা অধিককাল হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র সাহচর্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য কেবল হযরত (দঃ)-এর সাহচর্যের কারণেই হইয়াছিল। নতুবা পরবর্তী যুগেরও অনেক লোক বিদ্যা এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় অনেক সাহাবার চেয়েও উচ্চ স্থানীয় ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ)-এর সাহচর্য প্রাপ্ত না হওয়ায় সাহাবাদের সমান ফযীলতের অধিকারী হইতে পারেন না। বুঝা গেল, সাহচর্যই সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। সুতরাং যাঁহারা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ঈমান আনিয়াছিলেন, তাঁহারা একে তো ধর্মের জন্য বেশী কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ বেশী কাল হযরত (দঃ)-এর সাহচর্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের মর্তবা বেশী হওয়াতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে ?

তৎসঙ্গে একথাও জানা আবশ্যক যে, যাঁহারা প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও আবার মর্যাদা হিসাবে পার্থক্য রহিয়াছে। অনেকে আত্মোৎসর্গ ও নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে সমসাময়িক সাহাবাদের উপরে আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। একবার হযরত নবী করীম (দঃ) সাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া হযরত আবু বকর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'আমার সহচর আবু বকরকে আমার জন্য ছাড়িয়া দাও।' ইহাতে স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায়, যেন আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ সাহাবী বা সহচর নহেন। কিন্তু এখানেও কেবল মাত্র মর্যাদার পার্থক্য হিসাবেই এ রকম বলা হইয়াছে। অন্যান্য সকলে সাহাবা হইলেও হযরত আবু বকরের তুলনায় অ-সাহাবার সমকক্ষ ছিলেন।

অজ্ঞ ভাইদের ভুল ধারণা সংশোধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবেই আমরা এই প্রসঙ্গ খানিকটা প্রশস্ত করিয়াছি। কারণ, অনেকে হয়তো খালেদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কীর্তি-কলাপ পাঠে তাঁহার আসন প্রথম যুগের সাহাবাদের উপরে স্থাপন করিতে পারেন। আরও হযরত ওমর ফারূকের খেলাফত কালে ইসলামের অভাবনীয় উন্নতি দৃষ্টে হয়তো তাঁহাকে হযরত আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন। এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা বোধ হয় এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

■

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

'সানাতুল-ওফুদ'

কুরাইশ বংশের মান-সম্মান সমগ্র আরব দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। সকলেই কুরাইশীগণকে নিজেদের ইমাম বা দলপতি বলিয়া জানিত এবং তাহাদের কার্যকলাপকে অনুকরণীয় বলিয়া মনে করিত। কুরাইশ সম্প্রদায়ের সকলেই যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল, তখন আরববাসীদের ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম হইয়া পড়িল। বড় বড় গোত্রের লোকেরা নিজেদের প্রতিনিধিদল বা ডেপুটেশন পাঠাইয়া ইসলামের শিক্ষা লাভ করিল এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম কবুল করিল। মক্কা বিজয়ের পর এক বৎসরের মধ্যে আরবের প্রায় সমস্ত জায়গা হইতেই ডেপুটেশন আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্যই এই বৎসরটি 'সানাতুল-ওফুদ' বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। আরবীতে ডেপুটেশনকে 'ওফ্‌দ' বলে। 'ওফুদ' ইহারই বহু বচন। সানাতুল-ওফুদ অর্থ হইল—ডেপুটেশন বৎসর।

এই সময় কার্যতঃ প্রায় সমগ্র আরব দেশে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল। মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত কোন শক্তিই আরব দেশে আর বাকী রহিল না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন ঔদ্ধত্যসম্পন্ন সম্প্রদায় এ সময়ও হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়া হঠকারিতার পরিচয় দিতে এবং রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভদ্রোচিত ব্যবহার দ্বারা যাতনা দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তি সামর্থ্য হাতে থাকা সত্ত্বেও তাহাদের অভদ্রোচিত ব্যবহার বরদাশ্‌ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; বরং যে যেভাবে ইসলামকে বুঝিতে চাহিয়াছিল, তাহাকে সেভাবেই বুঝাইয়া দিলেন। পূর্বাপর ঘটনাবলীর আলোচনায় একথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সমগ্র আরবের লোকেরা পূর্ব হইতেই বিভিন্ন সূত্রে ইসলামের তাৎপর্য অবগত হইয়া ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল; কিন্তু কুরাইশদের ভয় এবং অন্ধ অনুকরণের কারণে এ যাবৎ ইসলাম গ্রহণে বিরত ছিল, এক্ষণে প্রতিবন্ধকতা উঠিয়া যাওয়ায় এক সঙ্গে সমগ্র দেশ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পদতলে আশ্রয় লইল। আমরা আরবের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি দলের আগমন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক খবর জানিতে পারিয়াছি। নিম্নে উহার কয়েকটির আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

বনী তামীমের প্রতিনিধি দল :

সুপ্রসিদ্ধ বনী তামীমের প্রতিনিধি দলবলসহ মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কবি এবং বক্তাগণও আসিয়াছে। তাহারা মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইয়াই অসভ্যতার সহিত ডাকিতে লাগিল, 'মুহাম্মদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাহিরে আস।' তাহাদের বর্বরোচিত

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহারে নিশ্চয়ই হযরত (দঃ)-এর অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষাও দিতে পারিতেন। কিন্তু কিছুই করিলেন না। তিনি শান্তভাবে বাহিরে আসিয়া তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, 'আমরা আপনার সঙ্গে কবিতা ও বক্তৃতা দ্বারা প্রতিযোগিতা করিতে আসিয়াছি।'

তৎকালে কবিতা ও বক্তৃতা দ্বারা নিজেদের বংশ-গৌরব ও যশঃকীর্তি প্রকাশ ও তৎসংক্রান্ত প্রতিযোগিতার প্রথা আরব দেশে প্রচলিত ছিল। তাহাদের এই আবদার যে নিতান্ত অসঙ্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; হয়তো রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই অন্যায় আবদারের উত্তরে বলিয়া দিতে পারিতেন যে, ইসলাম ধর্মের সত্যতা দলীল-প্রমাণসহ সুপ্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা—যে যেভাবেই ইসলামকে বুঝিতে চাহে; তাহাকে সেভাবে বুঝাইতে হইবে। অনন্তর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী তামীমের বক্তাকে নিজেদের গৌরব-কাহিনী ব্যক্ত করিতে অনুমতি দিলেন। বনী তামীমের বক্তা আতারেদ দণ্ডায়মান হইয়া নিজেদের গৌরব বর্ণনা প্রসঙ্গে ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, 'সেই আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদের মধ্যে বাদশাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকে ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা সর্বসাধারণের উপকার করিতেছি। প্রাচ্য জগতে আমাদের সমকক্ষ আর কে আছে········ ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষ করিয়া তামীমী বক্তা উপবেশন করিলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সাবেত ইবনে কায়সের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তিনি ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনার্থে এরূপ বক্তৃতা দিলেন —

'সেই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় আদেশে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞান অসীম ও সর্বব্যাপী। তাঁহার অনুগ্রহ ও আদেশ ব্যতীত কোন কিছুই হইতে পারে না। তাঁহার অনুগ্রহের ফোঁটামাত্র আমাদের উপর বর্ষিত হওয়ায় আমরা রাজত্ব পাইয়াছি। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁহার সৃষ্ট জগতের সর্বোত্তম মানুষকে আমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। এই রাসূল বংশ হিসাবেও সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত, তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী এবং জ্ঞানী-গুণী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং সমস্ত মানুষের পথ প্রদর্শনের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তিনি সকল মানুষকে ঈমানের দিকে আহবান করিয়াছেন। তাঁহার স্বগোত্রীয় মোহাজেরগণ তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়াছেন। তাঁহাদের পরে আমরাই সকলের পূর্বে আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম পালন করিয়াছি। অতএব, আমরাই আল্লাহ্‌র ধর্মের সাহায্যকারী আনসার এবং আমরাই আল্লাহ্‌র রাসূলের মন্ত্রণা-দাতা। আমরা আল্লাহ্‌র ধর্মের সাহায্যার্থ যুদ্ধ করি এবং ধর্মপথে অকাতরে প্রাণপাত করি·········।' এইরূপে আনসারী বক্তা স্বীয় বক্তৃতা শেষ করিলেন।

অতঃপর তামীমী দলের কবি জবরকান উঠিয়া স্বকল্পিত কবিতায় নিজেদের গৌরব প্রকাশ করিল। জবরকান পঠিত কবিতার কয়েক ছত্র উদাহরণস্বরূপ নিম্নে অনুবাদসহ উদ্ধৃত হইল—

نَحْـنُ الْكِـرَامُ فَلَا حَيٌّ يُعَـادِلُنَـا ‏ ‏ مِنَّـا الْمُلُوْكُ وَفِيْنَـا تُنْصَبُ الْبِيَـعُ

'আমরা সম্ভ্রান্ত, এ বিষয়ে আমাদের সমকক্ষ কেহই নাই; আমাদের মধ্যেই বাদশাহসমূহ হইয়াছেন, আরও আমাদের মধ্যে ধর্ম-মন্দিরসমূহ গঠিত হইয়াছে।'

وَنَحْنُ نُطْعِمُ عِنْـدَ الْقَحْـطِ مَطْعَمَنَـا ‏ ‏ مِنَ الشِّـوَاءِ اِذَا لَمْ يُوْنَس الْقَـرَعُ

www.nagorikpathagar.org

'আমরা দুর্ভিক্ষের সময় লোকদিগকে খাদ্য দান করি, ভাজা গোশ্‌ত দ্বারা যখন তাহারা কদু তরকারী অপছন্দ করে।'

بِهٖ تَرَى النَّـــاسَ يَأْتِـيْـنَــا سَرَاتُهُمْ   مِنْ كُلِّ اَرْضٍ هَوِيًّــا ثُمَّ تَصْـطَنَعُ

'এজন্য দেখিতেছ যে, ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক স্থান হইতে লোকদের দলপতিগণ আমাদের নিকট নতমস্তকে আসেন এবং সৎকর্মে যোগ দেন।'

জবরকান কবিতা শেষ করিলে হযরত নবী করীম (দঃ) ইসলামী কবি হযরত হাস্‌সানকে উহার প্রত্যুত্তর দেওয়ার আদেশ করিলেন। হাস্‌সান কবিতা পাঠের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত উক্তিতে যে কবিতা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তামীমী কবি ও তাহার সঙ্গীগণ যতপরোনাস্তি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাহাদের দলপতি বলিতে লাগিলেন—

'নিশ্চয়ই, এই ব্যক্তি [হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)] আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছেন। নিশ্চয়ই, তাঁহার খতীব (বক্তা) আমাদের খতীবের চেয়ে উত্তম; তাঁহার কবিও আমাদের কবির চেয়ে উত্তম।'

নমুনাস্বরূপ হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর কয়েক পংক্তি কবিতাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কবি কুরাইশ ও মোহাজের সম্প্রদায়ের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

اَعِفَّــةٌ ذُكِــرَتْ فِى الْوَحْىِ عِفَّتُهُمْ   لَايَــطْـمَـعُــوْنَ وَلَا يُرْدِ بِهِــمْ طَمَــعُ

'তাঁহারা পবিত্র, তাঁহাদের পবিত্রতা কোরআনেও বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা লোভে পতিত হন না; সুতরাং লোভ-লালসা তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে না।'

لَايَـبْـخَـلُوْنَ عَلٰى جَارٍ بِفَـضْـلِهِـمْ   وَلَيَـمَـسُّـهُـمْ مِّنْ مَّطْـمَـعٍ طَمَـعُ

তাঁহারা নিজের মাল প্রতিবেশীদিগকে দান করিতে মোটেই কৃপণতা করেন না। আর লালসার উপকরণ তাঁহাদিগকে লালসায় পতিত করিতে পারে না।

এবংবিধ প্রশংসাবাদের সঙ্গে বলিতেছেন যে,

سَجِيَّــةٌ تِلْكَ فِيْهِمْ غَيْــرُ مُحْــدَثَــةٍ   اِنَّ الْخَــلَائِقَ فَاعْلَمْ شَرُّهَــا الْبِــدَعُ

'এই সমস্ত গুণাবলী কুরাইশদের মধ্যে নূতন উৎপন্ন হয় নাই; বংশ পরানুক্রমে তাঁহারা এই ধরনের মহৎ গুণাবলীর মালিক।'

অতঃপর বনী তামীমের প্রশংসাবাদে তামীমী কবি যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছিল, তৎসমূহের প্রতি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতকরত বলিতেছেন—

اِنْ كَانَ فِى النَّاسِ سَبَّاقُوْنَ بَعْدَهُمْ   فَكُــلُّ سَبْــقٍ لِاَدْنٰــى سَبْــقِهِمْ تَبَــعُ

'তাঁহাদের (কুরাইশদের) পরে যদি জনসমাজে কেহ অগ্রগামী হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেক অগ্রগতি কুরাইশদের অগ্রগতির অনুগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

কবি প্রশংসোক্তির পর বলিতেছেন—

اَكْــرِمْ بِقَــوْمٍ رَسُــوْلُ اللهِ شِيْعَتِهِمْ   اِذَا تَفَــاوَتَــتِ الْاَهْــوَاءُ وَالشِّــيَــعُ

অর্থাৎ, যখন স্থান ও সমাজ ভেদে মানুষের আচার-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, তখন তোমাদের কর্তব্য—যিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্প্রদায়ের সম্মান ও তাবেদারী করা। —তারিখে ইবনে-কাইয়্যেম ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৩

www.nagorikpathagar.org

আমরা বনী তামীমের প্রতিনিধিদলের মূল ঘটনা উর্দু এশাআতে ইসলাম প্রণেতার বর্ণনা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি। মাদারেজুন্ নবুওয়ত ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, বনী তামীম সম্প্রদায় এই প্রতিযোগিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 'যাকাত' বা ইসলামী টেক্স আদায়কারী তাহাদের নিকট গিয়া অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই অপরাধে কিছু লোককে বন্দী করিয়া রাজধানীতে (মদীনায়) আনয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিনিধিদল কয়েদীগণকে মুক্ত করিয়া নিতে মদীনায় আসিয়াছিল। যাহা হউক, প্রতিযোগিতার পূর্বে তাহাদের ইসলাম গ্রহণের কথা সত্য হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্বে তাহাদের ঈমান দৃঢ় হয় নাই। ঈমানে ত্রুটি না থাকিলে তাহারা যাকাত দিতে নারায হইত না; আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করিতেও আসিত না। সুতরাং বলা চলে যে, উল্লিখিত প্রতিযোগিতার পরই তাহারা ইসলামের সত্যতা সম্যক উপলব্ধিকরত বিশুদ্ধভাবে ঈমান আনিয়াছিল।

বনী আসাদের প্রতিনিধিদল ঃ

বনী আসাদের পক্ষ হইতে কতিপয় প্রতিনিধি মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনায় উপস্থিত হইল। আরবদেশে বিশেষরূপে আরবের গ্রামাঞ্চলে সরলতার প্রাবল্য ছিল। আগত দল সরলতা নিবন্ধন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলিতে লাগিল, 'দেখুন, আপনি আমাদের নিকট লোক পাঠানোর পূর্বেই আমরা মুসলমান হইতে চলিয়া আসিয়াছি।' একথায় তাহাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, ইহাতে নিশ্চয়ই তাহাদের বে-আদবী প্রকাশ পাইয়াছিল। কারণ, মুসলমান হইতে আসায় হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাহাদের অনুগ্রহ প্রকাশ পায় নাই; বরং ইহা তাহাদেরই শুভ অদৃষ্টের পরিচায়ক। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের পাহাড় ছিলেন। বিশেষরূপে নবাগত মানুষের প্রতি তাঁহার দয়া ও ধৈর্যের অন্ত ছিল না। তিনি তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাহাদিগকে তাম্বীহ্ করার জন্য তৎক্ষণাৎ এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ط قُلْ لَّاتَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ج بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ ○

"(হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) তাহারা ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারে আপনার প্রতি নিজেদের অনুগ্রহ দেখাইতে চাহে। আপনি বলিয়া দিন, ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে যাইও না। ইহাতে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ পায় না; বরং ঈমানের দিকে পথ দেখাইয়া তোমাদের প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

—সূরা-হুজুরাত, রুকূ ২

ইহাতে একথাও বুঝা গেল যে, বলপূর্বক কাহারও মনে ঈমান সৃষ্টি করা চলে না। কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই ঈমান লাভ হইয়া থাকে।

আরবের অন্তর্গত হিমিয়ার নামক সম্প্রদায়ে ছোট ছোট রাজা বা সরদার অবস্থান করিতেন। এ বৎসর তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে পত্রসহ কাসেদ পাঠাইয়া সালাম আরয করিলেন।

www.nagorikpathagar.org

নাজরানবাসী নাসারা প্রতিনিধি দলঃ

এই বৎসরই হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামন প্রদেশের অন্তর্গত নাজরানের খৃষ্টানগণের নিকট এক পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে ইসলামের আহবান জানাইলেন। নাজরানের শ্রেষ্ঠ পাদরীর নিকট হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পৌঁছিলে তিনি তাহা পাঠকরত অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, শুরাহবিল পাদরীকে আহবানকরত পত্র পড়িতে দিলেন এবং এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুরাহবিল বলিলেন, আমাদের কিতাবে লিখিত আছে, ইবরাহীমের পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে শেষ নবী জন্মগ্রহণ করিবেন। সুতরাং পত্র প্রেরক সেই নবী হওয়া অসম্ভব কথা নহে। অতএব, এ বিষয়ে ভালরূপে খবর না লইয়া কিছুই বলা যায় না। এইভাবে একে একে কয়েকজন পাদরীকে ডাকান হইলে তাহারা সকলেই একই কথা বলিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠ পাদরী গীর্জার উপরে ঘন্টা ধ্বনিকরত দেশের সমস্ত জনসাধারণকে একত্রিতকরত পত্রের কথা জ্ঞাপন করিলেন। বহু আলোচনার পর ঠিক হইল যে, একদল প্রতিনিধি মদীনায় পাঠান হউক, তাহারা যথাযথ খবর লইয়া আসিলে পর যাহা ভাল হয় করা হইবে। পরামর্শানুসারে পাদরী আবদুল মসীহের নায়কত্বে ষাটজন প্রতিনিধির একটি দল মদীনায় প্রেরণ করা হইল। দলের মধ্যে নাজরানের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান সম্প্রদায় ছিলেন। তন্মধ্যে শুরাহবিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে শুরাহবিল, জাব্বার ইবনে কায়েস, আয়হাম এবং আবুল হারেস ইবনে আলকমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবুল হারেস স্বীয় জ্ঞান গরীমার কারণে সমগ্র খৃষ্ট জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রোমের খৃষ্টান রাজগণ তাহার জন্য বিভিন্ন গীর্জা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিবিধ সম্মানে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌঁছিয়া পোশাক পরিবর্তনকরত বহুবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের পরিধানে নকশীদার রেশমী কাপড় এবং হাতে স্বর্ণ নির্মিত আংটি ছিল। তাহারা মসজিদে পৌঁছিয়া হযরত নবী করীম (দঃ)-কে সালাম বলিলে তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। তৎপরে আগন্তুকগণ কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বলিলেন না। এই সময় নাসারাদের নামাযের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা পূর্ব দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে উদ্যত হইল। নাসারাদের কেবলা পূর্ব দিকে; কিন্তু মদীনার মুসলমানদের কেবলা, দক্ষিণ দিকে। মুসলমানগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে চাহিল; কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তাহারা যে দিকে মুখ করিয়াই নামায পড়িতে চাহে পড়িতে দাও।' নামাযান্তে প্রতিনিধি দল বাহিরে চলিয়া আসিল। হযরত ওসমান এবং আবদুর রহমানের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ছিল। তাঁহারা অন্ধকার যুগে ব্যবসায় উপলক্ষে ইয়ামনে যাতায়াত করিতেন। প্রতিনিধিদল তাঁহাদের খোঁজ করিয়া সাক্ষাৎ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, 'আপনাদের পয়গম্বর আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে আমরা উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু তিনি আমাদের সাথে কোন কথাই বলিতেছেন না। আপনারা এ বিষয়ে কি বলেন? আমরা কি ফিরিয়া চলিয়া যাইব?' সাহাবীদ্বয় একথার কারণ বুঝিতে না পারিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস তাহারা সোনার আংটি এবং মৃত্তিকাচুম্বি রেশমী পোশাক পরিবর্তনকরত ভ্রমণের সাধারণ বেশ ধারণে উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই তিনি কথা বলিবেন। প্রতিনিধিদল তাহাই করিল। এবার

www.nagorikpathagar.org

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সালামের প্রত্যুত্তর দিলেন এবং মন খুলিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তাহারা প্রথমবার যখন আমার নিকট আসিয়াছিল, তখন তাহাদের সঙ্গে শয়তান আসিয়াছিল; এজন্যই আমি তাহাদের সঙ্গে কথা বলি নাই।'

অতঃপর তাহারা ধর্ম সম্পর্কে বহুবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিল, হযরত (দঃ) সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'আমরা হযরত ঈসা মসীহ্‌কে মা'বূদ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং তাঁহার বন্দেগী করিয়া থাকি। আপনিও কি আমাদিগকে আপনার বন্দেগী করার প্রতি আহবান করিতেছেন?' হযরত (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, 'আমি নিজেও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করি না; লোকদিগকেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের এবাদত শিক্ষা দেই না। আমি তওহীদের শিক্ষা দিতেই প্রেরিত হইয়াছি।' তৎপরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, 'এ বিষয়ে আমি এখন কিছুই বলিতে পারি না। তোমরা আজ অপেক্ষা কর, এ বিষয়ে যে রকম প্রত্যাদেশ হয় কাল শুনাইয়া দিব।' তাহারা পর দিন প্রাতে দরবারে উপস্থিত হইল। এ বিষয়ে দুই সাক্ষাতের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে শুনাইয়া দেওয়া হইল।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

"নিশ্চয়ই, ঈসা (আঃ) আদম (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত; (আল্লাহ্ তা'আলা) আদমকে মাটি দ্বারা প্রস্তুত করিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিলেন, 'হইয়া যাও', তখন তিনি জীবিত মানুষ হইয়া গেলেন। ইহাই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য কথা। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।" —সূরা আলে-এমরানঃ রুকূ ৬

মানুষ জন্মগ্রহণ করিতে পিতা ও মাতার আবশ্যক হয়। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মের বাহিরে আদম (আঃ) মা-বাপ ব্যতীত পয়দা হইয়াছেন, আর ঈসা (আঃ) হইয়াছেন বাপ ছাড়া। এই হিসাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হযরত আদম (আঃ)-এর জন্মের অনুরূপ।

খৃষ্টানগণের বিশ্বাস হযরত ঈসা খোদার পুত্র। ধর্ম বিশ্বাসের এই অঙ্গই খৃষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের বড় মতভেদ। এজন্যই নাজরানের নাসারাগণ অন্যান্য প্রশ্নের পর হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়াছিল। এই আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে যে, এরূপ স্পষ্ট কথার পরও যদি তাহারা বাঁকা চাল পরিত্যাগ না করে, তবে তাহাদিগকে 'মোবাহালা' করিতে আহ্বান কর।

দুই দলের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতভেদ হয় এবং দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের ভিতরে তাহার মীমাংসা না হয়, তবে উভয় পক্ষ নিজের পুত্র কন্যা ও পরিজনসহ খোলা মাঠে একত্রিত হইয়া উভয় দল এরূপ দো'আ করিবেঃ যেপক্ষ অন্যায় পথে আছে, তাহাদিগকে যেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন, তাহারা যেন ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাকেই মোবাহালা বলা হয়।

প্রাতে নাসারাগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রত্যাদেশ শুনাইয়া দেওয়া হইল। তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে চলিয়া গেল। পর দিন হযরত নবী করীম (দঃ) আয়াতের

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশ মত হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান এবং হোসাইনকে সঙ্গে লইয়া মোবাহালা করিতে বাহির হইলেন। পাঠক, একবার ভাবিয়া দেখুন, কি প্রাণস্পর্শী দৃশ্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত! সম্মুখে নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এক হাতে শিশু হোসাইনকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন, অপর হাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাসানের হস্ত ধারণ করিয়াছেনঃ পশ্চাতে বিবি ফাতেমা যাহ্‌রা পিতার সঙ্গেসঙ্গে চলিয়াছেন, তৎপশ্চাতে হযরত আলী। এই পবিত্র নূরানী পঞ্চদেহ বা 'পাঞ্জাতন পাক' মুক্ত আকাশের নীচে চারি দিক আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সত্য অসত্যের চূড়ান্ত মীমাংসা করার নিমিত্ত। এই মীমাংসা উল্লিখিত পাঁচ ব্যক্তি ও নাজরানের নাসারাদের মধ্যে নহে; বরং ইহা সমগ্র খৃষ্টান জগৎ ও সমগ্র মুসলিম জগতের মীমাংসা। বর্তমান খৃষ্টান জগৎ এই মোবাহালা সম্বন্ধে যাহাই বলে—বলুক। আসুন, আমরা নাজরান হইতে আগত ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ কি বলিতেছে তাহাই শ্রবণ করি।

فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَالُوْا هٰذِهٖ وُجُوْهٌ لَّوْ اَقْسَمَتْ عَلَى اللهِ اَنْ يُّزِيْلَ الْجِبَالَ لَاَزَالَهَا

'তাহারা পাঞ্জাতন পাকের পবিত্র নূরানী চেহারাসমূহ দেখিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এই চেহারাগুলি দেখিতেই বুঝা যায় যে, তাহারা যদি পর্বতশ্রেণীকে স্থানচ্যুত করিতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিবেন।'

—তারিখে ইবনুল-আসির, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১২

ফলকথা, সর্বপ্রথম তাহারাই মোবাহালার প্রস্তাব করিয়াছিল। এক্ষণে ভীত হইয়া এই সংকল্প পরিত্যাগ করিল। এইভাবে তাহাদের নিকট ইসলামের বাস্তবতা ও শেষ নবীর সত্যনিষ্ঠতা মধ্যাহ্ন ভাস্করসম সুপ্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা আভিজাত্যের মোহে ইসলাম ধর্ম হইতে সম্প্রতি বঞ্চিত রহিল। তাহারা হযরত (দঃ)-এর নিকট মোবাহালা হইতে অব্যাহতি চাহিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল। হযরত (দঃ)-ও সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। শর্তাবলী সম্পর্কে কথাবার্তা হইলে তাহারা বলিল, 'আগামী দিন ভোরের সময় পর্যন্ত আপনি বিবেচনা করিয়া যে সমস্ত শর্ত ঠিক করিয়া দিবেন আমরা দ্বিধাহীনভাবে তাহাতেই রাজি হইব। পরদিন প্রাতঃকালে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহাদের হাতে একটি সন্ধিপত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল—

لايغيروا مما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم

'তাহারা (নাসারাগণ) যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা হইবে না। তাহাদের অর্থনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় অধিকার এবং তাহাদের ধর্ম অক্ষুন্ন থাকিবে।'

—তারিখে ইবনে কাইয়্যেম, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তাহারা অনুরোধ করিল যে, আপনার সহচরদের মধ্য হইতে একজন বিশ্বাসী লোককে আমাদের সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিন। তিনি আমাদের মধ্যকার বিচার ব্যবস্থা করিবেন। তাহাদের অনুরোধ মত প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু ওবায়দা (রাঃ) নাজরানে প্রেরিত হইলেন।

প্রতিনিধিদল স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকরত দেশবাসীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং সন্ধিপত্র পড়িয়া শুনাইল। প্রতিনিধিবৃন্দ অমুসলমানাবস্থায় দেশে ফিরিয়া গেলেও তাহাদের

www.nagorikpathagar.org

অন্তরে সত্য ধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হযরত নূর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌম্যমূর্তি ও আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাহাদের একথা বুঝিতে মোটেই বাকী ছিল না যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যে শেষ নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ্‌র কথা লিখিত আছে, ইনিই সেই নবী।

সত্যের আকর্ষণে অত্যল্পকাল মধ্যেই আবদুল মসীহ এবং আয়হাম পুনরায় মদীনায় আসিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষালাভ করিলেন। তৎপর অন্যান্য মহাত্মাগণও ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকেন।

—মাদারেজ

নাজরানবাসী নাসারা প্রতিনিধিদলের ঘটনা হইতে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানিতে পারিলাম।

(১) নাসারাগণ মসজিদে নববীর ভিতরেই হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়াছিল। অন্যান্য যত ডেপুটেশন আসিত তাহারাও মসজিদেই সাক্ষাৎ করিত। এই সূত্রে ফকীহ আলেমগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে অমুসলমানগণ মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ নাই।

(২) মোবাহালার আয়াত ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কাজে বুঝা যায়, কোন ভ্রান্ত মতাবলম্বী যদি প্রমাণাদি দেখিয়াও স্বমতে অটল থাকিতে চাহে; এরূপাবস্থায় আবশ্যক হইলে তাহাদের সঙ্গে মোবাহালা করা শরীঅত সম্মত কাজ। যেহেতু হযরত (দঃ) নিজেই মোবাহালা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, অথচ তিনি এমন কথা বলেন নাই যে, এই আদেশ উম্মতের জন্য নহে। একবার হযরত (দঃ)-এর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসও কোন মাসআলায় মতভেদের কারণে প্রতিপক্ষকে মোবাহালা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে কেহই একথার প্রতিবাদ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, সাহাবাগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ফকীহ সুফিয়ান সওরী ও ইমাম আওযায়ীর মধ্যে এক মাসআলায় মতভেদ ছিল। এ বিষয়ে ইমাম আওযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোবাহালার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। এই সময়েও কেহ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। —যাদুল মা'আদ

(৩) মুসলমানদের দলপতি যদি সঙ্গত মনে করেন, তবে বিধর্মিগণের সঙ্গে তাহাদের ধর্মের স্বাধীনতা বহাল রাখিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন। সাধারণত ইসলামী জেহাদে যে উদ্দেশ্য মনে করা হয়; উহার সঙ্গে এ রকম সন্ধির মোটেই মিল হয় না। জেহাদের উদ্দেশ্য যদি বলপ্রয়োগে মুসলমান করা হইত, তবে এরূপ সন্ধির কি সার্থকতা ছিল? হযরত নবী করীম (দঃ) ও মুসলমান -গণ ইচ্ছা করিলে সহজেই নাজরানের নাসারাদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য বলপ্রয়োগ অথবা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারিতেন। ইয়ামন প্রদেশের গভর্নর বাযান পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খালেদ ইবনে ওলীদের প্রচারে ইয়ামনের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কি নাজরানের ভিতরেও বহু সংখ্যক পৌত্তলিক মুসলমান হইয়াছিল। ফলকথা, এই অঞ্চলে ইসলামের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়তা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ইসলাম ধর্মে যদি ধর্ম প্রচার ব্যাপারে অন্ধ গোড়ামি থাকিত, তবে নাজরানবাসী খৃষ্টানগণের পক্ষে নিজেদের ধর্ম পালন করা নিতান্ত কষ্টকর হইত। এরূপাবস্থায় পয়গম্বর (দঃ) তাহাদিগকে ধর্ম বিষয়ক স্বাধীনতা দেওয়া কতদূর উদারতার পরিচায়ক, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারে। আমরা পুস্তকের প্রথমাংশে মূলগত আলোচনায় বিষয়টি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

www.nagorikpathagar.org

(৪) আমরা একথাও লিখিয়াছি যে, মুসলমানদের সত্যনিষ্ঠতা, সরলতা তথা চরিত্রগত গুণাবলী ইসলাম প্রচারের অন্যতম উপকরণ। কিন্তু পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা এই পুস্তকের মূল বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ঘটনাটি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিধর্মিগণ মুসলমানদের চরিত্র বলের প্রতি কতদূর আস্থাবান ছিলেন। নাসারা প্রতিনিধিগণ স্বধর্মে বহাল থাকা সত্ত্বেও হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুরোধ করিতেছে যে, তাহাদের জন্য যেন একজন মুসলমান বিচারক পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বুঝা যায়, খৃষ্টানগণ মুসলমানদের ধর্মনিষ্ঠতা ও সুবিচারের প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান ছিল। তৎসঙ্গে একথাও প্রকাশ পাইল যে, নিজেদের ধর্মনিষ্ঠতা সম্বন্ধে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদের প্রতি এই বিশ্বাস ও ভক্তি যে পরিণামে তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

হামদানের প্রতিনিধিদল ঃ

বায়হাকী বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রদেশের হামদান সম্প্রদায়ের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। খালেদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ উক্ত স্থানে ছয় মাস পর্যন্ত তবলীগের কাজ চালাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের কেহই ইসলাম গ্রহণ করে নাই। অতঃপর হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাঃ)-কে এক পত্রসহ পাঠাইয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বনী হামদানের নিকট পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তৎক্ষণাৎ তথাকার সমস্ত বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরত আলী (রাঃ) এই সংবাদ মদীনায় পাঠাইলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শুভসংবাদ শ্রবণে শোকরিয়ার সজদা আদায়করত তিনবার বলিলেন اَلسَّلَامُ عَلٰى هَمْدَانَ 'হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।' —মাদারেজ

ইসলাম গ্রহণের পর একদল হামদান প্রতিনিধি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মালেক ইবনে নমতে হামদানী হযরত (দঃ)-এর প্রশংসাবাদে একটি কবিতা পাঠ করিলেন। হযরত (দঃ) সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের জন্য এক নসীহতনামা লিখিয়া দিলেন এবং মালেককে তাহাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

ইসলাম গ্রহণের সময় হইতেই হামদান সম্প্রদায় হযরত আলী (রাঃ)-এর অত্যন্ত ভক্ত হইয়াছিল। হযরত আলী (রাঃ)-ও তাহাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও ভালবাসা পোষণ করিতেন। উত্তরকালে হযরত মুআবিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল, সে সময় হামদান সম্প্রদায় আগাগোড়া হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিলেন। হযরত আলী নিজে একজন কবি ছিলেন। তিনি হামদানের প্রশংসাবাদে এক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং উহার এক পংক্তি এই—

فَلَوْ كُنْتُ بَوَّابًا عَلٰى بَابِ جَنَّةٍ   لَقُلْتُ لِهَمْدَانَ اُدْخُلُوْا سَلَامًا

'আমি যদি বেহেশতের দারোয়ান হইতাম; তবে হামদানীদিগকে বলিতাম যে, শান্তির সহিত প্রবেশ কর।'

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত ঘটনা হইতে ইসলাম প্রচার ব্যাপারে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি যে, প্রচারকের মধ্যে চরিত্রবল ও আধ্যাত্মিক শক্তি যত অধিক থাকিবে, প্রচার কার্যও তত শীঘ্র ফলপ্রসূ হইবে। হযরত খালেদের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্তু হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ) বাল্যাবধি রাসূল মকবূলের সাহচর্য দ্বারা যে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? এক দিকে রাসূল করীম (দঃ)-এর রূহানী তাওয়াজ্জুহ মিশ্রিত পত্র তৎসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)-এর মত সাহাবীর উপদেশ—সুতরাং হযরত খালেদ ছয় মাসে যে কাজ সমাধা করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা অত্যল্পকালেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল।

বনী ত্বাই প্রতিনিধিদল ও
আদি ইবনে হাতেমঃ

অনন্য সাধারণ দাতা হাতেম ত্বাই-এর পুত্র আদি 'ত্বাই' বংশের রাজা বা সরদার ছিলেন। তিনি পৈতৃক ধর্ম পৌত্তলিকতা বর্জনকরত খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্বাই সম্প্রদায়ে একটি বড় রকমের প্রতিমা রক্ষিত ছিল। সেখানের সমস্ত লোক উহার পূজা করিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আলী (রাঃ)-কে এই মূর্তি বিনষ্ট করার জন্য পাঠাইলেন। হাতেমের পুত্র আদি সংবাদ শুনিয়াই শামদেশে খৃষ্টান রাজত্বের ভিতরে পলায়ন করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) কর্তব্য সমাধা করত ত্বাই বংশের কতিপয় লোককে মদীনায় হযরত (দঃ)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। তৎসঙ্গে হাতেম ত্বাই-এর কন্যাও আসিল।

হাতেম ত্বাই তৎকালেও দেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলিয়াছিলেন, 'আমি শ্রেষ্ঠ দাতার সময়ে এবং শ্রেষ্ঠ সুবিচারক রাজার রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' এস্থলে দাতা শব্দ দ্বারা হাতেম ত্বাইকে এবং সুবিচারক দ্বারা পারস্য সম্রাট নওশিরওয়াঁকে বুঝান হইয়াছিল। হাতেম ত্বাইর কন্যা মদীনায় পৌঁছিলে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। হাতেম দুহিতা রাসূলুল্লাহ্‌র দরবারে তাহার ভাই-এর জন্য সুপারিশ করিল এবং ভ্রাতাকে আনয়ন করার জন্য শাম দেশে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন।

হাতেমের পুত্র হযরত আদি বলেন, আমার ভগ্নী শাম দেশে পৌঁছিয়া পলায়ন করার জন্য আমাকে তিরস্কার করিল এবং কহিল যে, তুমি হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চল, ইহাতে তোমার হিত ছাড়া অহিত হইবে না। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মদীনায় পৌঁছিলাম এবং হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম আরযকরত স্বীয় পরিচয় দিলাম। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অমায়িকভাবে আমাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় বাসভবনের দিকে চলিলেন। রাস্তায় এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হইল। বৃদ্ধা তাঁহাকে অনেকক্ষণ রাস্তায় খাড়া রাখিয়া কথা বলিতে লাগিল। বৃদ্ধার কথাবার্তা শেষ হইলে আমাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে বিছানায় বসাইয়া নিজে মাটিতে বসিলেন। আমি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বীয় রাজত্ব কায়েম করার জন্যই এই চেষ্টা-চরিত্র করিতেছেন; নাকি সত্যই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল।

www.nagorikpathagar.org

এক্ষণে আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম যে, 'তাঁহার মধ্যে আত্ম প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণই নাই; তাঁহার প্রকৃতিও রাজা-বাদশাহের প্রকৃতি নহে, তিনি কখনও বাদশাহ নহেন।'

—তারিখুল কামেল, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১৪

অনন্তর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আদি! তুমি মুসলমানদের আর্থিক দৈন্য, শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও ঐশ্বর্য দৃষ্টে ইসলাম গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছ? আল্লাহ্‌র শপথ! মুসলমানদের এমন এক দিন আসিবে, যখন তাহাদের অর্থ দান করার উপযুক্ত পাত্র দরিদ্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তখন এ রকম শান্তি স্থাপিত হইবে যে, একটি স্ত্রীলোক কাদসিয়া নগর হইতে বায়তুল্লাহ্‌র যেয়ারতের উদ্দেশ্যে একা মক্কায় চলিয়া আসিবে, অথচ তাহার মনে আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ভয় থাকিবে না। তুমি ইহাও শুনিতে পাইবে যে, পারস্যের শ্বেত প্রাসাদ মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এই কথোপকথনের পর আদি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন।'

হযরত আদি বলেন, আমি নিজের জীবনেই পারস্যের অন্তর্গত ভুবন-প্রসিদ্ধ শ্বেত প্রাসাদ অধিকৃত হইতে দেখিয়াছি। ইহাও দেখিয়াছি যে, একটি স্ত্রীলোক সঙ্গীবিহীন অবস্থায় কাদসিয়া হইতে নির্ভয়ে মক্কায় হজ্জ করিতে আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র শপথ, তৃতীয় কথাও নিশ্চয়ই হইবে অর্থাৎ, মুসলমানদের মালদৌলত এত বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহা গ্রহণ করার মত লোক থাকিবে না।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, কি রকম সরল কথাবার্তা ও বিনম্র ব্যবহারের ভিতর দিয়া ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল। সামান্য কয়েক মিনিটের সাহচর্য ও আলাপ-আলোচনায় অন্তর্বিশ্বাসের এমন পরিবর্তন কেবল ইসলাম প্রচারের ইতিহাসেই পাওয়া যাইবে। আদি ইবনে হাতেমের ব্যক্তিত্ব সাধারণ ছিল না। তিনি প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের পুত্র হওয়ার কারণে সকলের নিকট সম্মানিত ছিলেন। তিনি সম্প্রদায়ের সরদার বা বাদশাহ ছিলেন; বুদ্ধিমত্তায় স্বস্থানে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর ত্বাই বংশে ইসলামের বহুল প্রচার হইয়াছিল। এই ঘটনার পর কিছুদিনের মধ্যেই যায়েদ খায়লের সঙ্গে একদল প্রতিনিধি মদীনায় আসিয়া সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করে।

আদির সঙ্গে রাসূল মকবূল (দঃ)-এর যে কথাবার্তা হইয়াছিল, ইহাতে একথা হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই কষ্টকর নহে যে, মুসলমানদের আর্থিক নিঃসম্বল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও হযরত (দঃ) আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপরে কতদূর অটল বিশ্বাস রাখিতেন। এই বিশ্বাসের মূলে কোন বাহ্যিক উপলক্ষ্য মোটেই ছিল না। মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে কেহই একথা অনুমান করিতে পারিত না যে, পারস্যের শ্বেত প্রাসাদ তাহারা দখল করিতে পারিবে। কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল, আল্লাহ্‌র সত্য নবী এই ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাসকরত একজন বিধর্মীর নিকট নিঃসঙ্কোচে একথা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রোতাও একথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন এবং স্বধর্ম ত্যাগে ইসলাম গ্রহণ করিতেছেন। অত্যল্পকাল মধ্যে সেই অসম্ভব কথাও কার্যে পরিণত হইতেছে। ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে এতদপেক্ষা সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

এই ঘটনায় একথাও বুঝা গেল যে, মালদৌলত প্রকৃত উন্নতির সহায় নহে। যখন মুসলমান-গণের নিকট দৈনন্দিন কাজ সমাধা করার মত অর্থ ছিল না, তখনই তাঁহারা প্রকৃত উন্নতি করিয়াছিলেন। আবার যখনই তাহাদের ধনৈশ্বর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনই তাহাদের ঈমানের বল বহুলাংশে লোপ পাইয়াছিল; ফলে তাহাদের প্রকৃত উন্নতিও ব্যাহত হইয়াছিল।

www.nagorikpathagar.org

বনী আমের প্রতিনিধি দল ঃ

এই বৎসরই বনী আমের সম্প্রদায়ের একদল প্রতিনিধি মদীনায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে আমের ইবনে তোফায়েল, আরবাদ ইবনে কায়েস এবং খালেদ ইবনে জা'ফর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল। আমেরকে তাহার সম্প্রদায় বলিল, 'আরবের সমস্ত গোত্র মুসলমান হইতেছে, চলুন আমরাও ইসলাম গ্রহণ করি।' আমের বলিল, 'অন্যেরা যাহা করে করুক, কিন্তু আমি কিছুতেই এই ব্যক্তির বশ্যতা স্বীকার করিব না।'

আমেরের জীবন ইতিহাস অত্যন্ত কালিমালিপ্ত ছিল। একবার সে ধোঁকায় ফেলিয়া সত্তরজন ইসলাম প্রচারককে নিহত করিয়াছিল। এখনও তাহার মদীনায় আগমন সদুদ্দেশ্যে ছিল না। পথে আমের তাহার বন্ধু আরবাদকে বলিল, 'মদীনায় পৌঁছিলে আমি লোকটির [হযরত (দঃ)-এর] সঙ্গে কথা বলিতে থাকিব, তুমি পশ্চাৎদিকে তরবারি নিয়া খাড়া থাকিবে; সুযোগ বুঝিয়া তাহার উপর তরবারির আঘাত করিবে।'

মদীনায় পৌঁছিয়া আমের হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত হইল এবং আরবাদ পূর্ব পরামর্শ মত হযরত (দঃ)-এর পশ্চাৎ দিকে দণ্ডায়মান হইল। উপস্থিত হইয়াই প্রতিনিধি দল হযরত (দঃ)-এর প্রশংসাবাদ স্বরূপ বলিল, 'আপনি আমাদের সরদার ও আমাদের মধ্যে শক্তিমান।'

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন, এই সমস্ত কথার ভিতরে চাটুকারিতা ভিন্ন সারবস্তু কিছুই নাই। তিনি প্রতিনিধি দলকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'তোমাদের উদ্দেশ্য সোজা কথায় বলিয়া ফেল।'

আমের বলিল, 'আমাকে আপনার বন্ধুর মধ্যে গণ্য করুন।'

হযরত (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, 'সত্য ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি আমার বন্ধু হইতে পার না।'

আমের বলিল, 'আমি মুসলমান হইলে আমার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন?'

হযরত (দঃ) বলিলেন, 'যেমন সমস্ত মুসলমানের সঙ্গে করা হয়।'

আমের বলিল, 'আমাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করিবেন প্রতিজ্ঞা করুন।'

হযরত (দঃ) ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন; এইভাবে অনেক কথা কাটাকাটি চলিল। আমের কথা প্রসঙ্গে উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'মনে রাখিবেন, আমি শীঘ্রই বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণ করিব।' অতঃপর তাহারা বাহিরে চলিয়া আসিল। আমের সঙ্গী আরবাদকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'এমন সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও তুমি তাহা হেলায় হারাইলে।' আরবাদ বলিল, 'যখনই আমি তরবারি উত্তোলন করিতে চাহিতাম, তখনই তুমি আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতে। তবে কি আমি মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরিবর্তে তোমাকেই বধ করিতাম?'

তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া চলিল। আমেরের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার প্রত্যুত্তরস্বরূপ হযরত (দঃ) দো'আ করিয়াছিলেন, 'আল্লাহ্! আমাকে আমেরের শত্রুতা হইতে রক্ষা কর।' এখন হযরত (দঃ)-এর দো'আর ফল প্রকাশ পাইল। পথিমধ্যে আমেরের প্লেগ রোগ দেখা দিল। সে নিঃসহায় অবস্থায় এক সলুল বংশীয়া স্ত্রীলোকের গৃহে প্রাণ হারাইল। প্রাণ বিয়োগকালে আমের আক্ষেপ সহকারে বলিতেছিল—

اَغُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيْرِ وَالْمَوْتُ فِىْ بَيْتِ سَلُوْلِيَّةٍ ○

www.nagorikpathagar.org

'হায়, আমার অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল যে, উটের মত প্লেগের গিল্‌টিতে এক সালুলী স্ত্রীলোকের ঘরে প্রাণ হারাইতে হইল!'

আরবাদ স্বদেশের নিকটে পৌঁছিলে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'সংবাদ কি?' দুষ্ট চূড়ামণি আরবাদ বলিল, 'মুহাম্মদ (দঃ) আমাদিগকে এমন জিনিসের বন্দেগী করিতে বলিতেছেন, যাহাকে নিকটে পাইলে তীর দ্বারা মারিয়া ফেলিতাম।' একথা বলার এক দিন কি দুই দিন পরেই তাহার উপর বিদ্যুৎপাত হয় এবং সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমের ইবনে তোফায়লের ঘটনায় আমাদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

সানাতুল ওফুদ বা প্রতিনিধিদল-বৎসরে আরবের প্রায় সমস্ত গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। হিময়ারের বাদশাহগণও পত্র দ্বারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় আমের মাত্র দশজন সঙ্গীসহ মদীনা আক্রমণ করার ভয় দেখাইতেছে; কিন্তু হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য মাত্রও ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের আদর্শে ধৈর্য, বিনয় ও সদয় ব্যবহারের মর্যাদা যতখানি, কাঠিন্যের মর্যাদা ততখানি নহে।

হযরত নবী করীম (দঃ)-কে আবশ্যকীয় সমস্ত ছোট বড় ঘটনা জ্ঞাত করান হইত; একথা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, আমেরের এই অসৎ অভিপ্রায় তিনি জানিতেই পারেন নাই। নিশ্চয় তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা বশতঃ তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। সত্যের জয় যে অনিবার্য; বিপক্ষের শত চেষ্টায়ও যে সত্য ব্যাহত হইবে না, একথার প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহার আদর্শ ছিল—যে যেভাবেই ইসলামের সত্যতা বুঝিতে চাহে; তাহাকে সেভাবেই বুঝিতে দেওয়া হইবে। আমের ভাবিয়াছিল, স্বীয় চতুরতা দ্বারা সত্যকে পরাস্ত করিতে পারিবে। সুতরাং তাহাকে পূর্ণ ক্ষমতা ব্যয়করত মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হইল।

ফারওয়া প্রতিনিধিঃ

শাম দেশের অন্তর্গত মাআন নামক স্থানে রোম রাজ্যের অধীনস্থ এক শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ফারওয়া ইবনে আমর। ফারওয়া শেষ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং এক কাসেদ (দূত) মারফত হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে রোম সম্রাট সংবাদ পাইয়া ফারওয়াকে দরবারে আহ্বান করত তাহাকে ইসলাম পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু ফারওয়া কিছুতেই তাহাতে রাজি হইলেন না। সভাসদবৃন্দের পরামর্শ মত সম্রাট, ফারওয়ার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা জারি করিলেন। ফারওয়ার অন্তঃকরণে ঈমানের আলো এরূপভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র পথে হাসিমুখে প্রাণপাত করিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুকালে ফারওয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেনঃ

بَلِّغْ سَرَاةَ الْمُسْلِمِيْنَ بِاَنَّنِىْ   سِلَمٌ لِّرَبِّىْ اَعْظُمِىْ وَمَقَامِىْ

'মুসলমানদের দলপতিবৃন্দের নিকট এই সংবাদ বলিও যে—আমার অস্থি, আমার স্থান—যথাসর্বস্ব আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র অনুগত।' —ইবনে কাইয়্যেমকৃত যাদুল মা'আদ, ২য় খঃ পৃঃ ৪২

www.nagorikpathagar.org

ভাবিবার বিষয়—ফারওয়া নিজে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনও নাই, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার নিকট কোন লোক পাঠান নাই কিন্তু পরোক্ষভাবে সত্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ পাইয়াই তিনি ঈমান আনিতেছেন এবং এমন পাক্কা ঈমান আনিতেছেন যে, অকাতরে ধর্মের জন্য প্রাণ দান করিতেছেন। সত্যের আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুর আকর্ষণ মানুষকে এমনভাবে প্রাণ দানে প্রস্তুত করিতে পারে না। তৎসঙ্গে খৃষ্টান সম্রাটের আচরণে একথাও দেখা গেল যে, ইসলাম প্রচারে বাধাদান করিতে যাইয়া বিধর্মিগণ কি রকম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিল। আমরা প্রথমে বলিয়াছি, ইসলাম প্রচারে বলপ্রয়োগের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যাইবে না; কিন্তু বলপ্রয়োগে ইসলাম প্রচারে বাধাদানের অসংখ্য নমুনা ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে।

বনী সা'দের প্রতিনিধি দলঃ

এ বৎসরই বনী সা'দ নামক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যেমাম ইবনে সা'লাবার নায়কত্বে একদল প্রতিনিধি মদীনায় উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই ঘটনা সহীহ বোখারী এবং সহীহ মুসলিমেও বিবৃত হইয়াছে। বর্ণনাকারী ইবনে ইসহাক বলেন, যেমামের সঙ্গে যে প্রতিনিধি দল আগমন করিয়াছিল; তাহাদের চেয়ে উত্তম প্রতিনিধির কথা আমরা কখনও শুনি নাই।

যেমাম স্বীয় কথাবার্তার ভিতরে যে রকম সরলতার পরিচয় দিয়াছিল এবং হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ সাদাসিধাভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠে নিশ্চয়ই পাঠকগণ আনন্দানুভব করিবেন। সঙ্গেসঙ্গে একথাও বুঝিতে পারিবেন যে, যাহারা প্রকৃত সত্যান্বেষী তাহারা কখনও নিরর্থক বাগাড়ম্বর এবং অতিরঞ্জিত ব্যবহারের ধার ধারে না। আর সত্য প্রচারকও সরল ও সোজাভাবে সত্যকথা প্রকাশ করিতে তৎপর থাকেন। আমরা এস্থলে ইবনে কাইয়্যেম কৃত ইতিহাস পুস্তক 'যাদুল মা'আদ' হইতে যেমামের কথাবার্তা উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

যেমাম ইবনে সালাবা মদীনায় পৌঁছিয়াই মসজিদের দ্বারদেশে উট বাঁধিয়া রাখিয়া মসজিদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। হযরত নবী করীম (দঃ) সহচরবৃন্দ বেষ্টিতাবস্থায় মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। যেমাম উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র কে'?[১] রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তরে বলিলেন, 'আমিই আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।'

আবার প্রশ্ন হইল—'আপনার নাম কি মুহাম্মদ?'

উত্তর—'হাঁ'।

যেমাম তৎপরে বলিতে লাগিল, 'হে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র! শুনুন, আমি আপনাকে কঠিন শপথের সহিত কয়েকটি প্রশ্ন করিব। আপনি মনে কষ্ট পাইবেন না তো?'

হযরত (দঃ) বলিলেন, 'আমি সামান্য মাত্রও কষ্টানুভব করিব না; তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।'

যেমাম বলিল, 'আপনার মা'বূদ, আপনার পূর্ববর্তী লোকগণের মা'বূদ এবং আপনার পরবর্তী লোকদের মা'বূদ—আল্লাহ্‌র শপথসহ জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'তিনি কি আপনাকে আমাদের সকলের জন্য রাসূলরূপে পাঠাইয়াছেন?'

টীকা

১ আরবের প্রচলিত কথায় পৌত্র এবং তন্নিম্ন বংশধরকেও পুত্র বলা হয়।

www.nagorikpathagar.org

উত্তর—'আল্লাহ্‌র নামে বলিতেছি, হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।'

প্রশ্ন—'আপনাকে সেই আল্লাহ্‌র শপথসহ জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি আপনার মা'বূদ, আপনার সম্প্রদায়ের মা'বূদ, আপনার পরবর্তী লোকদের মা'বূদ—তিনি কি আপনাকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছেন? আমরা বংশানুক্রমে যে সমস্ত দেব-দেবীর পূজার্চনা করিয়া আসিতেছি, তাহাদিগকে বর্জন করার জন্যও কি আদেশ দেওয়া হইয়াছে?'

উত্তর—'আল্লাহ্‌র নামে বলিতেছি—নিশ্চয়ই এরূপ আদেশ হইয়াছে।'

অতঃপর যেমাম—নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং ইসলামের অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে উক্তরূপ হলফনামার অবতারণা করিতেও ভুলিল না। হযরত (দঃ)-ও প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও সরল উত্তর দিতে লাগিলেন। শ্রোতাগণও মনমুগ্ধের ন্যায় চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হইলে যেমাম শান্ত সরলভাবে বলিয়া উঠিল—

اِنِّىۤ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

'আমি দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই; একথার প্রতিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং আল্লাহ্‌র রাসূল।'

যেমাম স্বদেশে ফিরিয়া গেলে স্থানীয় সমস্ত লোক খবর জানিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট একত্রিত হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। যেমাম অন্য কথার উত্তর দেওয়ার পূর্বে প্রথমেই তাহাদের ইষ্ট দেবতা লাত এবং ওয্যার নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল। সকলে বলিল, সাবধান দেবতাকে মন্দ বলিও না; তোমার কুষ্ঠ ব্যাধি দেখা দিবে। যেমাম বলিল, শত আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় তোমরা এই মোটা কথাও বুঝিতে পারিতেছ না যে, এই পাথরের মূর্তিগুলি মানুষের কোন কাজেই আসিতে পারে না। ইষ্ট ও অনিষ্ট কেবল খোদা তা'আলা দ্বারাই হইতে পারে। আমরা অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম; আল্লাহ্‌ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছেন, নিজের কালামসহ রাসূল পাঠাইয়া আমাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন। এখন আর আমাদের অন্ধকার পথে চলা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আমি এই জ্বলন্ত সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়া মুসলমান হইয়াছি। তোমাদেরও কর্তব্য যে, বুত পরস্তি পরিত্যাগকরত এক আল্লাহ্‌র এবাদত গ্রহণ কর।

আশ্চর্যের বিষয়—যাহারা কিছুক্ষণ পূর্বে লাত এবং ওয্যা দেবতাকে হর্তা-কর্তা বলিয়া জানিত, তাহারাই যেমামের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনিয়া সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। এই অঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একজনও অংশীবাদী বাকী রহিল না।

যেমাম মাত্র সামান্য সময় হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ)-এর সংস্রবে ছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন প্রকার প্ররোচনা অথবা ভয় প্রদর্শন তো দূরের কথা ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে তেমন কোন বক্তৃতাও তাহাকে শুনান হয় নাই। যেমাম যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেগুলিরই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। ভাবিবার বিষয়, এই সামান্য কয়েকটি কথার মধ্যে এমন কি যাদুমন্ত্র নিহিত ছিল, যাহাতে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন! সত্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, তাহাই হইল ইহার প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ হইল, হযরত নবী করীম (দঃ)-এর সৌন্দর্য ও পবিত্র চেহারা স্মৃতি অকপট সরলতার নিদর্শন। মানুষ তাহার ভিতরকার

www.nagorikpathagar.org

কপটতা যতই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করুক না কেন, মুখমণ্ডলে উহার নিদর্শন নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্রূপ সরলতা এবং অকপটতার চিহ্নও মানুষের চেহারায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

যেমামের ইসলাম গ্রহণ যেমন ইসলাম ধর্মের সত্যতা এবং অসাধারণ আকর্ষণ শক্তির পরিচায়ক, তদ্রূপ তাঁহার গোত্রীয় লোকদের এত সহজে ইসলামে দীক্ষিত হওয়াও ইসলাম প্রচারের একটি নিখুঁত ও নির্মল চিত্র পট। হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমামের সঙ্গে কোন সৈন্যদল প্রেরণ করেন নাই, যাহার ভয়ে যেমাম সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। সামান্য কাল হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য দ্বারা যেমামের মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। যদ্দ্বারা তাঁহার সম্প্রদায়ের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ ক্ষণকাল মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ইসলাম ধর্মের এই অভাবনীয় সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয় শক্তিই ইসলাম প্রচারের প্রধান সহায়। বাহ্যিক শক্তি দ্বারা মানুষের হস্তপদ আবদ্ধ করা চলে, কিন্তু মানুষের মনের উপর তদ্দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা কখনও সম্ভবপর নহে। ইসলামের শক্তি বাহ্যিক নহে আভ্যন্তরীণ, এই আভ্যন্তরীণ শক্তি যাহারই ভিতর সামান্য মাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল, সে নিজেও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্যকেও সত্যের আলোর পথে টানিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহারা কেবল সামান্য সময় পবিত্র সাহচর্য লাভ করিয়াছিল তাহাদেরই এই অবস্থা। এখন বলুন, যাহারা সারা জীবন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী রহিয়াছেন, যাহারা ঘরে বাহিরে সর্বত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন; মুহূর্ত কালের বিরহও যাহাদের পক্ষে কষ্টদায়ক ছিল তাঁহাদের ঈমানের সরলতা এবং আধ্যাত্মিক আকর্ষণ শক্তি কিরূপ হইবে, সহজেই অনুমান করা চলে।

বনী হানীফা ও মোসায়লামা কায্যাবঃ

বনী হানীফার প্রতিনিধিদলসহ মোসায়লামা কায্যাব মদীনায় হাজির হইল। মোসায়লামার সঙ্গীগণ সদুদ্দেশ্য নিয়া আসিয়া থাকিলেও মোসায়লামার উদ্দেশ্য কিন্তু খারাপ ছিল। সে বলিত, 'মুহাম্মদ (দঃ) যদি আমাকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তাঁহার নবুওয়ত স্বীকার করিতে আমার কোনই আপত্তি থাকিবে না।' মোসায়লামা যখন তাহার বক্তব্য হযরত (দঃ)-এর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল; তখন হযরত (দঃ)-এর হাতে একটা খর্জুর শাখার লাঠি ছিল; তিনি লাঠিটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে আমার নিকট এই লাঠিটি পাইতে চাও, তাহাও তোমাকে দেওয়া হইবে না।' ফলকথা, মোসায়লামার সঙ্গীগণ ইসলাম গ্রহণ করিল, মোসায়লামাও বাহ্যিকভাবে ইসলামের ভান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া মোসায়লামা প্রচার করিতে লাগিল যে, 'মুহাম্মদ (দঃ) একাই নবী নহেন; আমিও নবুওয়তের অংশীদার।' অতঃপর কোরআন শরীফের অনুকরণে বাক্য রচনাকরত সেগুলি আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। সে তাহার অনুগামীদের জন্য নামায মাফ করিয়া দিল। মদ্যপান এবং ব্যভিচার সিদ্ধ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কতক তাবেদারও জুটিয়া গেল—

অনন্তর মোসায়লামা কায্যাব রাসূলে মকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক পত্র লিখিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার পত্রটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করা হইলঃ

www.nagorikpathagar.org

مِنْ مُسَيْلَمَـةَ رَسُــوْلِ اللهِ اِلٰى مُحَمَّــدٍ رَّسُــوْلِ اللهِ سَلاَمٌ عَلَيْـكَ اَمَّـا بَعْـدُ فَاِنِّىْ قَدْ اَشْـرَكْتُ فِى الْاَمْـرِ مَعَكَ وَاِنَّ لَنَا نِصْفَ الْاَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَ الْاَرْضِ وَلٰكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَّعْتَدُوْنَ ○

'আল্লাহ্‌র রাসূল মোসায়লামার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি—আপনার প্রতি সালাম; অতঃপর লিখিতেছি যে, আমি আপনার সঙ্গে নবুওয়তের অংশীদার। আরও লিখিতেছি যে, কুরাইশদের আয়ত্তে অর্ধ পৃথিবী এবং আমার আয়ত্তে অর্ধ পৃথিবী থাকাই সঙ্গত; কিন্তু এই ব্যাপারে কুরাইশগণ সীমালঙ্ঘন করিতেছে।'

হযরত রাসূলে করীম (দঃ) মোসায়লামার পত্রের উত্তর এইভাবে দিলেনঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّـدٍ رَّسُـوْلِ اللهِ اِلٰى مُسَيْلَمَـةِ الْكَـذَّابِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَـعَ الْهُـدٰى اَمَّـا بَعْـدُ فَاِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

'রহমান রহীম আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ—আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে মোসায়লামা কায্‌যাবের প্রতি; যাহারা সত্যপথে আছে তাহাদের উপর সালাম। অতঃপর লিখিতেছি যে, ভূ-পৃষ্ঠের মালিক আল্লাহ্; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ইহার উত্তরাধিকারী করেন; কিন্তু পরকাল কেবল ধার্মিক ও খোদাভীরুদের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে।'

—সীরাতে ইবনে হেশাম, ২য় খণ্ড

মোসায়লামার ঘটনায় আমাদের শিক্ষণীয় এই কয়টি বিষয় আছে—

(১) মোসায়লামা যে উদ্দেশ্য নিয়া নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল, তাহা মোসায়লামার এই পত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ধারণা ছিল, পয়গম্বরীর দাবী করিলেই রাজত্ব লাভ হইবে। প্রথমবার সে যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য মদীনায় গিয়াছিল, তখনই হযরত নবী করীম (দঃ) তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান এবং পরকালের মুক্তির উপলক্ষ। ইহাকে ঐহিক স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে না। সুতরাং উদ্দেশ্য পরিবর্তন ভিন্ন বাহ্যিক ধর্মান্তরের কোনই সার্থকতা নাই; এজন্য হযরত (দঃ) তাহাকে কঠিন ভাবে উত্তর দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন সে পত্র লিখিয়া পাঠাইল, তখন তাহার ভিতরকার রোগ পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার উত্তরে হযরত (দঃ) লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, রাজত্ব আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরেই ন্যস্ত। ভূ-পৃষ্ঠের ভাগাভাগী করার আমাদের কি অধিকার আছে? খোদা তা'আলা যাহাকে রাজত্ব পরিচালনার উপযুক্ত মনে করেন, তাহাকেই রাজত্ব দেন। কিন্তু পরকালের মুক্তি কেবল ধার্মিকতার উপর নির্ভর করে। অতএব, ধর্মের লক্ষ্যস্থল হইল পরকাল।

(২) মোসায়লামা পয়গম্বরীর দাবীদার হইলেও তাহার নিজের অন্তঃসারহীনতা সে নিজেও জানিত; তাহার তাবেদারগণও জানিত। কিন্তু পার্থিব ঐশ্বর্যের মোহে পতিত হওয়াতেই তাহার এ রকম শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ইসলামী আযানের মধ্যে বলা হয়—"আমি সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয়ই, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল।" কিন্তু মোসায়লামার মুআয্‌যেন আযানের মধ্যে বলিত—

www.nagorikpathagar.org

اَشْهَدُ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ يَزْعَمُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ○

'আমি একথায় সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোসায়লামা নিজকে নবী বলিয়া মনে করে।'

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, মোসায়লামার আযান পাঠকারীও তাহার নবুওয়তের প্রতি আস্থাবান ছিল না।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) বরকতের জন্য শিশুদের মাথায় হাত ফিরাইতেন এবং খোরমা চর্বণকরত তাহাদের মুখে দিতেন। একবার মোসায়লামার এক ভক্ত আসিয়া তাহাকে বলিল, 'আপনিও শিশুদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করুন।' মিথ্যাবাদীর অপকল্যাণ দেখুন, মোসায়লামা কোন ছেলে-মেয়ের মাথায় হাত রাখিলে তাহাদের মাথায় টাক পড়িত এবং যাহার মুখে চর্বিত খোরমা দিত, সে তোতলা হইয়া যাইত। একবার এক স্ত্রীলোক আসিয়া মোসায়লামাকে কহিল, 'মদীনার নবী মুহাম্মদ (দঃ) দো'আ করিলে বাগানের ফল বৃদ্ধি পায় এবং কূপের পানি বাড়ে; আপনিও আমার বাগান ও কূপের জন্য আশীর্বাদ করুন।' নূরনবী (দঃ)-এর অনুকরণে মিথ্যাবাদী মোসায়লামা বৃদ্ধার বাগানের জন্য দো'আ করিল এবং কূপে কুলকুচির পানি নিক্ষেপ করিল। ফল হইল এই যে, কূপ পরিশুষ্ক হইল এবং বাগানের সমস্ত গাছ মরিয়া গেল।

আমরা প্রথমে বলিয়াছি, মিছামিছি নবুওয়তের দাবী করিয়া কেহই কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারে না। কারণ, এরূপ হইলে সত্য ও মিথ্যা নবীর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা সর্বসাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মোসায়লামাও নিজের জীবনে কোন মো'জেযা দেখাইতে পারে নাই। দেখাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হইত।

একদা এক ব্যক্তি মোসায়লামাকে বলিল, 'আপনার নিকট যে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ আসে, (ওহী নাযিল হয়) উহার অবস্থা খুলিয়া বলুন।'

মোসায়লামা বলিল, 'অন্ধকারের মধ্যে কেহ আমাকে বলিয়া দেয়।'

প্রশ্নকারী লোকটি অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল; সে একথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'এক্ষণে আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল যে, আপনি মিথ্যাবাদী এবং মুহাম্মদ সত্যবাদী।'

(৩) কোরআন শরীফ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ মো'জেযা। ইহার ভাব, রচনা ও ভঙ্গি সমস্তই মানবশক্তি বহির্ভূত। কিন্তু মোসায়লামা কোরআনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বাক্য রচনাকরত তাহাকেই আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া সমাজে প্রকাশ করিত, কিন্তু আসল আর নকল কখনও এক হইতে পারে না। যাহারা অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পাঠ করে, তাহারাও কালাম পাক এবং অন্য কোন আরবী কিতাবের মধ্যে যে, রচনাগত পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অতি সহজেই অনুভব করিতে পারে। মোসায়লামার রচনাগুলি নিয়া সে নিজে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু বিজ্ঞ সমাজে তাহার এই অপচেষ্টা যে, কাকের ময়ূর নাচ-এর অনুরূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, একথা স্থির নিশ্চিত।

মোসায়লামার দুই একটি রচনাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। সূরা-কাওসারের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে মোসায়লামা রচনা করিয়াছিল—

اِنَّاۤ اَعْطَيْنَاكَ الْعَقْعَقَ ـ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَازْعَقْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْلَقُ ○

'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে 'আকআক' পক্ষী দান করিয়াছি; অতএব, তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায ও চীৎকার কর। নিশ্চয়ই, তোমার অমঙ্গলকামী ব্যক্তি শ্বেত কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট।'

—তফসীরে সাবী

www.nagorikpathagar.org

এক্ষণে ইহাকে সূরা কাওসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন— আল্লাহ্‌র কালামের পবিত্রতা স্পর্শ করা মানুষের অসাধ্য কিনা? মোসায়লামার এই রচনা যেমনই শ্রুতি-কটু তেমনি কদর্থ বোধক।

সূরা-যোহা কিংবা সূরা-লাইলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা স্বরূপ মোসায়লামা রচনা করিয়াছিল—

لَقَدْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَى الْحُبْلٰى - اَخْرَجَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعٰى - مِنْ بَيْنِ صَفَاقٍ وَّحَشٰى ○

—সীরতে ইবনে হেশাম, ২য় খণ্ড

যাহারা কেবল বানান করিয়া কোরআন শরীফ পড়িতে পারে তাহারাও অনায়াসে বুঝিতে পারে যে, ইহা কিছুতেই পবিত্র কালামের সঙ্গে তুলনীয় নহে।

মোসায়লামা সবচেয়ে বেশী ন্যাক্কার বলিয়াছিল, সূরা-বুরূজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া, দেখুন—

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ○

"রাশিশ্রেণীযুক্ত আসমান সাক্ষী"—কোরআন

وَالنِّسَآءِ ذَاتِ الْفُرُوْجِ ○

"প্রস্রাবদ্বার বিশিষ্টা স্ত্রীলোকেরা সাক্ষী"—মোসায়লামা

ভাবিয়া দেখুন, মোহান্ধতা মানুষকে অবনতির কত নিম্ন স্তরে টানিয়া নিতে পারে।

(৪) স্বভাবের চিরাচরিত নিয়ম এই যে, সত্যের উন্নতি হইতে বিলম্ব হইলেও উহা স্থায়ী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অসত্যের উন্নতি যত শীঘ্রই হউক না কেন; তাহা জল বুদ্‌বুদের মত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। আজ প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পরেও সকল দেশে ও সকল জনপদে রাসূলে মদীনা (দঃ)-এর কোটি কোটি গোলাম অবস্থান করিতেছে। মসজিদে মসজিদে, মিনারে মিনারে তাঁহার শ্লোগান (আযান ও একামত) ঘোষিত হয়। কোটি কোটি নর-নারী তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য জ্ঞাপন করে (দরূদ শরীফ পড়ে)। কিন্তু ইয়ামামার ভণ্ড নবী মোসায়লামার নাম ভক্তির সহিত মুখে আনিবার মত লোক ধরাপৃষ্ঠে খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না।

■

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

অপূর্ব আত্মত্যাগ

তবুক যুদ্ধে সাহাবাগণের আত্মোৎসর্গের নমুনা ঃ

মক্কা বিজয়ের কিছুকাল পর (৯ম হিঃ) সংবাদ আসিল, রোম সম্রাট কায়সর মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন। এই সংবাদে মুসলমানগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। রাসূল মকবূল (দঃ) পরামর্শের পর স্থির করিলেন, শত্রুকে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। নিজেরাই তাহাদিগকে আক্রমণকরত তাহাদের গর্ব খর্ব করা কর্তব্য। হযরত (দঃ)-এর আদেশ মাত্র ঘরে ঘরে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

এই যুদ্ধ যাত্রা সহজ ব্যাপার ছিল না। একে তো ইতিপূর্বে কখনও এত দূরদেশে মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রা করিতে হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধ প্রবল পরাক্রমশালী রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে ছিল। তৃতীয়তঃ এই সময় ভয়ানক গরমের মওসুম ছিল। মরুভূমির বায়ু আগুনের আকার ধারণ করিয়াছিল। চতুর্থতঃ মুসলমানদের উপযুক্ত সরঞ্জাম ও রসদের অভাব ছিল। এই সমস্ত কারণে এই যুদ্ধ যাত্রা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এক কথায় বলিতে গেলে এই সময় মুসলমানদের ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফলে মুসলমানগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক শ্রেণী আদেশ পালনে তৎপরতার পরিচয় দিল। এই শ্রেণীকে আমরা প্রত্যুৎপন্নমতি বলিব। আর অপর শ্রেণী অলসতা ও দুর্বলতাবশতঃ হুকুম পালনে পশ্চাৎপদ রহিয়াছিল। তাহাদিগকে আমরা দীর্ঘ-সূত্র বলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা বাহ্যাকৃতিতে মুসলমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা কাফের ছিল। তাহারাই মুনাফেক বা কপট বিশ্বাসী বলিয়া কুখ্যাত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমানের শক্তিতে তারতম্য হইলেও তাহারা সকলেই মু'মিন মুসলমান ছিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি ঃ

রাসূলে মকবূল (দঃ) ঘোষণা করিলেন, সকল মুসলমান যেন সাধ্যমত যুদ্ধযাত্রীদের সাহায্য করে। আদেশ মত চতুর্দিক হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, অর্থ, খাদ্য, শস্য, খেজুর, ঘোড়া, উট ও অস্ত্র-শস্ত্র মদীনায় জমা হইতে লাগিল। হযরত ওসমান (রাঃ) সাহাবাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান ছিলেন। সুতরাং এবার তিনি মুক্ত হস্তে দান করিলেন। কথিত আছে, হযরত ওসমান শাম দেশে সওদাগরীর জন্য কাফেলা পাঠাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এমন সময় যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ায় ব্যবসায়ের সমস্ত মাল যুদ্ধের জন্য দান করিলেন। তাঁহার দানের মধ্যে এক হাজার উষ্ট্র ছিল। এতদ্ব্যতীত ঘোড়া, খাদ্য-শস্য এবং টাকা-পয়সাও তদনুরূপ ছিল। ত্রিশ হাজার মুসলিম সৈন্যের মধ্যে হযরত ওসমানের দানেই বিশ হাজারের রসদ চলিয়াছিল। তাঁহার বদান্যতায় রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'খোদা তা'আলা! তুমি ওসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হও; যেহেতু আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।' তিনি আরও বলিলেন, 'আয় আল্লাহ্! হাশরের দিন ওসমানের হিসাব কিতাব মাফ করিও, তাহাকে বিনা হিসাবে বেহেশত দান করিও।'

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ওসমান (রাঃ) প্রদত্ত স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, 'ওসমান! তোমার সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করিলেন।' —মাদারেজ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ চল্লিশ হাজার রৌপ্য-মুদ্রা খেদমতে হাজিরকরত বলিলেন, 'হুযূর! আমার নিকট আশি হাজার দেরহাম ছিল; তন্মধ্যে হইতে চল্লিশ হাজার আল্লাহ্র পথে দান করিতে আনিয়াছি, বাকি চল্লিশ হাজার পরিবার পরিজনের খরচের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি।' হযরত (দঃ) সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'যাহা দান করিতেছ তাহাতে বরকত হউক; আর যাহা ঘরে রাখিয়াছ তাহাতেও বরকত হউক।' —মাদারেজ

এরূপ পরিপক্ক ঈমানবিশিষ্ট সমস্ত ধনবান আনসার ও মোহাজের সকলেই দান করিলেন। অনেক ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোকও নিজেদের হস্তপদ ও নাক-কানের গহনা খুলিয়া হযরত (দঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

আসেম আনসারী কয়েক মণ খর্জুর আনিয়া হাজির করিলেন। দরিদ্র আবু আকিল আনসারী প্রায় চারি সের খেজুর লইয়া হাজির হইল এবং বলিতে লাগিল, 'হুযূর আজ সারাদিন কাজ করিয়া দুই সা' খেজুর পাইয়াছিলাম, এক সা' বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি আর এক সা' দান করিতেছি। হযরত (সঃ) তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত খেজুরগুলি স্বহস্তে সমস্ত জিনিসের উপরে স্থাপন করিলেন। —মাদারেজ

ইবনে যায়েদ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি সারাদিন চেষ্টা করিয়াও দান করার মত কিছু জোগাড় করিতে পারিলেন না। এদিকে আগ্রহও দমন করিতে পারিতেছেন না; অগত্যা হযরত (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র পথে দান করার মত মাল আমার নাই। তবে আমি নিজকে নিজে আল্লাহ্র রাস্তায় অর্পণ করিলাম। এখন আমার দ্বারা যে কাজই করান হউক না কেন; আর আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহারই করা হউক না কেন; তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না।' হযরত (দঃ) বলিলেন, 'তোমার দান আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছেন।' —মাদারেজ

এক্ষণে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথা শুনুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমি কোন কাজেই আবু বকরের অগ্রগণ্য হইতে পারি নাই। তবুক যুদ্ধের সময় ভাবিলাম, আজ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। আজই তাহার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিব। এই সময় আমার নিকট যথেষ্ট মাল ছিল; উহার অর্ধাংশ লইয়া হযরত (দঃ) সমীপে উপস্থিত হইলাম।' হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'যে পরিমাণ মাল আনিয়াছি, সে পরিমাণই পরিজনের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি।'

কিছুক্ষণ পরে আবু বকর (রাঃ) চাঁদা লইয়া হাযির হইলেন। হযরত নবী করীম (দঃ) তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীর খরচের জন্য কি সঞ্চিত রাখা হইয়াছে?' হযরত আবু বকর (রাঃ) অম্লান বদনে কহিলেন—

اِدَّخَرْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ○

'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলকে সঞ্চিত রাখিয়াছি।'

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঘরে যাহা ছিল, তৎসমুদয়ই তিনি লইয়া আসিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি আর কি বলিবেন? একথার প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিপালনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্, এমন সর্বশক্তিমান প্রতিপালক থাকিতে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করার কি প্রয়োজন? সুতরাং যথাসর্বস্ব দানকরত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে সন্তুষ্ট করার এমন সুবর্ণ সুযোগকে হারাইতে যাইব?

রাসূলুল্লাহ (দঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর এই উত্তর শুনিয়া উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ

مَابَيْنَكُمَا مَابَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا ○

'তোমাদের উত্তরের মধ্যে যে ব্যবধান; তোমাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদার মধ্যেও সেরূপ ব্যবধান রহিয়াছে।'

হযরত ফারূক (রাঃ) একথা শুনিয়া হযরত সিদ্দীক (রাঃ)-কে সম্বোধনকরত বলিলেন, 'দেখিতেছি, আমি কোন বিষয়েই আপনার উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিব না।'

দীর্ঘসূত্র ঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ঠিককরত ত্রিশ সহস্র সেচ্ছাসেবক সৈন্যসহ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মুসলমানগণের মধ্যে অনেকে অসুস্থ থাকার দরুন অথবা ভ্রমণের উপযুক্ত আসবাবের অভাবে যুদ্ধে যাইতে অক্ষম রহিলেন। কয়েকজন লোক এমনও ছিলেন, যাঁহারা বিনা ওযরে কেবল অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতা বশতঃ যুদ্ধগমন হইতে বিরত রহিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই শ্রেণীতে যাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে আছেন; আবু খায়সামা, কা'ব ইবনে মালেক, মারারা ইবনে রবীআ এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া। এতদ্ব্যতীত আবু যর (রাঃ) তাঁহার উষ্ট্র চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়ায় পাছে পড়িয়া গিয়াছিলেন। আর আবু খায়সামা অলসতাবশতঃ গৌণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসলামী লস্কর চলিয়া যাওয়ার পর তিনি অনুতপ্ত হইয়া যাত্রাকরত লস্করের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। বাকী তিনজন অর্থাৎ, কা'ব ইবনে মালেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই ছিলেন; কিন্তু অনুশোচনা ও তওবার পর তাঁহাদের অপরাধও মার্জিত হইয়াছিল। আমরা তবুক যুদ্ধের পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করার চেষ্টা করিব না। পাঠক, যুদ্ধ যাত্রাকালে সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ধর্মোন্মাদনা অবলোকন করিয়াছেন। ধর্মের সেবায় তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিতে কতদূর তৎপরতা প্রদর্শন করিতেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন। হাজার হাজার মুসলিম স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকেই দুর্বল শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও ঈমানের সৌন্দর্য কতখানি বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহাই ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব।

আবু যর গেফারী (রাঃ) ঃ

আল্লাহ্র সত্য রাসূল স্বীয় সহচরবৃন্দ—মুজাহেদ সৈন্যদলসহ শাম সীমান্ত লক্ষ্যে মরুপ্রান্তর অতিক্রমকরত অক্লান্ত দেহে চলিয়াছেন। মরুভূমির তপ্তবায়ু উত্তপ্ত বালুকারাশিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বারবার পিপাসা—বারবার পানি পান; কিন্তু তাহাতেও শান্তি হইতেছে না। পিপাসার উপশম নাই, প্রান্তরেরও শেষ নাই—যতই অগ্রসর ততই বালুকাময় ধু-ধু প্রান্তর। ইসলামী সৈন্য অবিরাম গতিতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; ক্লান্তি নাই, মুখে ভীতি বিহ্বলতার চিহ্নমাত্র নাই। এদিকে ক্রমশঃ খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় জল প্রায় নিঃশেষ হইয়া

www.nagorikpathagar.org

আসিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য কাহারও মনে এতখানি আতঙ্ক নাই। খাদ্যশস্য সমাপ্ত হইলে দুই এক গোটা খর্জুর ভক্ষণ ও জলপান দ্বারা জীবন রক্ষা হইতে লাগিল। তাহাও যখন শেষ হইয়া চলিল, তখন খেজুরের বীচি চর্বণকরত তদুপরি পানি পান চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহাও অপ্রাপ্য হইয়া পড়িল। কোথাও কচিৎ বৃক্ষলতা দৃষ্ট হইলে মুজাহেদগণ গাছের কাঁচা পাতা চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন। পানির অভাবে উট যবাহকরত তাহার উদরস্ত থলের ভিতরে যে সঞ্চিত পানি থাকে, তদ্দ্বারা পিপাসা নিবৃত করার ব্যবস্থা হইল। ফলকথা, এই যুদ্ধ যাত্রার পরে মুসলমানগণ বাস্তবিক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাস্তব কষ্টের ছবি অঙ্কিত করিতে কবির কল্পনাও পরাভব স্বীকার করিবে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্ত-ভোগী বর্ণনাকারী রাবি বলেন, 'এই সময় গাছের পাতা চিবাইতে চিবাইতে আমাদের মুখে জিহ্বায় ক্ষত হইয়া গিয়াছিল।'

সৈন্যদল প্রাণান্ত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল। শাম সীমান্তস্থিত তবুক নামক স্থানে বিশ্রাম মানসে অবতরণ করিলে সৈন্যদের কেহ আসিয়া হযরত রাসূলে করীম (দঃ)-এর নিকট সংবাদ দিল, 'আমাদের পশ্চাৎ দিকে বহু দূরে এক পদাতিক মানবাকৃতি দৃষ্ট হইতেছে। গতি মন্থর, অবসন্নতা ও ক্লান্তির পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান, পৃষ্ঠে আসবাব পত্রের বোঝা। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে আরব দেশীয় লোকের মতই বোধ হইল। এক্ষণে হুযূরের কি আদেশ?' হযরত (দঃ) একথা শুনিয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আবু যর হইবে।' কিছু লোক অগ্রসর হইয়া দেখিল, সত্যসত্যই বৃদ্ধ আবু যর গেফারী (রাঃ) পিঠে বোঝা চাপিয়া মরুবালুকার উপর দিয়া একাকী পদাতিক চলিয়া আসিতেছেন। সংবাদ শুনিয়া হযরত (দঃ) ফরমাইলেন—

رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا ذَرٍّ يَّمْشِىْ وَحْدَهٗ وَيَمُوْتُ وَحْدَهٗ وَيُبْعَثُ وَحْدَهٗ ○

'আল্লাহ্ আবু যরের উপর অনুকম্পা বর্ষণ করুন; সে সঙ্গীহীন অবস্থায় পথ চলে, সঙ্গীহীন অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার হাশরও হইবে সঙ্গীহীন অবস্থায়।'

—যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪

আবু যর (রাঃ) উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'রাস্তায় তাঁহার উট ক্লান্ত ও অচল হইয়া পড়ায় তিনি বোঝা পিঠে ধারণকরত পদব্রজে চলিয়া আসিয়াছেন।' হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার আগ্রহ, ধৈর্য ও সাহস দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

আবু যর (রাঃ) অত্যন্ত নির্জনতা প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। হযরত নবী করীম (দঃ)-এর সংস্রব ছাড়া আর কোন সংস্রবই তিনি পছন্দ করিতেন না। হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের পর তিনি জনসমাজে বসবাস মোটেই পছন্দ করিতেন না। বিশেষ করিয়া যে সময় খেলাফত নিয়া বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন তিনি সকলকে ঝগড়া বিবাদ এবং শাসন বিভাগের কাজ পরিত্যাগকরত নির্জন বাস করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি সকলের যথেষ্ট ভক্তি ছিল। এজন্য তাঁহার এ রকম বক্তৃতা রাজনীতি ক্ষেত্রের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হওয়ায় শাসন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি নির্জন স্থানে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করেন। সঙ্গে কেবল তাঁহার স্ত্রী ও এক ছোট গোলাম ছিল। এই অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইয়া হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। ইহ জীবনে যখন তিনি এমন নির্জনতা প্রিয় ছিলেন, তখন পরকালেও যে তাঁহার নির্জন হাশর হইবে, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

মৃত্যুকালে আবু যর (রাঃ) তাঁহার স্ত্রী ও গোলামকে অসীয়ত করিলেন, মৃত্যুর পরে আমার লাশ গোসল ও কাফনের পর রাস্তার মধ্যে রাখিয়া দিবে। প্রথমে যে কাফেলা এই পথে আসিবে

www.nagorikpathagar.org

তাহাদিগকে বলিবে যে, ইহা রাসূলুল্লাহ্‌র সহচর আবুযরের (রাঃ) জানাযা; ইহার দাফন কার্যে আমাদের সহায়তা করুন। মৃত্যুর পরে তাঁহার অসীয়ত প্রতিপালিত হইল। ঘটনাক্রমে কোন রাজকার্যের উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বহু লোকসহ এই পথে যাইতেছিলেন। জানাযা দেখিয়া তাঁহারা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গোলাম আসিয়া হযরত আবু যর (রাঃ)-এর পরিচয় দিলে তাঁহারা জানাযার নামায সমাধাকরত দাফন করিলেন।

আবু খায়সামা (রাঃ)ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন রওয়ানা হওয়ার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন আবু খায়সামা (রাঃ) ভাবিলেন, আমার তো সকল জিনিসই ঠিকঠাক আছে; এত তাড়াতাড়ির কি প্রয়োজন? আবু খায়সামা (রাঃ)-এর সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। এদিকে একদিন হযরত (দঃ) সৈন্যদলসহ রওয়ানা হইয়া গেলেন; কিন্তু এখনও আবু খায়সামার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিল না। হযরত (দঃ) চলিয়া যাওয়ার কয়েক দিন পর তাঁহার দুই স্ত্রী বাগানের ভিতরে তাঁহার জন্য পৃথক পৃথক দুইটি পুষ্প গৃহ রচনা করিল। সেদিন খুব গরম ছিল; এজন্য খর্জুর পাতার চালাযুক্ত পুষ্পময় গৃহে স্ত্রীগণ কৌশলে পানির ঝরণা পাতিল। সুমিষ্ট ও সুশীতল পানীয় পরিপূর্ণ সোরাহী ইত্যাদি যথাস্থানে স্থাপিত হইল। বহুবিধ খাদ্য-দ্রব্য এবং সুমিষ্ট ফল আনয়ন করা হইল। এখন আবু খায়সামা আসিয়া একটি পুষ্প গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল। এ রকম বিবিধ আনন্দ-সামগ্রীর সমাবেশে কাহার মনে না প্রফুল্লতা আসে? কিন্তু আবু খায়সামা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নীদ্বয়ও এমন সুখ সময়ে পতির মুখমণ্ডলে অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিচলিত হইল। তাহারা সাহস করিয়া স্বামীকে বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিতে লাগিলেন, 'হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এই দারুণ গরমের দিনে মরুভূমির উত্তপ্ত বাতাসের ভিতর দিয়া ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতরাবস্থায় ভ্রমণ করিতেছেন, আর আমি এখানে প্রমোদ উপভোগ করিতেছি। তোমরা সত্বর আমার ভ্রমণের আয়োজন করিয়া দাও, এক্ষুণি আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট চলিয়া যাইতেছি।'

আদেশ প্রাপ্তে পত্নীদ্বয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিস ঠিক করিয়া দিল। আবু খায়সামা (রাঃ)-ও মুহূর্তকাল মাত্র বিলম্ব না করিয়া মরু পথে ইসলামী লশকরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ক্লান্তি নাই, বিশ্রাম নাই—অবিরাম গতিতে আবু খায়সামা (রাঃ) চলিয়াছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এইমাত্র তবুকে পৌঁছিয়াছেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে গৌণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনিও যথাযথ ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। সামান্য অবহেলা ও ভুল-ত্রুটির পর অনুতপ্ত হইয়া উহা সংশোধন করিলে সাধারণ মানুষেও তাহা ক্ষমা করে। তবে আল্লাহ্ পাকের মূর্তিমান রহ্মত হযরত নবী করীম (দঃ) কিরূপে তাহাকে ক্ষমা হইতে বিমুখ করিতে পারেন? নবী করীম (দঃ) তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নেক দো'আ করিলেন।

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর তওবাঃ

যাহারা তবুক যুদ্ধ গমনে বিমুখ রহিয়াছিল, কা'ব ইবনে মালেক তন্মধ্যে একজন। তিনি 'আজ কাল' করিতে করিতে পিছনে পড়িয়া গিয়াছিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) চলিয়া যাওয়ার পরও তিনি ইতস্ততঃভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। দিনের পর দিন অতীত হইয়া ক্রমশঃ মাসে পরিণত হইল, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘসূত্রতা সমাপ্ত হইল না। এদিকে একদিন সংবাদ আসিল যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনীসহ হযরত নবী করীম (দঃ) মদীনার নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কা'বের

www.nagorikpathagar.org

লজ্জা ও অনুশোচনার পরিসীমা রহিল না। হযরত মদীনায় পৌঁছিয়াই প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করিলেন। যাহারা মদীনায় ছিল তাহারা সকলেই আসিয়া নিজেদের ওযর জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। যাহাদের কোন ওযর ছিল না, তাহারাও কোনকিছু ওযর বলিয়া দোষ প্রক্ষালন করিল। হযরত (দঃ) সকলকেই মাফ করিয়া তাহাদের জন্য দো'আ করিলেন। কা'ব ইবনে মালেক এবং আর দুই ব্যক্তি মারারা ইবনে রবীআ ও হেলাল ইবনে উমাইয়া কিন্তু দরবারে উপস্থিত হইয়া সত্য কথা খুলিয়া বলিলেন। কা'ব কহিলেন, 'হুযূর, বাস্তবপক্ষে আমার কোনই ওযর ছিল না, অলসতা ও বেখেয়ালীর কারণে এই অন্যায় কাজ হইয়াছে।' হযরত (দঃ) দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'এখন তুমি যাও, তোমার সম্বন্ধে খোদা তা'আলার যে আদেশ হয় সেই ব্যবস্থাই করা হইবে।' কা'ব ঘরে চলিলে তাহাকে অনেকে পরামর্শ দিল, 'তুমি যদি অন্যান্য লোকের মত কোন ওযর আপত্তি দেখাইয়া মাফ চাহিতে তবেই ভাল হইত। এখনও ফিরিয়া গিয়া বলিতে পার।' কিন্তু কা'ব স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে, আমি কিছুতেই হযরত (দঃ)-এর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। কা'ব জানিতে পারিলেন যে, মারারা এবং হেলাল ইবনে উমাইয়াও তাঁহার ন্যায় সংকটে নিপতিত হইয়াছেন।

একদিন দরবারে রেসালত হইতে ফরমান আসিল যে, এই তিন অপরাধীর সঙ্গে কেহই কথাবার্তা বলিতে পারিবে না। এই সাজা তিন মুসলমানের পক্ষে কত বড় কঠিন ছিল, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। আল্লাহ্‌র রাসূল তাহাদের প্রতি নারায। স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বেরাদর পাড়া-প্রতিবেশী তথা সমস্ত লোক তাহাদের হইতে পূর্ণ সহযোগিতা বর্জন করিয়াছে। হাটে-মাঠে রাস্তা-ঘাটে যেখানেই কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, কেহই তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না, একটু মুখ ফিরাইয়াও তাহাদের প্রতি দেখে না। কাহারও নিকট মন খুলিয়া দুঃখ প্রকাশকরত মনের বোঝা কমাইবেন, তাহারও উপায় নাই। কা'বের সঙ্গীদ্বয় প্রৌঢ় বয়স্ক ছিলেন; তাঁহারা বাহিরে আসা যাওয়া একদম বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কা'ব নব্য যুবক; তাঁহার পক্ষে দিবারাত্র ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকা নিতান্ত অসম্ভব ছিল। তিনি সময় সময় আসিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইত, মুক্ত আকাশের নীচে এত বড় বিরাট পৃথিবী এই তিনটি জীবের পক্ষে বাস্তবিকই সংকীর্ণতম বোধ হইতে লাগিল—

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

'পৃথিবী স্বীয় প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাহাদের উপর সংকীর্ণ হইয়া গেল।' —কোরআন

একদিনের কথা—কা'ব মনের কোণে দারুণ যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। জনকোলাহলপূর্ণ পবিত্র মদীনা শহরের বাতাস তাঁহার নিকট যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি আপন মনে শহরের বাহিরে চলিলেন। একস্থানে তাঁহার চাচাত ভাই আবু কাতাদা (রাঃ)-এর এক বাগান ছিল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। কাহাকেও ডাকিবার উপায় নাই; সুতরাং প্রাচীর উল্লঙ্ঘনকরত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আবু কাতাদা (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁহার খুব ভালবাসা ছিল। এই নির্জন স্থানে আবু কাতাদার সাক্ষাৎ পাইয়া কা'ব তাহাকে সালাম জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু আবু কাতাদা প্রত্যুত্তর করিলেন না। কা'ব কহিলেন; 'ভাই আবু কাতাদা! আল্লাহ্‌র শপথ তুমি কি মনে কর, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি না?' আবু কাতাদা নিরুত্তর। আবার প্রশ্ন হইল, কিন্তু এবারও কোন উত্তর হইল না। তৃতীয় প্রশ্নের পর আবু কাতাদা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া

www.nagorikpathagar.org

কহিলেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন।' কা'বের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার সঙ্গে কথা বলা হইবে না। সুতরাং তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন সে পথেই ফিরিয়া চলিলেন। চক্ষুদ্বয়ে দরদর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই সময় কা'ব আর এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। শহরে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন, এক শাম দেশীয় বণিক লোকদের নিকট বলিতেছে, 'আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের অনুসন্ধান বলিয়া দাও।' লোকেরা দূর হইতে কা'বকে দেখাইয়া দিয়া যে যার পথে চলিয়া গেল। সওদাগর কা'বের হাতে একটা পত্র প্রদানকরত অভিবাদন করিল। পত্রটি রোম সীমান্ত প্রদেশের খৃষ্টান শাসনকর্তার নিকট হইতে আসিয়াছিল। কা'ব তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

কা'ব, জানিতে পারিলাম—তোমার প্রভু [মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)] নাকি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে যাতনা দিতেছে। তোমার প্রতি যে রকম ব্যবহার করা হইতেছে, তুমি কখনও তাহার উপযুক্ত নও। সুতরাং পত্র পাওয়া মাত্র আমার এখানে চলিয়া আসিবে। আমি তোমাকে উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করিব। পত্র পাঠে কা'ব বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাও তাঁহার ঈমানের পরীক্ষার একটা অংশ বিশেষ। তিনি পত্রবাহককে মৌখিক বলিয়া দিলেন, 'তোমার বাদশাহকে বলিয়া দিও যে, কা'বের বর্তমান প্রভুর শাস্তিও আপনার সহস্র অনুগ্রহের চেয়ে উত্তম।' কোন কবি বলেন—

گر وصـــال تو نباشد بفراق تو خوشم   هم فراق تو مرا به که وصـــال دگراں

অর্থাৎ, 'তুমি যদি আমাকে তোমার সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত কর, তবে আমি তাহাতেই সুখী। অন্যের সংসর্গ অপেক্ষা তোমার বিরহই আমার নিকট প্রিয়।'

বাড়ীতে ফিরিয়া কা'ব রোম শাসনকর্তার পত্রটি উননে নিক্ষেপ করিলেন। কা'ব ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এদিকে তাঁহাদের সংকটকালও কাটিয়া গেল। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহাদের জন্য ক্ষমার প্রত্যাদেশসহ জিবরায়ীল ফেরেশতা অবতীর্ণ হইলেন। সুসংবাদ পাইয়া কা'ব 'সজদায়ে শোকর' আদায় করিলেন এবং দীন-দুঃখিকে মুক্ত হস্তে দান করিলেন।

মুনাফেক দল ও মসজিদে যেরার ঃ

মদীনা শরীফে একদল কপট বিশ্বাসী বা মুনাফেকের বাস ছিল, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আবু আমের রাহেবের কথাও বিবৃত হইয়াছে। আবু আমের বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের শক্তি দৃঢ়ীভূত হইতে দেখিয়া মক্কায় পলায়ন করে এবং বিভিন্ন উপায়ে মুসলমানগণকে নিপাত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতেও অকৃতকার্য হইয়া শাম দেশে পলায়ন করে। এখান হইতে আবু আমের গুপ্তচর মারফত মদীনার মুনাফেক পার্টিকে বলিয়া পাঠায় যে, তোমরা মদীনার নিকটস্থ কোবা নামক স্থানে একটি মন্ত্রণাগৃহ প্রস্তুত কর। আমি আসিয়া দিনের বেলায় ইহাতে ধর্মালোচনা করিব; রাত্রে ইহাতেই মুসলিম-নিপাতের মন্ত্রণা করিব। পরামর্শমত মুনাফেকগণ মসজিদ বনাম একটি কুমন্ত্রণাগৃহ তৈয়ার করিল। কোরআন পাকের ভাষায় ইহাকেই 'মসজিদে যেরার' বলা হইয়াছে।

তবুক যুদ্ধ গমনের পূর্বেই মুনাফেক পার্টির নেতৃস্থানীয় লোকেরা রাসূলুল্লাহ্র নিকট আসিয়া নবনির্মিত মসজিদে নামায পড়িতে অনুরোধ করিল। হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন যে, এখন যুদ্ধ-যাত্রা নিয়া ব্যস্ত আছি; ফিরিয়া আসার পর দেখা যাইবে। তবুক হইতে প্রত্যাবর্তন পথে মদীনার নিকটবর্তী জিআওয়ান নামক স্থানে পৌঁছিতেই মুনাফেকগণ আসিয়া কহিল, 'হুযূর, তবুক হইতে

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের অনুরোধ রক্ষার আশ্বাস দিয়াছিলেন, এখন অনুগ্রহ প্রদর্শনে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।' এই সময় হযরত জিবরায়ীল আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ আনয়ন করিলেন, 'যাহারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন ও তাহাদের মধ্যে বিভেধ সৃষ্টির কূটবুদ্ধি দিয়া মসজিদ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাদের মসজিদে কখনও নামায পড়া চলিবে না।'

রাসূলুল্লাহ (দঃ) মুনাফেকদের মন্ত্রণাগৃহ ভূমিসাৎ করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র মুনাফেকদের আশা আকাঙ্ক্ষার মত তাহাদের মসজিদটিও চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

এই যুদ্ধ যাত্রার যে কয়েকটি ঘটনা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহা পাঠে মুসলমান ভাইগণ বোধ হয় ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য কতখানি উৎসাহ, একাগ্রতা, দৃঢ়তা এবং আত্মোৎস্বর্গের আবশ্যক হয়, তাহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছেন। হযরত (দঃ)-এর আদেশ হওয়া মাত্র সাহাবাগণ নিজেদের ধন, প্রাণ সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে কিরূপে তৎপর হইতেন, তাহাও দেখিতে পাইয়াছেন। আপনারা আর একবার পূর্বাপর ঘটনাবলী মনে আনয়নকরত বলুন, যেই সমাজে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মত বদান্য পুরুষ, ওসমান (রাঃ)-এর মত হৃদয়বান ধনাঢ্য এবং আসেম আনসারী ও ইবনে যায়েদের ন্যায় দানবত্তায় অনুপম আগ্রহশীল ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করার ক্ষমতা কাহারও থাকিতে পারে কি? তবুক পথের সেই অভাবনীয় করুণ দৃশ্যপট সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলুন, দুনিয়ার ইতিহাসে ইহার তুলনা বিরল কিনা? আর সেই বৃদ্ধ আবু যর গেফারী (রাঃ)-এর কথা স্মরণ করুণ! ধর্মের প্রতি কতখানি আকর্ষণ তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন।

কা'ব ইবনে মালেক ও আর যে কয়েক জন লোক আশু অনুগমনে বিমুখ ছিলেন, তাঁহাদিগকে অন্যান্য সাহাবাগণের তুলনায় দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ঈমানের প্রাবল্য দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কা'বকে তাঁহার কতিপয় বন্ধু পরামর্শ দিতেছেন যে, তুমি হযরত (দঃ)-এর নিকট কোন প্রকার ওযর আপত্তি বলিয়া নিজের দোষ চাপা দাও। কিন্তু তিনি কত প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও যাতনা সহ্য করিলেন, অথচ সামান্য লুকোচুরি করাকেও পছন্দ করিলেন না। তাঁহার নিকট রোম সম্রাট প্রতিনিধির পত্র আসিল, তাঁহাকে প্ররোচিত ও পথভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তিনি ঈমানের পথে দৃঢ়পদ থাকিয়া শয়তানের মস্তকে পদাঘাত করিতে সর্বতোভাবে সমর্থ হইলেন। তিনি ঈমানের পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিলেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর এই দৃঢ়তা, অটলতা এই ধৈর্যশীলতা যে ইসলাম ধর্ম জগৎময় প্রচারিত হওয়ার অন্যতম উপলক্ষ্য একথায় আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

তবুক যুদ্ধের ঘটনায় আমরা বিভিন্ন সূত্রে একথার স্পষ্ট আভাস পাইলাম যে, ইসলাম প্রচারে বাধাদান ও ইসলাম ধর্মের মূলোৎপাটনের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুবিধ চক্রান্ত ও অপচেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু সত্যসনাতন ইসলাম সর্বপ্রকার বিঘ্নজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্নকরত অব্যাহত গতিতে অগ্রগামী হইয়াছিল।

মদীনার ভিতরে মুনাফেকগণ ইসলামের বাতি নির্বাপিত করার উদ্দেশ্যে সর্বদা তৎপর ছিল। প্রথমাবস্থায় তাহারা মক্কা ও আরব দেশের অন্যান্য ইসলাম বিরোধী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া যুদ্ধবিগ্রহের ইন্ধন যোগাইত। মক্কা বিজয়ের পরও তাহাদের শঠতার নিবৃত্তি হয় নাই। তাহাদের নেতা আবু আমের রাহেব শাম দেশে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত ছিল। মাদারেজুন্নবুওয়ত ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, আবু আমের রোম সম্রাট

www.nagorikpathagar.org

কায়সরের দরবারে স্থান প্রাপ্ত ও মর্যাদা লাভে সমর্থ হইয়াছিল। সে সম্রাটকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইত এবং মদীনা আক্রমণে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিত। ইহা খুবই সম্ভব যে, তাহার উসকানিতেই রোম সম্রাট মদীনা আক্রমণের আয়োজন করিয়াছিল এবং ইহাই তবুক যুদ্ধের কারণ হইয়াছিল।

আবু আমের শাম দেশে থাকিয়া মদীনার নিকট তাহার অনুগামী সম্প্রদায় দ্বারা একটা মন্ত্রণা গৃহ গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ওহীয়ে 'রব্বানী' দ্বারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহার মূলতথ্য জানিতে না পারিলে হয়তো এই বিষ বৃক্ষ শাখা পল্লব বিস্তারকরত ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে পারিত। রোমরাজ প্রতিনিধি যে কা'বের নিকট পত্র লিখিয়াছিল, ইহার পিছনে মুনাফেক দলের কূটনৈতিক চাল থাকুক বা না থাকুক, ইহাতে মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কত প্রকারে ও কত দিক হইতে যে চেষ্টা করা হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে কোন গুপ্ত হস্তের সাহায্য ছিল বলিয়া কোন বিরুদ্ধ চেষ্টাই তাহাদের ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই।

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

'কাফেরদের নিকট অপ্রীতিকর হইলেও আল্লাহ্ তাঁহার নূরকে পূর্ণতায় পৌঁছাইবেন'।

—সূরা-ছফ ঃ রুকূ ১

হিজরী দশম সনে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হজ্জ করিয়াছিলেন। এই হজ্জের পর আর তিনি নশ্বর দেহে বায়তুল্লায় গমন করেন নাই। এজন্য এই হজ্জ্ 'হজ্জাতুল বেদা' বা বিদায় হজ্জ নামে বিখ্যাত। এই হজ্জে হযরত (দঃ) মুসলমানগণকে ইসলামের শেষ বাণী পৌঁছাইয়াছিলেন, এজন্য ইহার অন্য নাম 'হজ্জাতুল-বালাগ।' এই হজ্জের সময় লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশ হইয়াছিল। এদিকে সকলের কাণে ধর্মের বাণী পৌঁছানও আবশ্যক; সুতরাং হযরত (দঃ) কতিপয় লোককে খোত্বার সময় তাঁহার বাণী উচ্চরবে ঘোষণাকরত সকলের কর্ণগোচর করার জন্য নিযুক্ত করিলেন। হজ্জের সময় হযরত নবী করীম (দঃ) যে খোত্বা বা ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে একথাও বলিয়াছিলেন যে, 'উপস্থিত লোকগণ! তোমরা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। হয়তো ইহার পর আমাকে আর কখনও এই স্থানে দেখিতে পাইবে না।' তাঁহার শেষ খোত্বার কতিপয় অংশ এইঃ

اِنَّ دِمَـائَـكُمْ وَاَمْـوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُـرْمَـةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْـرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا ○

'তোমাদের প্রত্যেকের জান, মাল অন্যের উপর হারাম; যেমন, অদ্যকার দিনের মর্যাদা বিনষ্ট করা এই মাসে এই শহরের ভিতরে হারাম।'

অতঃপর বলিলেনঃ

اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ ○

'সাবধান, অন্ধকার যুগের সমস্ত আচরণ আমা দ্বারা পদদলিত হইল।' —মেশকাত শরীফ, পৃঃ ২২৫

তৎপরে আরও ফরমাইলেন, 'অন্ধকার যুগে অজ্ঞতাবশতঃ যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ক্ষমা করা গেল, অতঃপর আর কেহ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না।'

www.nagorikpathagar.org

হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের পৌত্র আয়াস ইবনে রবীয়া বনী সা'দ গোত্রীয়া মহিলার দুগ্ধ পান করে। বনী সা'দ ও হুযাইলের এক লড়াইয়ের সময় সে হুযাইল বংশের কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমিই প্রথম আমার বংশের (আয়াস) ইবনে রবীয়ার খুন মাফ করিলাম।'

অন্ধকার যুগে আরব দেশে সুদের বহুল প্রচলন ছিল। কোরআন পাকে সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছিল। হযরত নবী করীম (দঃ)-ও বারংবার সুদ বর্জনের আদেশ কঠিনভাবে জারি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদায় হজ্জের সময় জান-মাল হারাম হওয়ার আদেশের সঙ্গে সুদের নিষেধাজ্ঞাও স্পষ্টভাবে সকলকে শুনাইয়া দিয়া বলিলেন, 'অন্ধকার যুগের বকেয়া সুদও অতঃপর আর আদায় করা চলিবে না। অবশ্য মূলধন এখনও ফিরাইয়া দিতে হইবে।' হযরত (দঃ)-এর চাচা আব্বাসের সুদ সংক্রান্ত প্রাপ্য অনেকের উপর ছিল। একথার উল্লেখ করত হযরত (দঃ) কহিলেন, 'সর্বপ্রথম আমার চাচা আব্বাসের সুদের প্রাপ্য আমি মাফ করিয়া দিতেছি।'

অনন্তর স্ত্রীলোকদের প্রাপ্য আদায় করার এবং তাহাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার নসীহতকরত বলিলেনঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابُ اللهِ ○

'তোমাদের জন্য একটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, তোমরা যদি উহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাক, তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইতেছে, আল্লাহ্র কিতাব—কোরআন শরীফ'। —মেশকাত

বক্তৃতা শেষে হযরত (দঃ) বলিলেন, 'বিচার দিবসে তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র আদেশ পৌঁছাইয়া দিয়াছি কিনা। বল, তোমরা সে সময় কি উত্তর দিবে।' সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—

نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ○

অর্থাৎ, 'আমরা সকলে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই, আপনি পূর্ণরূপে তবলীগ করিয়াছেন; —আল্লাহ্র আদেশ পৌঁছাইতে এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করিতে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করেন নাই।' —মেশকাত

এই সমস্ত উপদেশ দ্বারা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে—

(১) জগতে মানবজাতির ধন-প্রাণের নিরাপত্তা স্থাপন করাই হযরত (দঃ)-এর প্রেরিতত্বের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। এজন্যই তিনি শেষ বিদায় হজ্জের সময় বিশেষভাবে একথার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে একথার প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান রহিয়াছে যে, ইসলাম প্রচার ব্যাপারে এমন কোন পথ অবলম্বন করা চলিবে না, যাহাতে লোক সমাজের জান-মাল বিপন্ন হইতে পারে। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করাও চলিবে না, যাহাতে ধর্ম বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, কেহ অনিচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়। ইসলামের এই শান্তিবাণী সর্বপ্রথম আরবের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অতঃপর আরববাসিগণ এই শান্তির বাণী সমগ্র জগতে পৌঁছাইয়া দিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ছিলেন শান্তির প্রচারক। কিন্তু যাহারা এই প্রচারক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অযথা অস্ত্রধারণে অশান্তির উদ্ভব করিয়াছিল, অথবা বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের প্রতিই ইসলাম প্রচারকগণ অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

(২) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ছিল যে, তিনি লোকদিগকে যে উপদেশই দিতেন, প্রথমে নিজের কর্ম জীবনে উহার আদর্শ দেখাইয়া দিতেন। প্রচারক নিজে উপদেশের পাবন্দ না হইয়া মুখে মুখে উপদেশের বুলী আওড়াইতে গেলে কখনও তাহাতে তেমন উপকার হইতে পারে না। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধকার যুগের হত্যাপরাধ মার্জনা করার উপদেশ দেওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই নিজ বংশের আয়াসের খুনের প্রতিশোধ মাফ করিয়া দিলেন। সুদের ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার সময়েও উহার অনুরূপ আদর্শ স্থাপন করিলেন। ইসলাম প্রচার কার্যকরী হওয়ার ইহাই যে শ্রেষ্ঠ উপকরণ একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

(৩) আল্লাহ্‌র 'আমানত' তথা সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ববোধ মহা নবী (দঃ)-এর কতখানি ছিল, তাহা বিদায় হজ্জের শেষ বিদায় বাণীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি জীবনের কঠোর সাধনা দ্বারা সত্য ধর্ম প্রচার করিয়াও সর্বদা অন্তরে এত বড় গুরুভার দায়িত্ব বহনে ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় পোষণ করিতেন। এজন্যই বিদায় কালে তিনি সকলের নিকট শুনিতে চাহিতেছেন—তাহারা এ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দিবে? সকলে তাঁহার স্বপক্ষে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করার পর তিনি অন্তরে শান্তি লাভ করিতেছেন এবং আকাশের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তিনবার বলিতেছেন اللهم اشهد الخ 'আয় আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক, আমি তোমার আদেশ তোমার বান্দাগণের নিকট পূর্ণরূপে পৌঁছাইয়া দিয়াছি।'

মক্কা বিজয়ের প্রায় তিন বৎসর পরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া বেহেশতগমন করেন। হযরত (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই আরবের সমস্ত গোত্রে ইসলাম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বাহ্যিকভাবে কোন গোত্রই ইসলাম ধর্ম হইতে বিমুখ ছিল না। কিন্তু এই নও-মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল, যাহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল না, কেবল সকলের দেখাদেখি ইসলামের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া মুসলমানদের সমাজে গণ্য হইয়াছিল মাত্র।

ওয়ায়না ইবনে হাসান নামক এক ব্যক্তি উল্লিখিত রকমের এক 'দেখাদেখি' মুসলমান ছিল। সে নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছিল যে, এক মিনিটের জন্যও তাহার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ লাভ করে নাই। তোলায়হা আসাদী যখন নবুওয়তের দাবী করে, তখন ওয়ায়না তাহার সঙ্গে যোগদানকরত প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। (তোলায়হার কথা পরে বিবৃত হইবে।) ওয়ায়না বন্দী হইয়া মদীনায় আসিলে মদীনার মুসলিম বালকেরাও তাহার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করিতেছিল। কারণ, তাহারাও একথা ভালরূপেই জানিত যে, মুসলমান হওয়ার পর ধর্মত্যাগ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এজন্যই বালকেরা তাহাকে তিরস্কার সহকারে বলিতেছিল, 'হে নরাধম! তুমি কি ঈমানের মত অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াও তাহা ত্যাগ করিতেছ?' ওয়ায়না প্রত্যুত্তরে বলিল, 'আমি তো এক পলের জন্যও ইসলাম গ্রহণ করি নাই।'

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, কোন মুসলমান ধর্ম ত্যাগকরত 'মোরতাদ' হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া ইসলামের বিধান। এই হিসাবে ওয়ায়নাও প্রাণদণ্ডের যোগ্য ছিল। কিন্তু সে বলিতেছিল যে, সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। খলীফা আবু বকর (রাঃ) তাহার এই আপত্তি গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে মুক্তি ও অভয় দিলেন। মুক্তি প্রাপ্তির পর ওয়ায়না স্বেচ্ছায় মুসলমান হইল। অন্যান্য মুসলমানদের মত তাহার ঈমানও অক্ষয় হইল।

www.nagorikpathagar.org

এতদ্ব্যতীত এমনও অনেক লোক ছিল, যাহারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হইলেও তাহাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ়ীভূত হইতে পারে নাই। এ রকম লোকদের সম্পর্কেই কালামে মজীদে বলা হইয়াছে;

قَالَتِ الْاَعْـرَابُ اٰمَنَّـا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُـوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَـا وَلَمَّـا يَدْخُـلِ الْاِيْمَـانُ فِىْ قُلُـوْبِكُـمْ ○

"গ্রাম্য আরববাসীরা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,' (তদুত্তরে) তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা এখনও ঈমান আন নাই; বরং তোমরা বলিতে পার যে, 'আমরা অনুগত হইয়াছি।' এখনও তোমাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই।"

এই লোকদের ঈমান দৃঢ় হওয়ার পূর্বেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর এন্তেকাল হইয়া গেল। একদল তো মোটেই মুসলমান হয় নাই, আর একদল মুসলমান হইয়া থাকিলেও তাহাদের ঈমান পাক্কা হইতে পারে নাই। এদিকে তাহাদের ভিতরে আত্ম প্রাধান্যের লালসাও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের সঙ্গেসঙ্গেই চতুর্দিকে ইসলাম ত্যাগের প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দেখা দিল, যাহাতে আরবের অধিকাংশ গোত্রই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িল। তৎসঙ্গে আবার নূতন নূতন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হওয়ায় জ্বলন্ত অগ্নিতে তৈল নিক্ষিপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে আরব মরুর প্রত্যেক অংশেই ধর্মত্যাগের অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রবল অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। পুরুষদের মধ্যে মোসায়লামা কায্যাব, আসওয়াদ আনাসী, তোলায়হা আসাদী আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে সাজা নবুওয়তের দাবী ঘোষণা করিল। এই ভণ্ড নবীদের সঙ্গে আরব গোত্রসমূহের ঐ সমস্ত লোক যোগদান করিল, যাহারা হয় প্রকৃত পক্ষে মুসলমানই হয় নাই, অথবা হইলেও তাহাদের ঈমান পরিপক্ক হইতে পারে নাই।

ধর্মত্যাগী মোরতাদগণ এবার সমগ্র আরবে ভয়াবহ উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। এতদবস্থায় যেখানে যেখানে ইসলামী শাসক নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহের মূল নিতান্তই দুর্বল ছিল। কারণ, অনেক সাদাসিধা মুসলমানও বিদ্রোহিগণের প্ররোচনায় পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। এই কারণেই ধর্মত্যাগের বিপত্তি যত শীঘ্র প্রজ্বলিত হইয়াছিল, ততোধিক শীঘ্র তাহা নির্বাপিত হইয়াছিল। আসওয়াদ আনাসী হযরত রাসূল করীম (দঃ)-এর জীবিত অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের পূর্বে আসওয়াদের মৃত্যুর খবর মদীনায় পৌঁছিয়াছিল। মোসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় জীবিত ছিল এবং নবুওয়তের ডঙ্কা বাজাইয়া বিচরণ করিতেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাবধানতার ফলে অতিশীঘ্রই তাহাদের ফেৎনাও দমিত হইয়াছিল। আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত প্রাপ্তির বর্ণনার পর মোসায়লামা ও তাহার সহযোগীদের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করিব।

■

www.nagorikpathagar.org

নবম অধ্যায়

খেলাফত ও ফেৎনা প্রতিরোধ

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত প্রাপ্তিঃ

হিজরী এগার সনে রবিউল আউয়াল চাঁদে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এন্তেকাল করেন। হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সম্মুখে সর্বপ্রথম যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহা হইয়াছে খেলাফত। হযরত (দঃ)-এর পবিত্র দেহ সমাহিত করার পূর্বেই সাহাবাগণ এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহাতেই অনুমান করা চলে যে, বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় নাই এমন নহে। মতভেদ ও বাদানুবাদ যথেষ্ট হইয়াছিল এবং হয়তো তাহা আত্মকলহে পর্যবসিত হওয়াও বিচিত্র ছিল না। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) অবস্থার ভয়াবহতা অনুধাবন করিতে পারিয়া সত্বর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর হস্তধারণে 'বায়আত' করিলেন। তখন চতুর্দিক হইতে জনতা বায়আত করিবার জন্য টুটিয়া পড়িল—হযরত সিদ্দীক (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হইলেন। আমরা এস্থলে খেলাফতের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিতেছি। খলীফা পয়গম্বরের প্রতিনিধিকে বলে; সুতরাং খেলাফতকে বুঝিতে চাহিলে প্রথমে নবুওয়তকে বুঝিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে নবুওয়ত ও বাদশাহতের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

নবুওয়ত ও বাদশাহতঃ

নবুওয়ত ও বাদশাহত দুইটি পৃথক পৃথক পদ। বাদশাহত বা রাজত্বের উদ্দেশ্য—জগতে বাহ্যিক শৃঙ্খলা রক্ষা, সুবিচার, শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন, প্রজাদের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং বহিঃশত্রু হইতে দেশকে রক্ষা ইত্যাদি।

নবুওয়তের উদ্দেশ্য—শরীঅতের আহকাম ও খোদার আইন প্রচার, খোদাদ্রোহিতা, শিরক ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ, আত্মার সংশোধন এবং পরকালের পথের সন্ধান দান।

নবুওয়ত ও রাজত্বের মধ্যে পারস্পরিক নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, নবীর কর্তব্যগুলি পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতে হইলে প্রতিষ্ঠা এবং সামর্থ্যের আবশ্যক হয়, আর রাজত্ব দ্বারাই এই শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাজত্ব পরিচালনা করিতেও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত শরীঅত এবং বিধি-ব্যবস্থার আবশ্যক হয়। আর এই শরীঅত ও খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা কেবল নবুওয়তের মারফতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, সুষ্ঠু ও পরিসুষ্ঠু রাজত্ব উহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহা পয়গম্বর কর্তৃক আনীত খোদায়ী আইন মতে পরিচালিত হইয়া থাকে। অবশ্য ইতিহাসে এমন অনেক রাজা বাদশাহেরও খোঁজ পাওয়া যায়, যাঁহারা খোদায়ী আইনের সংস্রব ব্যতিরেকেও শৃঙ্খলা সহকারে শাসন কার্য পরিচালনায় সক্ষম হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা

www.nagorikpathagar.org

সুবিচারক বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এ রকম শাসনের মধ্যে বহুবিধ অপকারিতা ও অশান্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, কেবল এ রকম বাদশাহ্গণকেই সুবিচারক বলা চলে, যাঁহারা আল্লাহ্র আইনের অনুবর্তী হইয়া রাজ্য শাসন করেন। এইজন্যই বলিয়াছি, বাদশাহত এবং নবুওয়ত একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।

কিন্তু ইহা আবশ্যকীয় নহে যে, বাদশাহ্ এবং পয়গম্বর একই ব্যক্তি হইতে হইবে। এ রকমও হইতে পারে এবং হইয়াছে যে, পয়গম্বর এক ব্যক্তি এবং বাদশাহ্ আর এক ব্যক্তি। অবশ্য এরূপস্থলে বাদশাহ্কে পয়গম্বরের নির্দেশিত পথে রাজ্য শাসন করিতে হয়। ফলকথা, অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে নবুওয়ত এবং বাদশাহ্ত একত্রিতও দেখিতে পাওয়া যায়, আবার স্বতন্ত্রও দৃষ্টিগোচর হয়।

বনী ইসরায়ীল গোত্রের এক বংশে নবুওয়ত এবং আর এক বংশে বাদশাহত ছিল। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র ইহুদার বংশে রাজত্ব এবং ইয়াকূব-পুত্র লাভীর বংশে নবুওয়ত বিদ্যমান ছিল। রাজা তালুতের কথা কোরআন শরীফেও বিবৃত হইয়াছে। সেই সময় বনী ইসরায়ীল বংশে নবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাদশাহের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছিল এবং তালুত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ط قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ط قَالَ اِنَّ اللهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ط

তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ নির্বাচিত করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'সে কিরূপে আমাদের বাদশাহ্ হইতে পারে? আমরাই তো তাহার চেয়ে রাজত্বের বেশী হকদার। তাহার তো ধন-দৌলতের প্রাচুর্যও নাই।' নবী বলিলেন, 'আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। তাহার শারীরিক শক্তি ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে প্রশস্ততা দান করিয়াছেন। (আর এ বিষয়ে তোমাদের আপত্তির কারণই বা কি?) আল্লাহ্ নিজের রাজ্য যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করিয়া থাকেন।'

লক্ষ্য করিবার বিষয়—বনী ইসরায়ীলগণ তো এই বিষয়ে কোন আপত্তিই করেন নাই যে, আমাদের মধ্যে পয়গম্বর থাকিতে আমাদের বাদশাহের কি আবশ্যক? কারণ, তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত ছিল। তাহারা একথাও জানিত যে, নবী এবং বাদশাহ্ পৃথক পৃথক ব্যক্তি হইলে তাহাদের উভয়ের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিতে কোনই অসুবিধা হয় না। ইহাও তাহারা অবগত ছিল যে, প্রকৃত সরদারী পয়গম্বরের হাতেই থাকে; বাদশাহ্ পয়গম্বরের নায়েবস্বরূপ শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন মাত্র।

ফলকথা, নবী এবং বাদশাহ্ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হওয়াতে তাহাদের কোনই আপত্তি হয় নাই। তাহারা কেবল একথায় আপত্তি করিয়াছিল যে, তালুত একে তো রাজবংশের লোক নহে। দ্বিতীয়তঃ তাহার আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে। এমন ব্যক্তিকে কেন বাদশাহ্ বানান হইতেছে? পয়গম্বর তাহাদের এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, তালুতের বিদ্যাও বেশী, তাহার শারীরিক

www.nagorikpathagar.org

শক্তি সামর্থ্যও অধিক। অতএব, সে-ই বাদশাহ্ হইবার অধিক যোগ্য। এতদ্ব্যতীত রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। আল্লাহ্ নিজের রাজ্য যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন তাহাকেই দিবেন, ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। রাজত্ব রক্ষার যোগ্যতা সৃষ্টি করাও আল্লাহ্‌রই কাজ।

রাজত্ব ও নবুওয়ত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বাহু, এইভাবেই বহুযুগ স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু হযরত দাঊদ ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মধ্যে এই দুইটি জিনিস একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা একাধারে নবুওয়ত ও রাজত্ব দুইই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জানা গেল, বনী ইসরায়ীলের মধ্যে কোন সময় রাজত্ব এবং নবুওয়ত একই ব্যক্তির মধ্যে স্থাপিত হইত; আবার কোন সময় পৃথক পৃথক ব্যক্তির মধ্যেও হইত। এক্ষণে শেষ নবী খাতেমুল মুরসালীনের কথা শুনুন।

আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার উম্মতগণকে সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব ও শাসন পরিচালনা করার অধিকার দান করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে যে রাজত্ব ও নবুওয়তকে একত্রে স্থাপিত করা হইয়াছে, এই রকমই বুঝিতে হইবে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ) একাধারে পয়গম্বর এবং বাদশাহ্ হইলেও তিনি সামান্য কালের জন্যও রাজোচিত বাহ্যাড়ম্বর গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাদশাহ হইয়াও আল্লাহ্‌র দরবারের দাসত্বকেই জীবনের সমস্ত স্তরে সযত্নে রক্ষা করিতেন। একজন সম্রাটের যে যে ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, তৎসমুদয় হযরত (দঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা হযরত (দঃ)-এর নির্দেশেই নিযুক্ত হইত। শুল্ক ও রাজস্ব তাঁহার আদেশেই আদায় হইত। যুদ্ধবিগ্রহেও নিজেই যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতেন, অথবা অন্য কাহাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিতেন। ফলকথা, বাহ্যিক আড়ম্বর ব্যতীত সম্রাটের ন্যায় সমস্ত কাজই তিনি সমাধা করিতেন।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) শেষ নবী, সুতরাং তাঁহার পরে আর কেহই এমন হইতে পারেন না, যাহার মধ্যে নবুওয়ত ও বাদশাহতের সমাবেশ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা নবী না হইলেও নবীর মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী থাকে, তৎসমুদয়ের আংশিক বিকাশ খলীফাদের মধ্যে হইয়াছিল। এই হিসাবে খলীফাদের রাজত্বকে "খেলাফত আলা মিন্‌হাজিন্নবুওয়ত" অর্থাৎ, নবুওয়তের পথাবলম্বী প্রতিনিধিত্ব বলা হয়। খলীফাগণ চর্মচক্ষে ও আন্তরিক চক্ষে নবুওয়তের পথ চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা যেমন রাজ্য চালনার পূর্ণ ক্ষমতা রাখিতেন, তদ্রূপ জনসাধারণের চরিত্র সংশোধন, ধর্ম-কর্মের প্রসার ও প্রচার ইত্যাদি ব্যাপারেও রাসূলের সুন্নত ও তরীকা বহাল রাখিতে সক্ষম ছিলেন। এইজন্যই তাহাদিগকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বা সুপথপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলা হয়। সাধারণ রাজা-বাদশাহ্ এবং খলীফার মধ্যে এই পার্থক্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। দুনিয়াতে অনেক ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারক রাজা-বাদশাহ্ই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পয়গম্বরের তাবেদারীর সহিত রাজ্য চালনার নমুনা নিতান্তই বিরল। খলীফাগণ বিশেষরূপে খোলাফায়ে রাশেদীন সর্বসাধারণকে ধর্ম পথে চালিত করার পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করিতেন বলিয়াই হযরত নবী করীম (দঃ) আদেশ করিয়াছিলেন যে—

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ○

'আমার সুন্নত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে ধারণ করা তোমাদের কর্তব্য।'

www.nagorikpathagar.org

খেলাফত আলা-মিনহাজিন্নবুওয়ত হযরত (দঃ)-এর পরে মাত্র ত্রিশ বৎসর বিদ্যমান ছিল। তৎপরেও অবশ্য অনেক সুবিচারক খলীফা জন্মগ্রহণ করত সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা রাসূল মকবূল (দঃ)-এর তরীকা হইতে অনেকখানি সরিয়া পড়ায় তাঁহাদের খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বলা চলে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, নবুওয়তের কর্তব্যাবলী এবং বাদশাহতের কর্তব্যাবলী এক সঙ্গে সমাধা করা অতীব কঠিন কাজ।

আমাদের এই বর্ণনায় নবুওয়ত, বাদশাহত এবং খেলাফতের অর্থ এবং পৃথক পৃথক অবস্থা অবগত হওয়া গেল। এই ব্যাপারে যে কয়টি অবস্থা সম্ভব, তাহা নিম্নে উদাহরণসহ লিখিত হইল ঃ

(১) কেবল নবী, যথা—হযরত মূসা (আঃ)।

(২) কেবল বাদশাহ্, যথা—তালুত এবং অন্যান্য বাদশাহগণ।

(৩) নবী ও বাদশাহ্, যথা—হযরত সোলায়মান (আঃ) অথবা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

(৪) খলীফায়ে রাশেদ, যথা—হযরত আবু বকর (রাঃ)।

(৫) খলীফায়ে মোতলক বা সাধারণ খলীফা, যথা—হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এবং অন্যান্য খলীফাগণ।

আমরা বলিয়াছি, খলীফায়ে রাশেদের মধ্যে এক দিকে যেমন সম্রাটের যাবতীয় গুণাবলী বিদ্যমান ছিল, অপর দিকে তেমনি নবুওয়তের নিদর্শনসমূহও মওজুদ ছিল। এজন্যই তাঁহাদের আদেশাবলী রাসূলের আদেশসমূহের মত অবশ্য প্রতিপালন না হইলেও কতকটা রাসূলের আদেশের মতই ধরা হইত এবং তাহা পালন করাও এক হিসাবে কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা দৃষ্ট হইবে, যাহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের কর্মধারা সাধারণ রাজনীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহারা ঐহিক শৃঙ্খলা বহাল রাখার সঙ্গেসঙ্গে পারলৌকিক বিষয়ের প্রতিও সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন—

খলীফায়ে রাশেদের কর্মধারার নমুনা ঃ

হযরত মুআয (রাঃ) আনসার গোত্রের এক নব্যযুবক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবগত দানশীলতা এত প্রবল ছিল যে, নিজের নিকট কোন কিছুই জমাইয়া রাখা তিনি পছন্দ করিতেন না। আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হওয়ায় ক্রমশঃ তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে পাওনাদারগণ তাগাদা আরম্ভ করিলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মুআয (রাঃ)-এর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয়করত ঋণ চুকাইয়া দিলেন। মুআয একেবারে কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িলেন। হযরত (দঃ) তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিয়া তাহাকে ইয়ামন প্রদেশের এক অংশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিলেন; যাহাতে তাহার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

হযরত মুআয (রাঃ) দারিদ্র্যের তিক্ততা পূর্বেই ভালভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সুযোগ পাইয়া কিছু ব্যবসায়ও আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই তাঁহার নিকট কিছু অর্থ জমা হইল। জনাব রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ওফাতের পর তিনি মদীনায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হযরত ওমর খলীফাকে পরামর্শ দিলেন যে, মুআযের নিকট অত্যধিক টাকা পয়সা জমা হইয়াছে। তাহার জীবনধারণের উপযুক্ত অর্থ তাহার নিকট রাখিয়া বাকী সব 'বায়তুল মালে' (রাজকোষে) জমা করা হউক। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, মুআয অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাহার দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (দঃ) তাহাকে ইয়ামন প্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে আমি স্বহস্তে

www.nagorikpathagar.org

তাহাকে আবার গরীব করিয়া দিব, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। অবশ্য সে নিজে দান করিলে ভিন্ন কথা।

হযরত ওমর (রাঃ) যখন দেখিলেন যে, খলীফা তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিলেন না, তখন তিনি নিজেই মুআযের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ ভাই মুআয, তোমার নিকট অনেক টাকা-পয়সা জমা হইয়াছে; এগুলি বায়তুল মালে দান করিয়া ফেল।' কিন্তু মুআয ইহাতে অমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আমার দারিদ্র্য দূর করার জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে ইয়ামনে পাঠাইয়াছিলেন, এখন আমি সব দান করিয়া আবার গরীব হইতে যাই কিরূপে?'

হযরত ওমর (রাঃ) মুআযের উত্তর শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে মুআয হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের যথাসর্বস্ব বায়তুল মালে দান করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কহিলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন আমি অতল জলে ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিলাম। আপনি যেন আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।' অতঃপর সমস্ত ধন-দৌলত খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিতকরত তাহা গ্রহণ করার অনুরোধ করিলেন এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। কিন্তু সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বলিলেন, 'আমি কিছুতেই ইহার এক কপর্দকও গ্রহণ করিতে পারিব না।' হযরত ওমর (রাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুআযকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ইহা তোমার নিজের কাজের জন্য রাখা এখন আর ক্ষতির কারণ হইবে না।'

হযরত মুআয (রাঃ) একজন অতিশয় মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। হযরত নবী করীম (দঃ) তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, 'মুআয ইবনে জবল হাশরের দিন আলেমগণের অগ্রভাগে একটি উচ্চস্থানে অবস্থান করিবে।' ইহাতেই তাঁহার মর্যাদা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এ রকম উচ্চপদস্থ সাহাবী সম্পর্কে এরূপ ধারণা তো করাই যাইতে পারে না যে, তিনি বায়তুল মালের অর্থ অপহরণে নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। শাসন কার্যের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য যে মাহিনা পাইতেন, তাহা তাহার পক্ষে হালাল ছিল। ব্যবসায়ের দ্বারা যে অতিরিক্ত অর্থ সমাগম হইয়াছিল, তাহাও নির্দোষভাবে জায়েয ছিল। এরূপাবস্থায় তাঁহার সমুদয় ধন বায়তুল মালে দাখিল করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) কেন বারংবার জিদ করিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

হযরত ওমর (রাঃ) মুআযের উপার্জিত অর্থকে হারাম অথবা সন্দেহযুক্ত ভাবিয়া এই রকম করিয়াছিলেন—তাহা বলা চলে না। যতদূর বুঝা যায়, হযরত ওমর (রাঃ) প্রাণের সহিত চাহিতেন, যাহাতে মুআযের মত পরম ধার্মিক ব্যক্তি দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত হইতে না পারেন। জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর অর্থের আবশ্যক হয়। মুআয তাঁহার জীবন ধারণের উপযুক্ত অর্থ শাসন কার্যের বিনিময়ে বায়তুল মাল হইতেই পাইতেন। তদুপরি তেজারত করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ না হইলেও তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধার্মিকের পক্ষে অশোভনীয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী ছিল। অতঃপর যখন তিনি ধন-দৌলতের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া যথাসর্বস্ব দান করার উদ্দেশ্যে প্রথম খলীফার দরবারে হাযির করিলেন, তখন তাঁহার অন্তর হইতে নিশ্চয়ই ধনের মায়া সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। এতদবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, 'এখন ইহা রাখিতে আর কিছুই দোষ নাই। কারণ, ধন মানুষের পক্ষে অপকারী নহে; ধনের মায়াই অপকারী।'

ভাবিয়া দেখুন, খোলাফায়ে রাশেদীন মুসলমানদের আত্মার সংশোধন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কতদূর সচেষ্ট ছিলেন। সাধারণ খলীফা ও রাজা বাদশাহদের মধ্যে এসব জিনিসের অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বাতুলতা নহে কি?

www.nagorikpathagar.org

আর একটি উপমা ঃ

হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের সময় যুদ্ধযাত্রী সাহাবিগণ ব্যতীত মদীনাবাসী অন্য কোন সাহাবী যাহাতে মদীনা সীমান্তের বাহিরে যাইতে না পারেন, এরূপ এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন। যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আসহাবগণ জগতের শস্য-শ্যামল ও বিলাস দ্রব্যে পরিপূর্ণ স্থানসমূহ দেখিয়া ঐহিক ভোগবিলাস বাসনায় লিপ্ত হইতে না পারেন, ইহাই খলীফা ফারূকের লক্ষ্য ছিল। এজন্যই তিনি বলিতেন, 'আমার ইচ্ছা, যাহাতে তাঁহারা দুনিয়াকে দেখিতে না পান এবং দুনিয়াও তাহাদিগকে দেখিতে না পায়।'

বাহ্যদৃষ্টিতে হয়তো হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই ব্যবস্থাকে সংকীর্ণতা এবং কঠোরতা বলা যাইতে পারে। কারণ, ভ্রমণ অথবা তেজারত (ব্যবসা) উপলক্ষে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করা শরীঅত মতেও নিষিদ্ধ নহে। ফারূকে আ'যম (রাঃ) কেবল সাহাবাগণের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ফলকথা, এমন অনেক জিনিসই খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র জীবনচরিতে দৃষ্ট হয়, যাহা সাধারণ বাদশাহগণের কার্য পদ্ধতিতে দৃষ্ট হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে।

খেলাফত ও বাদশাহতের এই প্রসঙ্গ পাঠে আমাদের বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলেন। এখন আমরা আমাদের মূল বক্তব্য আরম্ভ করিব।

ফেৎনায়ে এর্‌তেদাদ ও ভণ্ড নবীদের পরিণাম

ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করাকে ইসলামী পরিভাষায় 'এর্‌তেদাদ' বলা হয়। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খেলাফতের আসন গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথমেই ফেৎনার সম্মুখীন হইলেন। আমরা প্রথমে প্রমাণাদিসহ ব্যক্ত করিয়াছি যে, ফেৎনায়ে এর্‌তেদাদের সময় কোন পাক্কা মুসলমানই ইসলাম বর্জন করে নাই। দুই শ্রেণীর লোক এই ফেৎনায় যোগদান করিয়াছিল। প্রথম শ্রেণী—যাহারা ইতিপূর্বে মুসলমানই হয় নাই; কেবল ইসলামের ভান করিয়াছিল মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণী—যাহারা মুসলমান হইলেও ইসলামের স্বাদপ্রাপ্ত হয় নাই। কেবল প্রাথমিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল মাত্র। প্রথম শ্রেণীর কপট বিশ্বাসীগণই এই ফেৎনার প্রকৃত নায়ক ছিল। তাহারা মুসলমানদের দলে মিলিয়া প্রথম হইতেই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের ধ্বংসের চেষ্টায় ছিল। হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের পর যখন মুসলমানগণ নিতান্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাহারা নিজেদের দুরভিসন্ধি কার্যে পরিণত করার সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিল। তাহাদের অপপ্রচার ও প্রতারণায় কতিপয় অপরিপক্ক স্বল্প বিশ্বাসী নও-মুসলিমও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। সাহাবায়ে কেরামের অধ্যবসায়, ঐকান্তিক চেষ্টা এবং খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বুদ্ধিমত্তার ফলে অতিশীঘ্র এই বিদ্রোহ ব্যাহত হইয়াছিল। ভণ্ড নবীদের দলকে দমিত করিতেই মুসলমানদের বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটি ঘটনা পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সাহাবাগণ ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণে কতখানি ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মোসায়লামা কায্‌যাব ঃ

মোসায়লামা নবী করীম (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল। একবার সে রাসূল করীম (দঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, 'আমি আপনার সঙ্গে বিবাদ করিতে

www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছুক নই, কেবল চাহিতেছি যে, আমাকেও নবুওয়তে শরীক করা হউক। আমরা উভয়ে মিলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের যতদূর অংশে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারি, উহার অর্ধাংশ কুরাইশদের থাকিবে, আর অর্ধাংশ আমার হইবে।'

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) একথার যে উত্তর দিবেন, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, 'পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই দিবেন; ইহাতে আমাদের ভাগাভাগি করার কোন অধিকার নাই। কিন্তু মনে রাখিও, যাহারা খোদাকে ভয় করিয়া সুপথে চলে, তাহারাই কেবল আখেরাত পাইবে। আখেরাতই আসল মকসুদ; সুতরাং উহার জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্তব্য।'

মোসায়লামার নবুওয়ত দাবীর ভিতরে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, উহা তাহার উক্তিতেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ সে নিজেও নিজের নবুওয়ত বিশ্বাস করিত না, তাহার তাবেদারগণও তাহাতে আস্থা রাখিত না। মোসায়লামার মুআয্যিন আযানের সময় বলিত—

اَشْهَدُ اَنَّ مُسَيْلَمَةَ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ○

'আমি একথায় সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোসায়লামা নিজকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া মনে করে।'

এস্থলে ইসলামী আযানে বলা হয়—

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ ○

'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।' একবার মোসায়লামা তাহার মুআয্যিনের উক্তরূপ সন্দেহাত্মক বাক্য শুনিয়া বলিল—

اِفْصَحْ يَا حُجَيْرُ فَمَا فِى الْمَجْمَجَةِ خَيْرٌ

'ওহে হোজাইর, স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেল (যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল), এ রকম গোলমেলে কথায় কোনই লাভ নাই।'

ফলকথা, সকলেই মোসায়লামার আভ্যন্তরীণ খবর জানিত; কিন্তু স্বার্থোদ্ধারের খাতিরে অনেকে তাহার তোষামোদ করিতে তৎপর ছিল। একবার এক ধর্মত্যাগী ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, আমি এখনি মদীনা হইতে আসিতেছি। আমি স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছি যে, মুহাম্মদ (দঃ) একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, মোসায়লামাও নবুওয়তের মধ্যে আমার শরীক। বলা বাহুল্য, ইহা নিছক তোষামোদ ছিল। ইহার ভিতরে সত্যতার লেশমাত্রও ছিল না।

ইয়ামামার ময়দানে মুসলমানদের সঙ্গে মোসায়লামার এক ভীষণ সংঘর্ষ হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক মুসলমানও শহীদ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে মোসায়লামার নিধন প্রাপ্তির সঙ্গে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

এই যুদ্ধের সময়কার এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই যুদ্ধে বরা ইবনে আযেব (রাঃ) নামক সাহাবী যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল, যুদ্ধ কালে কোন কোন সময় তাঁহার শরীরে অস্বাভাবিক রকমের কম্প উপস্থিত হইত। কয়েক জন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলে তাঁহার অত্যাধিক প্রস্রাব হইত। পরে তাঁহার সাহস ও শক্তি অপরিসীম হইয়া দাঁড়াইত। ইয়ামামা যুদ্ধে যখন মোসায়লামা ও তাহার দল ভীষণ যুদ্ধের পর পশ্চাদপসরণে নিজের হাদীকা নামক দুর্গে প্রবেশকরত দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়াছিল; তখন মুসলমানগণ নিরুপায় হইয়া অগ্রগতি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় বীরবর বরা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর

www.nagorikpathagar.org

শরীরে কম্প উপস্থিত হইল। কয়েক জন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলে নিয়মিত প্রস্রাবের পর তাঁহার সাহস ও উত্তেজনা চরমে উঠিল। তিনি সঙ্গিগণকে কহিলেন, 'আমাকে দুর্গ প্রাচীরের উপরে তুলিয়া দাও।'

সঙ্গীদের মধ্যে কেহই এমন নির্দয় কাজ করিতে রাজি হইল না। তিনি শপথ সহকারে বলিলে পর তাঁহাকে প্রাচীরের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি একাকী নির্ভয়ে দুর্গের ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন। শত সহস্র বিপক্ষ সৈন্যের সঙ্গে বহুক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধের পর তিনি কিল্লার দরজা খুলিয়া দিতে সমর্থ হইলেন। এখন মুসলমানগণ বীর বিক্রমে ভিতরে প্রবেশকরত দুর্গ জয় করিলেন। যুদ্ধে মোসায়লামা নিহত হইল। এইরূপে তাহার ফেৎনা চিরতরে নির্মূল হইয়া গেল।

আরব ললনা সাজার নবুওয়ত দাবী
এবং পরে ইসলাম গ্রহণঃ

স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতা এত দূর চরমে উঠিয়াছিল যে, স্ত্রীলোকেরাও নবুওয়তের দাবী লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সাজা বনী তামীম গোত্রের স্ত্রীলোক ছিলেন। বনী তাগলাব গোত্রে তাহার মাতুল বংশ ছিল। তিনি নিজের নবুওয়ত ঘোষণা করিলে উভয় গোত্রের বহু সংখ্যক লোক তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইল। সাজার লক্ষ্য ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে পরাজিত-করত সমগ্র আরবদেশে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার প্রতি। কিন্তু পার্শ্বদেশে মোসায়লামার মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে বহাল রাখিয়া মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তিনি যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করিলেন না। প্রথমেই মোসায়লামার নিপাত সমাধা করা সঙ্গত ভাবিয়া ইয়ামামার দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। মোসায়লামা প্রমাদ গণিল! একে তো মুসলমানদের সঙ্গে তাহার শক্তি পরীক্ষা আসন্নপ্রায়। এতদবস্থায় তাহার আর একটি শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। এই ভাবিয়া সে সাজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইল; সঙ্গেসঙ্গে বিবাহ পয়গামও জ্ঞাপন করিল। সাজা রাজি হইলে উভয়ের মধ্যে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। সাজার সঙ্গিগণ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহারা বলিল, মোসায়লামা আপনার মহর দেয় নাই। সুতরাং কিছুতেই এই বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না। মোসায়লামার নিকট এই বিষয় জানান হইলে সে সাজাকে বলিল, মুহাম্মদ (দঃ) যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন, তোমার মহর বাবদ তন্মধ্য হইতে দুই ওয়াক্ত অর্থাৎ, ফজর ও এশা মাফ করিয়া দিলাম। সাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমান সঙ্গিগণের আসল কথা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। তাহাদের বড় সরদার ওতারেদ ইবনে হাজেব অত্যন্ত অনুতাপের সহিত বলিতে লাগিল—

اَمْسَتْ نَبِيَّتُنَـا اُنْثٰى نَطُوْفُ بِهَا   وَاَصْبَحَتْ اَنْبِيَاءُ النَّاسِ ذُكْرَانًا

অর্থাৎ, লোকদের নবী পুরুষ; আর আমরা নারী-নবী লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছি! ধিক আমাদের জীবন!

মিথ্যার প্রভাব কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ক্রমশঃ সাজার শিষ্যগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সাজা নিজের অসহায়াবস্থা বুঝিতে পারিয়া মাতুল বংশে অর্থাৎ, বনী তাগলাবে যাইয়া নির্জন বাস গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় ইসলাম গ্রহণকরত পাক্কা দ্বীনদার হইলেন। সাজার উজ্জ্বল পরিণাম দৃষ্টে আমরাও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন না করিয়া পারিতেছি না।

www.nagorikpathagar.org

তোলায়হা আসাদী ঃ

তোলায়হা বনী আসাদ বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও নবুওয়তের মিথ্যা দাবী লইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মুসলমান হইয়া ইসলাম ধর্মের জন্য জীবনপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবী করীম (দঃ)-এর জীবিতাবস্থায়ই তোলায়হার অভ্যুত্থান হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যেরার ইবনে আজআরকে বনী আসাদের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তোলায়হার শিষ্যগণ ক্রমশঃ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বিদ্রোহ ভাব বিদূরিত না হওয়ায় হযরত যেরার তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে তোলায়হার উপর তরবারি কার্যকরী না হওয়ায় তিনি বাঁচিয়া গেলেন। চতুর্দিকে এই খবর রটিয়া গেল যে, তোলায়হার দেহে তলোয়ার অথবা অন্য কোন অস্ত্রই কার্যকরী হয় না। ফলে পুনরায় তাহার কেরামতি বাড়িয়া গেল এবং দল পুষ্ট হইয়া পড়িল। এদিকে হযরত রাসূল মকবূল (দঃ)-এর এন্তেকাল হইয়া গেলে তোলায়হার সাহস ও শক্তি চর্তুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি তাহার ভাই হেবালের নায়কত্বে একদল সৈন্য মদীনা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধের পর হেবাল পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। অবস্থা বিবেচনা করিয়া খলীফাতুল মুসলিমীন বিচক্ষণ সেনাপতি হযরত খালেদ (রাঃ)-কে তোলায়হার নিপাতের জন্য প্রেরণ করিলেন।

বাজাখা নামক স্থানে হযরত খালেদের সঙ্গে তোলায়হার মোকাবিলা হইল। ওয়ায়না ইবনে হাসান নামক শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষও সাতশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ তোলায়হার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ওয়ায়না বারবার তোলায়হার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, হুযূর, যুদ্ধের জয়-পরাজয় সম্পর্কে কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে কি? তোলায়হা প্রত্যেক বারই অস্বীকার করিতেছিলেন। অবশেষে কয়েকটি অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, এখন আমার নিকট এই ওহী আসিয়াছে। ওয়ায়নার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহার নবুওয়তের ভিতরে সত্যতার লেশমাত্র নাই। সে ফিরিয়া আসিয়া নিজের লোকগণকে কহিল, 'এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভণ্ড তপস্বী, তাহার নিকট থাকিয়া কোনই লাভ নাই।'

ওয়ায়না তাহার লোকজনসহ ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তোলায়হার নিজের দলও ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। তোলায়হা একা রহিয়া গেলেন। তাহার ভাগ্য তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল। সুতরাং পরে তাহার সুবুদ্ধির উদয় হওয়ায় শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণ এবং অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরকালের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। কাদসিয়ার মাঠে পারস্য বাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহাত্মা তোলায়হা শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তোলায়হার জীবনের উভয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, প্রথমে তিনি প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সন্ধানই পান নাই। পরে অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়া তিনি নবজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাহ্‌রাইনবাসীদের 'এর্‌তেদাদ' এবং
মুসলমানদের প্রতি গায়েবী মদদ ঃ

পারস্য সম্রাট কেসরার পক্ষ হইতে বাহরাইন প্রদেশে মুনযের ইবনে সাবী গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মুসলমান হওয়ার পর বাহরাইনের সর্বজনমান্য সরদার জারুদ ইবনে মোয়াল্লা মদীনায় রাসূল করীম (দঃ)-এর খেদমতে হাযির হইয়া ইসলামের আহকাম শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

www.nagorikpathagar.org

করিলেন এবং প্রচারে লিপ্ত হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এন্তেকাল হইয়া গেল। মুনযের ইবনে সাবীও অসুস্থ ছিলেন; অল্পদিনের মধ্যে তাহারও মৃত্যু হইল। এই সময় আরবে যে এর্তেদাদের (ধর্ম ত্যাগের) বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, বাহ্‌রাইনেও তাহা সংক্রামিত হইয়া পড়িল। বাহ্‌রাইনে বনী বকর ও আবদুল কায়স এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের বসতি ছিল। বনী বকর পূর্ণভাবে মোরতাদ হইয়া গেল। আবদুল কায়সের লোকেরাও ইতস্ততঃভাবের মধ্যে নিপতিত হইল। সরদার জারুদ ইসলাম ধর্মে দৃঢ়পদ ছিলেন। তিনি স্বগোত্র আবদুল কায়সের লোকগণকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া জারুদকে কহিতে লাগিল, 'আপনি যে সমস্ত কথা বলেন, তৎসমুদয়ই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইসলামী আহকামের নিখুঁত সৌন্দর্যের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ এই যে, মুহাম্মদ (দঃ) যদি নবী হইতেন, তবে তাঁহার মৃত্যু হইল কেন?'

জারুদ কহিলেন, 'আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি—মুহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্বে আর কোন নবী আসিয়াছিলেন কিনা?'

তাহারা বলিল, 'কেন, অনেক নবী আসিয়াছিলেন।'

জারুদ বলিলেন, 'তবে তাঁহারা কোথায় গেলেন?'

সকলে কহিল, 'তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।'

এই বার জারুদ বলিতে লাগিলেন, 'সকল পয়গম্বরেরই যদি মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে শেষ নবীর মৃত্যু হইবে না কেন? মানব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী নহে। ইসলাম তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী শিক্ষা দিয়াছে—পয়গম্বরের নহে। সুতরাং পয়গম্বরের মৃত্যু হওয়াতে তোমাদের ধর্ম ত্যাগের কোনই কারণ নাই।'

জারুদের এই সারগর্ভ বক্তৃতায় আবদুল কায়স সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মে স্থায়ী হইল। কিন্তু বনী বকরের দুর্দান্ত লোকেরা মুসলমানদের প্রতি নানাভাবে নিপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের পথ-ঘাট, রসদ বন্ধ করা হইল। আবদুল কায়স বংশের উদীয়মান কবি আবদুল্লাহ্ ইবনে হযফ একটি কবিতায় নিজেদের নিঃসহায় অবস্থার কথা লিখিয়া প্রথম খলীফার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত কবিতার একাংশ এই—

الا ابلغ ابا بكر رسولا وفتيان المدينة اجمعينا

'(খলীফা) আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট বার্তাবাহকরূপে আমাদের সংবাদ পৌঁছাইয়া দাও; আর মদীনার সমস্ত যুবকদের নিকটেও (বলিয়া দাও)'

فهل لكم الى قوم كرام قعودا فى جواثا محصرين

'তোমাদের এ রকম শরীফ কওমের সাহায্য করার খেয়াল হয় না, যাহারা জাওয়াসা নামক স্থানে অবরুদ্ধাবস্থায় অবস্থান করিতেছে?'

খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খবর পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)-কে সৈন্যসহ বাহ্‌রাইনের বিদ্রোহ দমন এবং মুসলমানগণকে উদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করিলেন। পথে অনেক সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় তাঁহার সৈন্যদলে যোগদান করিল। এরূপে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল।

www.nagorikpathagar.org

সেনাপতি আলা এক রাত্রে কাফেলাসহ্ এক মাঠে বিশ্রাম মানসে অবতরণ করিলেন, সৈন্যগণ উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে এখনও আসবাবপত্র নামাইতেছিল এমন সময় হঠাৎ উটগুলির মধ্যে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে উটের পাল বনমধ্যে উধাও হইয়া গেল। সৈন্যদের যাবতীয় আসবাবপত্র, পানীয়, খাদ্য সমস্তই উটের সঙ্গে চলিয়া গেল। এক্ষণে মুসলমান-দের আর বিপদের পরিসীমা রহিল না। খাদ্য ছাড়া হয়তো লোকে দুই একদিন বাঁচিতে পারে; কিন্তু মরুভূমির ভিতরে প্রাতঃকালে সূর্য ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেই যে পানি বিহনে সকলের প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এদিকে আবার শত্রুর আক্রমণও অসম্ভব নহে। ভাবী সঙ্কট চিন্তা করিয়া মুসলমানগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

সেনাপতি আলা কিন্তু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের ভাবও প্রকাশ করিলেন না। তিনি শান্ত বদনে সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ফজরের নামায বাদ হযরত আলা হাযরামী সৈন্যগণসহ আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনে দো'আ করিতে লাগিলেন, 'আয় খোদা! আমরা কেবল আমাদের প্রাণের জন্যই চিন্তিত নহি। আমরা নিধন প্রাপ্ত হইলে দ্বীন ইসলাম যে আরো বিপন্ন হইয়া পড়িবে, ইহাই আসল চিন্তার বিষয়।'

সকলে দো'আয় রত থাকিতে থাকিতেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে এক প্রস্রবণ ধারা প্রবাহিত হইতেছে। সকলে পরমানন্দে আল্লাহ্‌র শোকর আদায়করত প্রাণ ভরিয়া পানি পান করিলেন এবং পাত্রসমূহ পরিপূর্ণ করিয়া লইলেন। আশু প্রাণ নাশের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হওয়ায় সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। এদিকে সূর্যোদয়ের পরক্ষণেই উটের পালও আসিয়া দেখা দিল। আশ্চর্যের বিষয়, উটের পিঠে যে সমস্ত আসবাব ছিল উহার একটিও বিনষ্ট হয় নাই।

এই যুদ্ধাভিযানের ফল নিশ্চয় মুসলমানদের জন্য উত্তম হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এস্থলে যুদ্ধের ইতিবৃত্ত বর্ণনার অভিপ্রায় রাখি না; উল্লিখিত গায়েবী মদদের মধ্যে ইসলামী সৈন্যদলের জন্য যে সৎশিক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই এস্থলে ব্যক্ত করিব।

খোদা তা'আলা এই আশ্চর্য ঘটনা দ্বারা মুসলমানদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র ধর্ম তথা ইসলামের প্রচার এবং রক্ষণাবেক্ষণ তিনি নিজেই করিয়া থাকেন। ইহা বাহ্যিক উপকরণ, উপলক্ষ্য অথবা মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভর করে না। অবশ্য মানুষের চেষ্টাকে বাহ্যিক উসিলার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে এবং ইহাতে চেষ্টাকারীদের অশেষ সওয়াবও লাভ হইয়া থাকে। ইসলামকে বিপদাপন্ন করিয়া যে মানুষের পুণ্য সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া দেন, এই হিসাবে ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুকম্পার নিদর্শন। উপরোক্ত ঘটনায় প্রথমে মুসলমানদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় নিপতিতকরত পরে অলৌকিক সাহায্য দ্বারা বিপদ দূর করিয়া তাহাদিগকে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছেন, যেন তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতার উপর কখনও ভরসা না করেন; সর্বাবস্থায় অসহায়ের সহায় আল্লাহ্‌র প্রতিই যেন নির্ভর করিতে থাকেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এই লশকরের মধ্যে ছিলেন। তিনি উক্ত স্থান হইতে যাত্রাকালে এক পাত্রে পানি পূর্ণ করিয়া সেখানে রাখিয়া গেলেন। পরে একজন লোক মারফতে খবর জানিতে পারিলেন যে, পাত্রটিতে পানি রহিয়াছে। কিন্তু যে প্রস্রবণ ছিল উহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। আবু হুরায়রা কহিলেন, 'এখন আর একথায় সন্দেহমাত্র নাই যে, আমাদের সাহায্যের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই পানি অল্পক্ষণের জন্য দান করিয়াছিলেন।'

—তারিখুল কামেল দ্রষ্টব্য

www.nagorikpathagar.org

মালেক ইবনে নবিরার এর্তেদাদ ঃ

মালেক ইবনে নবিরা পূর্ব বর্ণিত মহিলা সাজার শ্রেষ্ঠ সহচর ছিল। মালেক ধর্ম ত্যাগ এবং সাজার তাবেদারী বরণ করিলেও সাজাকে মদীনা আক্রমণ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। সাজার নবুওয়ত সমাপ্ত হইলে পর মালেক কৃত পাপের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। তখন সে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে একত্রিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'দেখ ভাইগণ! আমরা মুহাম্মদ (দঃ)-এর খলীফা আবু বকরের বিরুদ্ধাচরণ ও ইসলাম ত্যাগ করিয়া ভাল করি নাই। মুসলমানদিগকে যে আল্লাহ্ তা'আলা পদে পদে সাহায্য করিতেছেন, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ। এ রকম ধর্মনিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কেহই শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। এখনও যদি তোমরা সুপথে প্রত্যাবর্তন কর, তবে রক্ষার উপায় আছে।'

মালেকের বক্তব্যের যৌক্তিকতা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করিল। পরামর্শ হইল, সকলে খলীফার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের যাওয়া হইল না। ইতিমধ্যেই হযরত খালেদ মদীনা হইতে বিদ্রোহ দমনের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে পৌঁছিলেন। হযরত খালেদ, মালেক ও তাহার সঙ্গীদের পরামর্শের কথা জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহাদের সকলকে গ্রেফতার করিলেন। এই সময় প্রবল শীতের মওসুম ছিল। রাত্রে হযরত খালেদ রক্ষিগণকে আদেশ করিলেন— دافئوا اسراكم 'তোমাদের কয়েদিগণকে শীত নিবারণার্থে আগুনের তাপ দান কর,' কিন্তু আরব দেশের কোন কোন স্থানের প্রচলিত কথায় ইহার অর্থ এ রকম হয় যে, 'বন্দিগণকে বধ কর।' সৈন্যগণ শেষোক্ত অর্থ বুঝিয়া বন্দীদের বধক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল। সেনাপতি খালেদ গণ্ডগোল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বেই মালেক ও তাহার সঙ্গিগণকে বধ করা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, 'খোদার ইচ্ছা রদ করার ক্ষমতা কাহারও নাই।'

আরব কবীলাসমূহের ধর্ম ত্যাগের ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল। হয়তো কোন অজ্ঞ ব্যক্তি এর্তেদাদের ঘটনাবলী দৃষ্টে এমন ধারণা করিতে পারে যে, লোকগণকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করান না হইয়া থাকিলে, তাহারা কিছুতেই ইসলাম বর্জন করিতে তৎপর হইত না। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম ত্যাগের যে কারণ ব্যক্ত করিয়াছি। তাহা নিশ্চয়ই এই সন্দেহ ভঞ্জনের পক্ষে যথেষ্ট। উপসংহারে আমরা এর্তেদাদের কারণ আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

এর্তেদাদের কারণসমূহ ঃ

(১) আরববাসীদের স্বভাব এমনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিত না। তৎসঙ্গে বহু শতাব্দীর স্বাধীনতা ও উশৃঙ্খলতার ফলে অবাধ্যতা তাহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক গোত্র নিজদিগকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিত; কেহই অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে রাজি হইত না। এজন্যই পারস্য সম্রাট কেসরার মত প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহও বহু চেষ্টায় তাহাদিগকে বশ করিতে সক্ষম হন নাই। এই আত্মম্ভরিতা ও আত্ম-প্রাধান্য কামনাই অনেক সম্প্রদায়ের জন্য ঈমান আনয়নের অন্তরায় হইয়াছিল। মোসায়লামা সম্প্রদায়ের কথাই ধরুন! মোসায়লামা নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে এ রকম ভাবিয়াছিল যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজত্ব লাভের জন্যই নবুওয়তের দাবী করিতেছেন। সুতরাং তাহার বিবেচনা মত রাজত্ব লাভের এমন সহজ উপায় পরিত্যাগ করা কখনও সঙ্গত ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

বনী হানীফার হাজার হাজার যোদ্ধাও তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। মোসায়লামা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সঙ্গে একথার উপরে সন্ধির প্রস্তাব করিল যে, 'আমরা উভয়ে মিলিয়া পৃথিবী জয় করিব এবং তাহা ভাগাভাগি করিয়া লইব।' কিন্তু হযরত রাসূল (দঃ)-এর তো রাজ্য লক্ষ্যস্থল ছিল না; উদ্দেশ্য ছিল সত্যধর্ম প্রচার। অতএব, মোসায়লামাকে পরিষ্কার উত্তর দেওয়া হইল।

আসওয়াদে আনাসীর কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি তাহার মনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লোভ জাগরুক হইয়াছিল এবং এই লোভের বশেই সে নবুওয়তের বোল ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোসায়-লামা এবং আসওয়াদের অবস্থা সমালোচনায় দেখা যায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই হয় নাই। তাহারা হযরত (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই মিথ্যা নবুওয়ত নিয়া প্রচার আরম্ভ করিয়াছিল। অবশ্য তাহাদের দলে স্বগোত্রীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনেক কাঁচা মুসলমানও যোগ দিয়াছিল।

(২) মদীনা শরীফ মুনাফেকদের অস্তিত্ব হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পূর্বেই হযরত (দঃ)-এর এন্তেকাল হইয়াছিল। মুনাফেকগণ সর্বদাই ইসলামের মূলোৎপাটনের চেষ্টায় তৎপর ছিল। হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের পর এর্তেদাদের আন্দোলনে এই মুনাফেক শ্রেণী বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

(৩) খৃষ্ট ধর্মের শাখা-প্রশাখাও আরবের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। আরব খৃষ্টানদের প্রতি রোম সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা মওজুদ ছিল। ফেৎনায়ে এর্তেদাদের পশ্চাতে খৃষ্টানদের হাত ছিল।

(৪) ইসলামের মূলোচ্ছেদের জন্য যতগুলি দল চেষ্টান্বিত ছিল, তন্মধ্যে ইহুদী সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহারা সত্যধর্ম বিনষ্ট করিতে কোন প্রকার অপচেষ্টারই বাকী রাখে নাই। সর্বশেষে কূটনৈতিক ইহুদীগণ এক নূতন ফন্দি বাহির করিয়াছিল। তাহা এই যে, তাহাদের কতক লোক ইসলামের ভান করিয়া মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইত; পরে আবার ইসলাম ত্যাগের ভানকরত ইহুদীদের সঙ্গে যোগ দিত। কেহ কোন মতবাদকে গ্রহণ করার পর তাহা পরিত্যাগ করিলে স্বভাবতই স্বল্পবিশ্বাসী লোকদের সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ছিদ্রান্বেষী লোকদের নিকট তাহাদের কথা খুবই মূল্যবান হয়। এজন্যই ইহুদীগণ ইসলামের প্রতি এই শেষ অস্ত্র ব্যবহারের গোপন পরামর্শ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাদের এই পরামর্শের কথা কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শুনুন—

قَالَتْ طَّآئِفَـةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

অর্থাৎ, 'গ্রন্থধারীদের এক দল বলিল, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের প্রতি প্রাতঃকালে ঈমান আন এবং সন্ধ্যায় তাহা বর্জন কর; ইহাতে হয়তো মুসলমানগণও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিবে।'

এই কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইসলামের দুশ্‌মনদের এবংবিধ যাদু-মন্ত্র কার্যকরী হইয়াছিল এবং ধর্ম ত্যাগের এক প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময় এমন একটি দলও ছিল যাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে রাজি ছিল। কিন্তু মালের যাকাত দিতে নারায ছিল। সাহাবাগণের অধিকাংশ এরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, যাহারা মুসলমান থাকিয়া যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কখনও উচিত নহে। সেই সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদের এই মত বাহ্যতঃ যুক্তি-যুক্ত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, সে সময়

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানগণ কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মোহাদ্দেস নববী মুসলিম শরীফের টীকায় লিখিতেছেন যে, এই বিদ্রোহকালে মক্কার মসজিদে হরম, মদীনার মসজিদে নববী এবং মসজিদে আবদুল কায়স এই তিন মসজিদ ব্যতীত আর কোথাও আযান হইত না। এইরূপ সঙ্কটময় মুহূর্তে যাকাত না দেওয়ার অপরাধে মুসলমানদের এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বাহ্য দৃষ্টিতে অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অন্তর্দৃষ্টি বহু দূর প্রসারী ছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সময় সামান্য মাত্র অবহেলা করার অর্থ হইবে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব চিরতরে দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলা। খলীফা অতিশীঘ্র এই ফেৎনা দমনের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যে ইহাও ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'যাহারা যাকাত দিতে অস্বীকার করিবে, আমরা তাহাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিব।' এই আদেশ সাহাবাগণের মতের বিরুদ্ধে হইলেও তাঁহারা নত মস্তকে তাহা মান্য করিলেন। মুসলমানদের দৃঢ়তার ফলে অতিসত্বরই ফেৎনা উপশমিত ও নির্মূল হইয়া গেল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, এই বিপদকালে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি আমাদের পরিচালক না হইলে নিশ্চয়ই আমরা ধ্বংস মুখে পতিত হইতাম।

■

www.nagorikpathagar.org

দশম অধ্যায়

ইসলামের প্রচার, বিজয়াভিযান ও গায়েবী মদদ

উসামা (রাঃ)-এর যুদ্ধযাত্রা ঃ

হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ) এন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর অধীনে একদল সৈন্য সিরিয়ায় পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া শহরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই হযরত (দঃ)-এর এন্তেকালের কারণে সৈন্যদের আর অগ্রগমন হইল না। এদিকে আরবের সর্বত্র এর্তেদাদের ফেৎনা আরম্ভ হইয়া গেল। এই সময় এই সৈন্যদল রাজধানী ছাড়িয়া যাওয়া কাহারও নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। স্বয়ং সেনাপতি উসামাও বলিলেন যে, 'বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী বিস্তর লোক আমার সঙ্গে আছেন। এ রকম সঙ্কটকালে এই দল বাহিরে চলিয়া গেলে রাজধানী তথা খলীফা তদীয় সহকর্মিগণ এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পরিজন নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিবেন।'

সর্বশেষে হযরত ওমর (রাঃ) মুসলিম জনসাধারণের পক্ষ হইতে খলীফার নিকট আবেদন জানাইলেন যে, এই সময় বাহিরে সৈন্য প্রেরণ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু খলীফা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন ঃ

'যদি বন্য কুকুর ও ব্যাঘ্র আমাকে থাবা মারিয়া লইয়া যায়, তবেও আমি এই সৈন্যদল প্রেরণ করিব। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আমি কিছুতেই উহার পরিবর্তন করিতে পারিব না। যদি এই অঞ্চলে একা আমি ব্যতীত আর জনপ্রাণী না থাকে, তাহাতেও এই পরিকল্পনার ব্যতিক্রম হইবে না; নিশ্চয়ই পরিকল্পনানুযায়ী লশকর পাঠাইব।'

—তারিখে কামেল, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১২৭

ফলকথা, হযরত উসামা (রাঃ) সৈন্যসহ রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দৃঢ়তার সুফল শীঘ্রই দেখা গেল। ইসলামের বৈরিগণ বুঝিল যে, মুসলমানদের নিকট যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে কখনও তাহারা এই সময় যুদ্ধাভিযান করিতে সাহসী হইত না। এই ধারণার বশে অনেকেই দমিয়া গেল এবং বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করিল।

হযরত উসামা (রাঃ) একে তো অল্প বয়স্ক ছিলেন, তাঁহার বয়স মাত্র সতের বৎসর ছিল; দ্বিতীয়ত, তিনি গোলামের পুত্র ছিলেন, এই জন্য মুসলমানদের অনেকে তাঁহার সৈনাপত্যে আপত্তি করিতেছিলেন। এবারও হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদের আপত্তি খলীফার দরবারে পেশ করার পর আরয করিলেন যে, কোন বয়ঃপ্রবীণ লোককে সেনাপতিত্ব প্রদান করাই সঙ্গত হইবে। প্রথম খলীফা এস্থলে আর একবার অতুলনীয় স্থিরমতিত্বের পরিচয় দিলেন। দৃঢ়ভাবে কহিলেন, 'হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয়।'

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর (রাঃ) এ রকম অটল ধৈর্যশীল, দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ ছিলেন বলিয়াই ইসলাম জগতে তাঁহার প্রথম খলীফার পদ লাভ হইয়াছিল এবং তিনি এমন টলটলায়মান অবস্থায় ইসলাম তরীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উল্লিখিত অবস্থা মুসলমানদের পক্ষে দারুণ পরীক্ষার সময় ছিল তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এ সময় খলীফা অথবা মুসলমান নাগরিকদের সামান্য অসাবধানতা অথবা পদস্খলন হইলে দুনিয়ার বুক হইতে ইসলাম ধর্ম চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে দেখা যায়, এই ঘটনাবলীতে বহুবিধ গুপ্ত রহস্যও বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা দ্বারা ইসলামের জ্যোতি ম্লান হওয়ার পরিবর্তে চতুর্গুণ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কতিপয় রহস্য উদ্ধারঃ

(১) আল্লাহ্‌র আদেশ শরীঅতের আহ্‌কাম জগৎময় প্রচার করা আরববাসী মুসলমানদের কর্তব্যের প্রধান অংশ ছিল। এই কর্তব্য পালনার্থে প্রচার কার্য চালনা এবং অবস্থাভেদে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে অনিবার্য ছিল। কিন্তু আরবের ভিতরে বিদ্রোহী দলের শিকড় যেভাবে জালের মত সর্বত্র ছড়াইয়া ছিল, তাহা নির্মূল না করিয়া মুসলমানদের পক্ষে বাহিরে কোন প্রকার অভিযান করা মোটেই নিরাপদ ছিল না। এর্‌তেদাদের ফেৎনা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকারান্তরে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন লোকসমূহের মূলোৎপাটনেরই সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

মানবদেহে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তাহা বাহির করা খুবই কঠিন। কিন্তু তাহা ফোটকের আকারে প্রকাশ পাইয়া পাকিয়া উঠিলে নির্বিঘ্নে বিদূরীত করা চলে। আরবের জনসমাজকে একটি মানব দেহের আকারে ধারণা করিলে আমরা বলিতে পারি যে, বিদ্রোহের সময় এই দেহের যাবতীয় দূষিত পদার্থ পরিপক্ক অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং মুসলমানগণ অস্ত্রোপচার দ্বারা সহজেই তাহার সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় একবার মনের সাধ মিটাইয়া ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরিণামে তাহাদের অনেকেই সাহাবাদের সঙ্গে মিলামিশার সুযোগ পাওয়ায় এই কথা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাওয়া আত্মঘাতি হওয়ার শামিল। ফলে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই পূর্ণভাবে ইসলামের অনুগত হইয়া অবশিষ্ট জীবন সত্য ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমর ইবনে যাদি এবং তোলায়হা আসাদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত ছিল, তাহারা মুসলমানদের প্রবল বিক্রম ও দুর্দম গতির সম্মুখে ধূলিকণার মত উড়িয়া গিয়াছিল। জগতের বুক হইতে তাহারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল।

(২) ফেৎনায়ে এর্‌তেদাদের সময় মুষ্টিমেয় মুসলমানের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। সমগ্র পৃথিবীময় মুসলমানদের শত্রু ছিল। একদিকে রোমক খৃষ্টানগণ ইসলাম ও মুসলমানদিগকে নিপাত করিতে তৎপর ছিল। অপরদিকে পারস্য সম্রাট নবজাগ্রত আরবের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। আরবের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই ছিল যে, পল্লীতে পল্লীতে শত্রু, ঘরে ঘরে শত্রু! এরূপাবস্থায় মুসলমানগণ বিশেষরূপে প্রথম খলীফা

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর (রাঃ) যেরূপ অটলতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কেবল ইসলামের উজ্জ্বলতম ইতিহাসেই প্রাপ্তব্য ; অন্য কোথাও ইহার নমুনা পাওয়া যাইবে না। বাস্তবপক্ষে ইসলাম ধর্ম বিশ্বময় প্রচার লাভ করার ইহাই প্রধান কারণরূপে গণ্য।

(৩) প্রথম খলীফা হযরত সিদ্দীক (রাঃ)-এর দৃঢ়তার যে নমুনা উল্লিখিত ঘটনাসমূহে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রায় সমস্ত সাহাবাই এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যাহারা ইসলাম ধর্মকে স্বীকার করে, কিন্তু কেবল যাকাত দিতেই তাহাদের আপত্তি, এ রকম লোকদের সঙ্গে এই সময় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। খলীফা তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, অধিকন্তু তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিলেন যে, কেহ যাকাতের সামান্য অংশও যদি আটক করে, তাহার বিরুদ্ধেও তরবারি ধারণ করা হইবে। বলা বাহুল্য, তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, অঙ্কুরাবস্থায় এ সমস্ত ব্যাপারে সামান্য শৈথিল্য করা হইলেও অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের নাম ব্যতীত সমুদয় সারাংশ নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে সিরিয়া প্রেরণ সম্পর্কে দুই দফা সাহাবাগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলেও তিনি স্বমতে অটল অচল রহিলেন। এস্থলেও যদি শৈথিল্য দেখান হইত, তবে এখান হইতেই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবস্থাদির বাহিরে পা রাখার সূত্রপাত হইত। কারণ, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দলকে সিরিয়া গমনের আদেশও হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিয়াছিলেন। অবশ্য হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ দিয়াছিলেন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রাষ্ট্রনায়ক এই আদেশ সাময়িকভাবে রহিত বা আংশিক পরিবর্তিত করিলে তাহাতে ধর্মের অঙ্গহানি হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এজন্যই সাহাবাগণও এ রকম আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এই পরিবর্তনের ছিদ্র পথে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে অনেক সুন্নত এবং শরীঅতের বিধানও বাদ পড়িতে পারিত। এই হিসাবে খলীফার ব্যবস্থা যে খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

(৪) উল্লিখিত তিনটি ব্যাপারে সমস্ত সাহাবার মতের বিরুদ্ধে খলীফা নিজের মতকে প্রাধান্য দান করিয়াছিলেন। প্রথম খলীফার এই কার্যাবলী দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হুবহু ইসলামী ব্যবস্থার অনুরূপ এ রকম বলা চলে না। অবশ্য অনেক সময় ভোটাধিক্য দ্বারাও মীমাংসা হইত, কিন্তু সমস্ত ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, মীমাংসার মূলভিত্তি যুক্তি প্রমাণের উপরেই রক্ষিত হইত, ভোটের উপরে নহে। মন্ত্রণাদাতাগণের মতামত জিজ্ঞাসা করা হইত কেবল বিষয়ের সমস্ত বাহ্য পরিস্থিত হওয়ার জন্য। পরামর্শের পর খলীফাই সব দিক বিবেচনা করিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা করিতেন। অবশ্য নিজের রায় ভ্রমপূর্ণ সাব্যস্ত হইলে, তাহা বর্জন করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না।

সাহাবাগণের প্রচারাভিযান ঃ

এর্তেদাদের ফেৎনা দমন করার পরই সাহাবাগণ ধর্ম প্রচারে মনোযোগ দিলেন এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই ইসলামের আলোকে জগৎকে আলোকিত করিলেন। ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই যে, ইসলামের জাতিগত সৌন্দর্য এবং আকর্ষণী শক্তি ইসলাম প্রচারের আসল উপকরণ। তৎসঙ্গে

www.nagorikpathagar.org

সাহাবায়ে কেরামের চারিত্রিক মাধুর্য মিলিত হওয়ায় লোকদের পক্ষে সহজেই ইসলামকে বুঝিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সাহাবাগণের সংস্রবে অল্পকাল থাকিলেই বুঝিতে পারা যাইত যে, ঐহিক সম্পদের প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ে সামান্যমাত্র আকর্ষণও বিদ্যমান ছিল না। অবশ্য তাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিকর্ম, শিল্পকর্ম ইত্যাদি যাবতীয় দুনিয়াদারীর কাজও করিতেন, কিন্তু হস্তপদ কাজে লিপ্ত থাকিলেও মন সর্বদাই আল্লাহ্‌র ভাবে বিভোর থাকিত।

ফলকথা, সাহাবাগণ ইসলামী আদর্শের পূর্ণ নমুনা ছিলেন। তাঁহাদের বাহ্যাকৃতি এবং আচরণই ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কারণ হইত। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, ঘটনাবলীর চাপে ইসলাম প্রচার উপলক্ষে তাঁহাদের বহু যুদ্ধবিগ্রহেও লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। একথাও ঠিক যে, তাঁহাদের যুদ্ধ-কৌশল, বীরত্ব এবং সাহসের যে সমস্ত কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তৎসমূদয়ের তুলনাও জগতের ইতিহাসে বিরল। কিন্তু এস্থলে আমরা পাঠকগণকে সাহাবায়ে কেরামের বীরত্ব কাহিনী শুনাইতে ইচ্ছুক নহি। লোকদের অন্তঃকরণে কিভাবে ইসলাম ধর্ম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অত্যল্পকালের মধ্যে কিরূপে বিশ্বময় ইসলাম ধর্ম প্রচার লাভ করিয়াছিল ঐতিহাসিক ঘটনার ভিতর দিয়া তাহাই কেবল প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রচারের নির্মল আদর্শ এবং তাঁহাদের প্রতি গায়েবী মদদের অসংখ্য কাহিনী ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। এস্থলে তৎসমুদয় হইতে কতিপয় ঘটনা উপমাস্বরূপ উদ্ধারকরত আমাদের দাবীর সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

দারবুন বিজয় এবং
সাগর শুষ্ক হওয়ার অলৌকিক ঘটনা ঃ

বাহরাইনবাসীদের ধর্ম ত্যাগ এবং আলা হাযরমী কর্তৃক তাহাদের দমিত হওয়ার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময় মুসলমানদের প্রতি যে অলৌকিক গায়েবী সাহায্য প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাও লিখিত হইয়াছে। আলা হাযরমীর আক্রমণকালে অনেক বিদ্রোহী পলায়নপূর্বক দারবুন নামক উপদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। এই দ্বীপ প্রথমেও ইসলাম বৈরীদের আবাসস্থল ছিল। এক্ষণে পলাতক দল সেখানে একত্রিত হওয়ায় আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। সেনানায়ক অবস্থা দৃষ্টে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। দারবুনে যে রকম বিদ্রোহী দলের সমাবেশ হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক আতঙ্কের কারণ। আবার দারবুন আক্রমণ করিতে গেলেও পশ্চাৎদিক হইতে শত্রুদল কর্তৃক বাহরাইন আক্রান্ত হওয়ার ভয় রহিয়াছে।

নানাদিক ভাবিয়া সেনাপতি আলা বাহরাইন আক্রান্ত হইবার যে যে পথ ছিল স্থানীয় মুসলমানগণ দ্বারা সে সমস্ত রাস্তা সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া সৈন্যসহ তিনি স্বয়ং দারবুনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দারবুনে পৌঁছিতে নৌকার আবশ্যক ছিল। অথচ মরুবাসী মুসলমানদের নিকট নৌকার কোন সরঞ্জামই ছিল না। কিন্তু হযরত আলা এ রকম ব্যক্তি ছিলেন না, যাহাকে সমুদ্রের রুদ্রমূর্তি ভীত ও সন্ত্রস্ত করিতে পারে। আলা সৈন্যগণকে একত্রিতকরত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

'ভাইগণ, তোমরা অবগত আছ যে, দুশমনগণ ঐ দারবুন দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানে তাহারা ইসলাম ধর্মকে জগৎ হইতে নিশ্চিহ্ন করার নিমিত্ত সর্বপ্রকার শক্তি একত্রিভূত করিতেছে। আমি জানি, আমাদের নিকট সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকা অথবা অন্য কোন সরঞ্জামই নাই।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আমি একথায়ও পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্‌র মদদের নিকট ইহা অতি তুচ্ছ জিনিস। তোমরা শুষ্ক ভূমিতে ইতিপূর্বেই খোদার সাহায্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করিয়াছ।[১] তোমাদের পক্ষে সমুদ্রেও তদ্রূপ সাহায্যের আশা রাখা বাঞ্ছনীয়। তোমরা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়।'

সৈন্যদের মধ্যে উষ্ট্রারোহী, অশ্বারোহী, গর্দভ ও অশ্বতরারোহী, পদাতিক—সকল রকমের লোকই ছিল। দলপতির আদেশ মাত্র সকলেই তরঙ্গায়িত সমুদ্র জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সাগরতট হইতে দারবুন দ্বীপ এক দিবারাত্রের পথে অবস্থিত। আশ্চর্যের বিষয়, সাগরের পানি এত কমিয়া গিয়াছিল যে, ঘোড়া ও উটের কেবল পাগুলি পানিতে ডুবিত। সমস্ত সৈন্য সমুদ্র জলে এমন আরামের সহিত চলিতে লাগিল, যেমন সিক্ত বালুকা রাশির উপর দিয়া যাইতেছে। তাহারা সকলে নির্বিঘ্নে দারবুনে যাইয়া পৌঁছিল।

এদিকে দারবুনের অধিবাসীরা নিশ্চিন্তে কাল যাপন করিতেছিল। তাহারা স্বপ্নেও এমন কল্পনা করিত না যে, মুসলমানগণ কোন প্রকারে এখানে আক্রমণ করিতে পারিবে। মুসলমানগণ অতর্কিতভাবে পৌঁছিলে তাহাদের বাধা দেওয়ার অবসরও হইল না। বিনা বাধায় দারবুন মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল।

খোদা তা'আলা মুসলমানদের জন্য সমুদ্রমধ্যে গমন পথ প্রস্তুত করিয়া, যেন একথাই বুঝাইয়া দিলেন যে, ইসলামের গতিপথে কোন বাধাবিঘ্নই টিকিয়া থাকিতে পারে না। সত্য ধর্মের দুর্বার গতির সম্মুখে আকাশ চুম্বী পর্বতও মাথা হেট করিয়া দেয়, অতল সমুদ্রও নিজের বুক চিরিয়া পথ করিয়া দেয়। ইসলাম প্রচার ব্যাপারে এবংবিধ অলৌকিক সাহায্য দৃষ্টে কোন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইসলামের সত্যতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না।

হিজর নামক স্থানের অধিবাসী এক খৃষ্টান রাহেব[২] আলা হাযরমীর সৈন্যদলের সঙ্গে ছিল। সে স্থল-জল উভয় স্থানে মুসলমানদের প্রতি গায়েবী মদদের ঘটনা দেখিয়া ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কেন মুসলমান হইলে?' তদুত্তরে সে কহিল, 'আমি মুসলমানদের তিনটি এমন অলৌকিক ব্যাপার চাক্ষুষ করিয়াছি, যাহার পর ইসলাম সত্য ধর্ম হওয়াতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ মুসলমানদের জন্য মরুভূমির বালুকারাশিতে পানির ফোয়ারা বাহির হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রের ভিতর দিয়া তাহাদের জন্য পথ হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ আমি ইসলামী সৈন্যদলে থাকিয়া রাত্রিকালে আকাশ হইতে একটি দো'আ উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছিলাম।' কেহ জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই দো'আটি কি?' রাহেব বলিল, তাহা এই—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ لَآاِلٰهَ غَيْرُكَ وَالْبَدِيْعُ لَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَّالدَّائِمُ غَيْرُ الْغَافِلِ وَالْحَىُّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ وَخَالِقُ مَايُرٰى وَمَا لَايُرٰى وَكُلَّ يَوْمٍ اَنْتَ فِىْ شَاْنٍ وَّعَلِمْتَ اَللّٰهُمَّ كُلَّ شَىْءٍ بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ ○

টীকা

১ আলা হাযরমীর সৈন্যদের জন্য মরুভূমিতে অল্পকালের জন্য পানির নহর প্রকাশ পাইয়াছিল ইত্যাদি।

২ রাহেব—পাদ্রী।

www.nagorikpathagar.org

রাহেব আরও কহিল—'এই সমস্ত ঘটনা দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, মুসলমানদের কাজে আসমানের ফেরেশতাগণ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইসলাম ধর্ম হক না হইলে এরূপ কখনও হইত না।'

যাহার সামান্য মাত্রও জ্ঞান আছে, সে-ও একথা বুঝিতে সক্ষম যে, উল্লিখিত রাহেব ঈসায়ী ধর্মের আলেম ও ধর্মযাজক ছিল। তাহাকে কেহ ধর্মান্তর গ্রহণে সামান্য বলপ্রয়োগও করে নাই। সে মুসলমানদের সৈন্যদলে থাকিয়া নির্বিঘ্নে স্বীয় ধর্মকর্ম পালন করিতেছিল। এরূপাবস্থায় তাহার ইসলাম গ্রহণ নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধিতেই হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে যদি বলপ্রয়োগের প্রথা ও রীতি থাকিত, তবে সৈন্যদলের সঙ্গে এই রাহেবের একা অবস্থান করাও সে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারিত না।

সাহাবাগণ সর্বদাই আল্লাহ্‌র রহ্‌মত এবং সাহায্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখিতেন। তৎসঙ্গে এই সমস্ত সাহায্য চাক্ষুষ করিয়া তাঁহাদের ঈমান, উৎসাহ, উদ্যম আরও চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইত। আফিফ ইবনে মুনযের নামক ইসলামী কবি উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে এক কবিতায় বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ঃ

دَعَـوْنَـا الَّذِىْ شَقَّ الْبِحَـارَ فَجَاءَنَا   يَا عَجَبَ مَنْ فَلَقَ الْبِحَـارَ الْاَوَائِــلَ

অর্থাৎ, 'হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য যেই আল্লাহ্ তা'আলা নীল নদে পথ করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকেই আহ্বান করিলাম। অনন্তর তিনি তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনকভাবে পথ করিয়া দিলেন।'

হযরত খালেদ (রাঃ)-এর ইরাক প্রবেশ ঃ

আরবের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিবারণের সঙ্গেসঙ্গেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) এবং আয়ায ইবনে গনম (রাঃ)-কে ইরাক গমনের আদেশ দিলেন। এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইল যে, দুই সেনাপতি রাজ্যের দুই দিক হইতে প্রবেশকরত হিরা শহরে উভয়ে মিলিত হইবেন। উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম হিরায় পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন, তিনিই প্রধান সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হইবেন। খলীফা আবু বকর (রাঃ) সেনাপতিদ্বয়কে যাত্রাকালে একথাও বলিয়া দিলেন যে, 'তোমাদের সৈন্যদল হইতে যাহারা ফিরিয়া আসিতে চাহে, তাহাদিগকে যেন অনুমতি দেওয়া হয়। এরূপ অনুমতির ফলে লশকরের এক বিশেষ অংশ পথ হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসিল। সেনাপতিদ্বয় খলীফার খেদমতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, আমাদের সাহায্যের জন্য আরও সৈন্য পাঠান হউক। খলীফা খালেদের সাহায্যার্থে কা'কা ইবনে আমর নামক শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষকে একা পাঠাইলেন। কেহ কেহ আপত্তি করিল, 'হুযূর! খালেদের সৈন্য সংখ্যা নিতান্তই সামান্য; এরূপাবস্থায় এক ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট পাঠাইলে বিশেষ কি উপকার হইবে?' খলীফা বলিলেন, 'যে সৈন্যদলে কা'কার মত বীরপুরুষ থাকিবে, সেদল কখনও পরাজিত হইতে পারে না।' আয়াযের সাহায্যার্থে আব্‌দ ইবনে গাওসকে পাঠান হইল।

সন্ধি-সূত্রে হিরা বিজয় ঃ

সেকালে হিরা শহর পারস্য সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারস্বরূপ ছিল। রাজ্যের প্রান্তদেশে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ শহর হিসাবে ইহার জয়-পরাজয়ের উপর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের ভাগ্য নির্ভর করিত। এখানে পারস্য রাজ্যের এক গভর্নর এবং সামন্ত দল অবস্থান করিত। হযরত খালেদ সদলবলে হিরার

www.nagorikpathagar.org

সন্নিকটে পৌঁছিলে হিরার শাসনকর্তা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)-এর সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ইয়াস ইবনে কারিসা এবং আমর ইবনে আবদুল মসীহ্ হিরাপতি কর্তৃক প্রেরিত হইল। আমর খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বয়স কয়েক শত বৎসর হইয়াছিল।

আমর ইবনে আবদুল মসীহ্র বার্ধক্যাবস্থা দেখিয়া হযরত খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার বয়স কত?'

আমর তাঁহার বয়সের কথা প্রকাশ করিলে খালেদ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন যে, এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি কিরূপে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সমাধা করিতে পারিবে। অনন্তর তিনি আমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন তো, আপনার জীবনে আপনি কোন্ জিনিস বেশী আশ্চর্যজনক দেখিয়াছেন?'

আমর বলিল, 'হিরা হইতে দামেশক পর্যন্ত এখন শত সহস্র যোজন পথ জনমানব বিহীন অরণ্য ও মরুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, এককালে এই সমস্ত স্থান জনবহুল আবাদ ছিল। একটি স্ত্রীলোক সঙ্গে সামান্য খাদ্যদ্রব্য মাত্র লইয়া নির্বিঘ্নে হিরা হইতে দামেশকে যাইতে পারিত।'

আমরের এই রকম অসম্ভব উক্তি শুনিয়া হযরত খালেদ বলিতে লাগিলেন যে, 'আমাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য এমন এক অতি বৃদ্ধকে পাঠান হইয়াছে, যাহার জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।'

আমর একথা শুনিয়া বলিল, 'আমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ রহিয়াছে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিয়াছি। যাহা হউক, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করিলেই আমার সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।' অনন্তর খালেদ (রাঃ) আরও বাক্যালাপের পর নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধের মস্তিষ্ক বাস্তবিক ঠিক রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমরের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির প্রখরতায় দেশবাসী পূর্ণ আস্থা রাখে বলিয়াই তাহাকে পাঠান হইয়াছে।

আমর ইবনে আবদুল মসীহ্র সঙ্গে যে নওকর আসিয়াছিল তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র পুটুলী ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই পুটুলীর ভিতর কি আছে?' আমর তদুত্তরে কহিল, 'ইহার ভিতর সদ্য প্রাণনাশক বিষ আছে। আপনাদের কথাবার্তা শুনিয়া এবং আচরণ দেখিয়া যদি আমার এরূপ ধারণা জন্মিত যে, আপনাদের এই দেশে আগমন দেশবাসীর ধ্বংসের কারণ হইবে, তবে তৎক্ষণাৎ আমি বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিতাম। চক্ষের সম্মুখে স্বদেশবাসীর অকল্যাণ দেখিতে কখনও রাজি হইতাম না। এই উদ্দেশ্যেই আমি সঙ্গে করিয়া বিষ আনিয়াছিলাম।'

হযরত খালেদ (রাঃ) বিষ হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন, 'নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন কিছুতে অপকারও হইতে পারে না।' একথা বলিয়া নিম্নলিখিত দো'আ পাঠকরত তিনি বিষ খাইয়া ফেলিলেন। দো'আ এই—

بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ دَاءٌ ○

ইবনে আবদুল মসীহ এই ঘটনা দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়া কহিল—

www.nagorikpathagar.org

وَاللّٰهِ لَتَبْلُغَنَّ مَاأَرَدْتُّمْ مَادَامَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ هٰكَذَا ○

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্র শপথ, যে পর্যন্ত আপনার মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন একটি লোকও থাকিবে, আপনাদের সকল উদ্দেশ্য সফল হইতে থাকিবে। আপনারা অব্যাহত গতিতে সফলতার পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন।'

অনন্তর হযরত খালেদ (রাঃ) ও হিরা প্রতিনিধির মধ্যে এরূপে সন্ধির সিদ্ধান্ত হইল যে, হিরাবাসিগণ বাৎসরিক নির্দিষ্ট ট্যাক্স দিবে এবং মুসলমানগণ সর্বতোভাবে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। হিরার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটের মালিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। এইভাবে বিনা যুদ্ধে ইরাক-সীমান্তের এক বিশেষ ভূখণ্ড মুসলমানদের করতলে আসিল।

আমর ইবনে আবদুল মসীহ প্রবীণ ব্যক্তি এবং খৃষ্টধর্মে জ্ঞানসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিল। শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহার বুদ্ধির প্রখরতা এবং দূরদর্শিতা অত্যন্ত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। হযরত খালেদ (রাঃ)-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এবং মুসলমানদের আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখায় তাহার একথার প্রতি আস্থা জন্মিয়াছিল যে, এই সম্প্রদায়ের মতবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহাদের উন্নতি ও জয়লাভ অনিবার্য। হযরত খালেদ (রাঃ)-এর বিষ গলধঃকরণ এবং তাহাতে সামান্য অনিষ্ট মাত্র না হওয়া, খোদার প্রতি তাঁহার অনির্বচনীয় নির্ভরশীলতা ইত্যাদি দৃষ্টে আমরের বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এদিক হইতে তাহাকে ধর্মান্তরিত করার জন্য কোন প্রকার আগ্রহই দেখান হয় নাই। কারণ, সাহাবাদের কাজ ছিল কেবল সত্যকে মানব সমাজের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরা; বলপ্রয়োগ অথবা ফাঁদে আটকাইয়া মুসলমান করা নহে।

হিরাবাসীরাও নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্মে বহাল রহিল। ধর্ম পালনের জন্য তাহাদের কোন অসুবিধাই হইল না। এমন কি তাহারা বারংবার সন্ধি ভঙ্গকরত শঠতার পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু এদিক হইতে প্রত্যেক বারই তাহাদিগকে ক্ষমার সহিত অমায়িকতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

আজনাদীনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঃ

আজনাদীন শামদেশের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে মুসলমানদের সঙ্গে রোমক সৈন্যের এক ভয়ানক সংঘর্ষ হইয়াছিল। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিল। যুদ্ধকালে একদিন রোম সেনাপতি আরবী ভাষাভাষী এক গুপ্তচরকে মুসলমানদের নিকট তাহাদের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য পাঠাইয়া দিল। গুপ্তচর একদিন একরাত্র মুসলমানদের ভিতরে থাকিয়া সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিল। সে দেখিল, যে সমস্ত মুসলিম সৈন্য দিনের বেলায় তরবারি হস্তে শত্রু-সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারাই রাত্রিকালে পরম ভক্তির সহিত খোদার বন্দেগীতে লিপ্ত রহিয়াছে। কেহ কোরআন তেলাওয়াত করিতেছে, কেহ তাহাজ্জুদের নামায পড়িতেছে, কেহ নির্জনে বসিয়া ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের আচরণে ছোট বড়ের কোনই প্রভেদ নাই।

কাজে কর্মে একে অন্যের অযাচিত সাহায্য করিতেছে। দলপতির আদেশ পালনে সকলেই সর্বদা তৎপর রহিয়াছে। তাহাদের সকলে মিলিয়া যেন এক দেহ, এক প্রাণ। গুপ্তচর প্রত্যাবর্তনের পর রোম সেনানায়কের নিকট বলিল—

www.nagorikpathagar.org

هُمْ بِالَّيْلِ رُهْبَانٌ وَّبِالنَّهَارِ فُرْسَانٌ لَّوْسَرَقَ ابْنُ مَلِكِهِمْ قَطَعُوْهُ وَلَوْزَنٰى رَجَمُوْهُ لِاِقَامَةِ الْحَقِّ فِيْهِمْ ○

'তাহারা রাত্রে সংসারত্যাগী ফকীর এবং দিনে পরাক্রমশালী বীর। তাহাদের রাজপুত্র যদি চুরি করে, তাহারও হাত কাটা হয়, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে বধ) করা হয়। হক বিচার কার্যে পরিণত করিতে কোন স্থলেই ত্রুটি করা হয় না।'

সেনাপতি একথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল এবং বলিল, 'এই রকম দলের সঙ্গে মোকাবিলা করা আর নিজেদের ধ্বংস টানিয়া আনা একই কথা।'

বলাবাহুল্য, রোমের অভিজ্ঞ সেনাপতি সাহাবাদের অবস্থা শুনিয়া ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই সম্প্রদায় নিশ্চয়ই সত্যের আলোক নিয়া বহির্গত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের গতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বাস্তবিকপক্ষে সাহাবাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর কোন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিতে পারিত না; অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করা না করা ভিন্ন কথা। সাহাবাদের ধর্মপরায়ণতার ভিতরে ইসলাম প্রচারের যে ক্ষমতা নিহিত ছিল, তরবারির ভিতরে তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

ইয়ারমুক যুদ্ধে জর্জার ইসলাম গ্রহণ ঃ

রোম রাজ্যে ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধের সময় সেনাপতি জর্জা সৈন্যদল হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা আমাদের দাবীর কতখানি পোষকতা হয়, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণেরই বিচার সাপেক্ষ।

ইয়ারমুক মাঠে উভয়পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল আদেশের অপেক্ষা; এমন সময় রোম বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি অশ্ব ছুটাইয়া সৈন্যশ্রেণী হইতে বাহিরে আসিলেন এবং মুসলিম সেনাপতি খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে আহবান করিলেন। তৎকালীন যুদ্ধপ্রথা অনুযায়ী এ রকম আহবান মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরা হইত। সুতরাং হযরত খালেদ (রাঃ) দ্রুত সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে জর্জার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জর্জা হযরত খালেদের অতি নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া আসি নাই; কয়েকটি প্রশ্ন করিতে আসিয়াছি। আশা করি, আপনি প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে দ্বিধা করিবেন না।' খালেদ বলিলেন, 'আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন, যথাযথ উত্তর দিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।'

জর্জা—আল্লাহ্ কি আপনাদের পয়গম্বরের উপর কোন তরবারি অবতীর্ণ করিয়াছেন? আর সেই তরবারি কি আপনাকে অর্পণ করা হইয়াছে? আমার ধারণা এ রকম তরবারি দ্বারাই আপনি সর্বত্র জয়ী হইতেছেন।

[হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কর্তৃক খালেদকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহ্র তলোয়ার উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।]

খালেদ—আল্লাহ্ কোন তরবারি নাযিল করেন নাই।

জর্জা—তবে আপনাকে "সাইফুল্লাহ্" কেন বলা হয়?

খালেদ—আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার শেষ রাসূলকে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রথমতঃ আমরা সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলাম, পরে কেহ কেহ তাঁহাকে মান্য করিল, আবার

www.nagorikpathagar.org

কেহ কেহ বৈরীভাবেই বহাল রহিল। আমি বিরুদ্ধদলেই ছিলাম; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের অন্তরে সত্যের আলো স্থাপিত করায় আমরা ঈমান আনিলাম। আল্লাহ্‌র রাসূল আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই উপাধি দান করিয়াছেন এবং অজেয় হওয়ার জন্য দো'আ করিয়াছেন। সেদিন হইতেই আমি সাইফুল্লাহ্ নামে পরিচিত হইয়াছি।

জর্জা—আপনার মুখে সত্য কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এখন বলুন, আপনারা আমাদিগকে কি কথার দিকে আহবান করিতেছেন?

খালেদ—আমরা একথার প্রতি আহবান করিতেছি যে, আপনারা কলেমা শাহাদত পড়ুন। আল্লাহ্‌র একত্ব ও শেষ নবীর প্রেরিতত্বে স্বীকারোক্তি করুন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কর্তৃক আনীত বিধি-ব্যবস্থার অনুবর্তী হউন।

জর্জা—কেহ যদি ইহা মানিতে বাধ্য না হয়?

খালেদ—তবে সে জিযিয়া ট্যাক্স প্রদানে আমাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নির্বিঘ্নে স্বধর্মে বহাল থাকিতে পারে। এরূপ করিলে আমরা আমাদের ধন-প্রাণের মত তাহার ধন-প্রাণেরও রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

জর্জা—ইহাও যদি মান্য না করে?

খালেদ—তবে আমরা প্রথমে তাহাকে যুদ্ধের ঘোষণা জানাইব এবং পরে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব।

জর্জা—যদি কেহ আপনাদের আহবানে সাড়া দিয়া আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করে, তবে তাহার প্রতি কি রকম ব্যবহার করা হয়?

খালেদ—এ রকম ব্যক্তি আমাদের ভাই এবং সমান। সাম্যবাদই ইসলামের লক্ষ; এখানে ছোট বড়, আশরাফ আতরাফে কোনই ভেদাভেদ নাই।

জর্জা—একথা আমার নিকট খুবই অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয় যে, নব দীক্ষিত ব্যক্তিও আপনাদের সম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে। আপনারা বহু পূর্বে ইসলাম গ্রহণকরত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। অতএব, নব দীক্ষিতেরা আপনাদের সমান কিরূপে হইতে পারে?

খালেদ—এই কথা সত্য যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ ব্যাপারে অগ্রগামী হইয়াছি; কিন্তু আমরা হযরত রাসূল করীম (দঃ)-কে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহার সংস্রব লাভ করিয়াছি, অলৌকিক ঘটনাবলী অবলোকন করিয়াছি, এরূপাবস্থায় আমাদের ইসলাম গ্রহণ বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে। কারণ, এই সমস্ত ঘটনা দেখা দ্বারা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করা খুবই সহজ। আর এখন যাহারা কেবল যুক্তি প্রমাণের ভিতর দিয়া নিজের জ্ঞানবুদ্ধি পরিচালনাকরত ইসলামগন্ডীতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হয়, এক হিসাবে তাহাদের ফযীলতই বেশী।

জর্জা—আপনার সকল কথাই সত্য এবং যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

হযরত খালেদ (রাঃ)-এর পরিষ্কার অনতিরঞ্জিত কথাবার্তায় জর্জার সমস্ত সংশয় বিদূরিত হইল। তিনি হযরত খালেদ (রাঃ)-এর নিকট ইসলামে দীক্ষিত করার অনুরোধ করিলেন। খালেদ (রাঃ) তাহাকে লইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, বিধিমত মুসলমান করিলেন। যে অন্তর ক্ষণকাল পূর্বে বৈরীভাবে পরিপূর্ণ ছিল, পবিত্র কলেমার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাতেই আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিল। জর্জা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। কিছু সময় পূর্বে তিনি যাহাদের দলপতি ছিলেন, এক্ষণে তাহাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকরত শহীদ হইলেন।

www.nagorikpathagar.org

দজলা নদী পার হওয়ার অলৌকিক ঘটনা
এবং মাদায়েন বিজয়ঃ

আমরা পুস্তকের প্রথমেই একথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছি যে, ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের দাবীর পোষকতায় কতিপয় ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আনয়ন করাই উদ্দেশ্য। উপরোক্ত ঘটনাসমূহে ইসলাম প্রচারে গায়েবী মদদ এবং কোন অদৃশ্য হস্তের সাহায্য খুব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে। এক্ষণে মুসলমানগণ কর্তৃক দজলা নদী উত্তীর্ণ হওয়ার অপূর্ব ঘটনা লিখিত হইতেছে। মুসলিম সেনাপতি হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস ইরাক বিজয়ের পর কাদসিয়ার ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সমাপ্তকরত পারস্য রাজধানী মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মাদায়েন প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি জনপদের সমষ্টির নাম। পারস্যের সম্রাটগণ নিজেদের নামে ক্রমাগত এই জনপদগুলির পত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেসরার রাজধানী যেখানে স্থাপিত, পরবর্তীকালে তাহাই মাদায়েন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। মাদায়েনের 'কসরে আবইয়ায' বা শ্বেত প্রাসাদ ভুবন-প্রসিদ্ধ অট্টালিকা ছিল। হযরত রাসূলে মকবূল (দঃ) এই শ্বেত প্রাসাদ মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। রাজধানী হিসাবে মাদায়েনের উপরেই সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ভর করিত। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরগুলির পৃথক পৃথক নাম ছিল। তন্মধ্যে একটির নাম বহরাসের। দজলা নদের পূর্বতীরে মাদায়েন অবস্থিত ছিল। উহাকে মাদায়েনে কোসওয়াও বলা হইত। বহরাসের ছিল দজলার পশ্চিম দিকে, উহার অন্য নাম মাদায়েনে দুনিয়া। দুনিয়া অর্থ নিকটবর্তী এবং কোসওয়া অর্থ দূরবর্তী। মুসলমানগণ পশ্চিম দিক হইতে পারস্যদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বহরাসের তাহাদের নিকটে এবং মাদায়েন দূরে অবস্থিত হওয়ায় প্রথমটির নাম দুনিয়া এবং দ্বিতীয়টির নাম কোসওয়া রাখা হয়।

হযরত সা'দ দজলার তটবর্তী স্থানসমূহ আয়ত্ত করিতে করিতে বহরাসের অবরোধ করিলেন। দুই মাস অবরোধের পর বহরাসের অধিবাসিগণ সন্ধির প্রস্তাবসহ দূত প্রেরণ করিল। তাহারা প্রস্তাব করিল, রাজ্যের যেই পরিমাণ অংশ মুসলমানদের করতলে আসিয়াছে, তাহা তাহাদের হাতেই থাকুক, আর বাকী অংশ পারস্যবাসীদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হউক। কাসেদ সেনাপতি সা'দের নিকট সন্ধির প্রস্তাব শুনাইল; হযরত সা'দ কিছু না বলিতেই জনৈক মুসলমান অগ্রগামী হইয়া কাসেদকে কিছু বলিয়াছিল। হযরত সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি উহাকে কি বলিলে?' লোকটি কহিল, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে কি কথা যে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিব না; ইহার অর্থ আমি নিজেই বুঝি নাই।

এদিকে 'বহরাসের'-এর শাসনকর্তা দূত মুখে উত্তর শুনিয়া বহরাসের পরিত্যাগকরত সমস্ত লোকজন ও আসবাবপত্র লইয়া চলিয়া গেল। খবর বলার জন্য কেবল একজন লোক রহিয়া গেল। লোকটি খবর লইয়া পৌঁছিলে হযরত সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের শহর ছাড়িয়া যাওয়ার কি কারণ? তোমাদের নিকট কি খবর পৌঁছাইয়াছিল?

লোকটি বলিল, আমাদের কাসেদ সংবাদ পৌঁছায় যে, আপনারা নাকি সন্ধি প্রস্তাবের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'আমরা কিছুতেই সন্ধি করিব না। যে পর্যন্ত আমরা ফেরিদুনের মধু কুছির লেবু দ্বারা না খাই, সে পর্যন্ত আমাদের গতিরোধ হইবে না।' এই উত্তর শুনিয়া শাসনকর্তা বলিলেন যে, 'দেখিতেছি মুসলমানদের পক্ষ হইতে ফেরেশতা উত্তর দিতেছে। সুতরাং তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

করা নিষ্ফল।' ইসলামী সৈন্যগণ নিজেদের দলপতির যেরূপ অনুগত ছিল, তাহার নমুনা অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। এরূপাবস্থায় কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না যে, একজন সাধারণ সিপাহী এমন স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতে সাহস পাইত। সে যে কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা চালিত হইয়াই দূতকে এই রকম উত্তর দিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। তৎসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, একজন সাধারণ সিপাহীর কথা শুনিয়াই রাজদূত ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়াই আবার শাসনকর্তা শহর ত্যাগের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করিতেছেন। শাসনকর্তা আরও বলিতেছেন যে, আরবদের পক্ষ হইতে ফেরেশতা উত্তর দিয়া থাকে। এদিকে আবার যেই সিপাহী উত্তর দিয়াছিল, সে নিজেও বলিতে পারিতেছে না, সে কি উত্তর দিয়াছে; ইত্যাদি ঘটনাকে দৈব সাহায্য ব্যতীত আর কি বলিব?

বহ্‌রাসের অধিপতি দজলার পূর্ব পারে মাদায়েনে পৌঁছিয়া নদীর সমস্ত নৌকা বিনষ্ট করিয়াছিল, যাহাতে মুসলমানগণ নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম না হয়।

প্রবল বৃষ্টির কারণে সেই বৎসর দজলার পানি অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং খরস্রোত কয়েক মাইল প্রশস্ত আকারে প্রবাহিত হইতেছিল। আরবের লোকেরা একে তো কোন সময় নদীনালা দেখে নাই, এখন সম্মুখস্থ নদীর ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি চিন্তান্বিত হইল।

একদিন হযরত সা'দ স্বপ্নযোগে দেখিলেন, মুসলমানগণ দজলায় অবতরণ করিয়া সাফল্যের সহিত পার হইতেছে। স্বপ্ন দৃষ্টে তিনি এদিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভাইগণ! আমাদের শত্রুপক্ষ নদীর অপর পারে আশ্রয় লইয়াছে। আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তাহারা যখনই ইচ্ছা করিবে আমাদের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে। আমার বিশ্বাস এখনও তোমরা দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ হও নাই। এই সময়েই সাধ্যমত ইসলামের সেবা করিয়া লও। ঐহিক ভোগবিলাসে লিপ্ত হইয়া পড়িলে আর কিছুই করিতে পারিবে না। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া সকলে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাহায্য করিবেন এবং অপর তীরে পৌঁছাইয়া দিবেন। এক্ষণে বল, এ সম্বন্ধে তোমাদের কি মত?'

সেনাপতির বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আমরা সকলেই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত।'

হযরত সা'দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন, 'শত্রু বাহিনী নদীর পূর্ব পার ঘেরাও করিয়া রহিয়াছে। আমরা তটের নিকটে পৌঁছিতেই তাহারা আক্রমণ করিবে—সন্দেহ নাই। অতএব, আমি সঙ্গত মনে করি, প্রথমেই আমাদের কিছু লোক যাইয়া নদীর তীর দখল করুক। পরে এক সঙ্গে সকল সৈন্যের যাওয়া হইবে।'

সা'দের সৈন্যগণ সকলেই অশ্বারোহী ছিল; একজনও পদাতিক ছিল না। নির্দেশ মত আসেম ইবনে-আমর ছয় শত সৈন্যসহ অশ্বারোহণে নদী পার হইয়া তীরে পৌঁছিলেন এবং সামান্য সংঘর্ষের পর নদীর তীর দখল করিলেন। এখন সেনাপতি সা'দ সকল সৈন্যকে এক সঙ্গে নদীতে অবতরণ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল; এক সঙ্গে ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য খরস্রোতা দজলা নদী বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কবির কল্পনা নহে, উপন্যাসের মনগড়া ঘটনা নহে, ইতিহাসের সত্য ঘটনা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত, কল্পনা পরাস্ত! ষাট হাজারের বিরাট বাহিনী নদীবক্ষে ভাসিয়া চলিয়াছে—কোথাও আতঙ্ক

www.nagorikpathagar.org

নাই, কাহারও মুখে ভীতি বিহ্বলতার চিহ্নমাত্র নাই। ব্যবস্থা মত দুই দুই জন সৈন্য একসঙ্গে মিলিত হইয়া চলিয়াছে। সেনাপতির শিক্ষা মত সকলের মুখেই উচ্চারিত হইতেছে—

نَسْتَعِيْنُ بِاللهِ وَنَتَـوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَاللهِ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ وَلِيَّهٗ وَلَيُظْهِرَنَّ
دِيْنَهٗ وَلَيَهْزُمَنَّ عَدُوَّهٗ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

'আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁহারই প্রতি নির্ভর করি, তিনিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র শপথ ! নিশ্চয়ই, খোদা তা'আলা তাঁহার বন্ধুকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার ধর্মকে প্রবল করিবেন এবং তাঁহার শত্রুকে পরাজিত করিবেন। মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কাহারও কোন ক্ষমতা নাই।'

ষাট হাজার সৈন্য এমন নিরাপদ ও শান্তির সহিত ভাসিয়া যাইতেছিল, যেন মাঠে ভ্রমণ করিতেছে। এই বিরাট দলের মধ্যে একটি প্রাণী বিনষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, কাহারও কোন সামান্য জিনিস পর্যন্ত নদীতে ডুবে নাই। অবশ্য মধ্য পথে এক ব্যক্তি ঘোড়া হইতে পড়িয়া নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গী তাহাকে তুলিয়া লন। আর এক ব্যক্তির একটি পেয়ালা নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল। যেহেতু আর কাহারও কোন দ্রব্য নষ্ট হয় নাই, এজন্য তাহার সঙ্গী আমোদচ্ছলে বলিতে লাগিল— أَصَابَهُ الْقَدْرُ فَطَاحَ

অর্থাৎ, অদৃষ্ট তাহার পেয়ালাটি উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে। লোকটি শান্ত ও সুধীর কণ্ঠে বলিল—

'আমি যখন কোনই অন্যায় করি নাই; বরং বিশুদ্ধচিত্তে সত্য ধর্মের সাহায্যার্থে যাইতেছি, তখন কেবল আমার পেয়ালাটিকে কিছুতেই আল্লাহ্ তা'আলা কাড়িয়া লইবেন না।'

লোকটির অটল ভক্তি-বিশ্বাস ও অচঞ্চল নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহার পেয়ালা নদীতে পড়িয়া গিয়াছে, স্রোতযুক্ত তরঙ্গ তাহাকে হয়তো বহুদূরে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে বা মুখে অস্থিরতার লেশমাত্রও প্রকাশ পায় নাই। সে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছে যে, কখনও তাহার পেয়ালা নষ্ট হইতে পারে না।

খোদার কি অপার মহিমা ! ভক্তি ও বিশ্বাসের কি অপূর্ব ক্ষমতা ! সৈন্যগণ তীরে উঠিতে না উঠিতেই একটি বড় রকমের ঢেউ পেয়ালাটিকে উপরে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গেসঙ্গেই এক ব্যক্তি তাহা তুলিয়া মালিককে দিয়া দিল।

ঘোড়া পানিতে সাতার কাটিয়া যাওয়া যদিও কোন অভিনব কথা নহে, কিন্তু বর্ষার ভরা খরস্রোতা দজলা নদীতে এক সঙ্গে ষাট হাজার অশ্ব ও আরোহী অতিক্রম করা, তাহাদের একটি প্রাণীও বিনষ্ট না হওয়া, এমন কি সামান্য একটি জিনিসও নিমজ্জিত না হওয়া, বাস্তবিক অলৌকিক ব্যাপার এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে দৈব সাহায্য প্রাপ্তির পরিচায়ক।

সাধারণ অবস্থাতেও দজলা নদীতে জাহাজ চলাচল করে, বিশেষতঃ বর্ষাতে তাহা বহু মাইল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। প্রমাণে দেখা যায়, মুসলমানদের আক্রমণের সময় বর্ষাকাল ছিল। বর্ষা ছিল বলিয়াই পারসিকগণ নদীর অপর পারে আশ্রয় লইয়া নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল। যাহারা বর্ষাকালে ভারতবর্ষের গঙ্গা, যমুনা এবং সিন্ধুনদ দেখিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, এই সময় ঘোড়া অথবা হাতী দ্বারা এই সমস্ত নদী পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার।

www.nagorikpathagar.org

তারিখে কামেল প্রভৃতিতে লিখিত আছে, নদী পার হওয়া কালে যখনই কোন ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখনই নদী গর্ভে টিলার মত উঁচু স্থান প্রকাশ পাইত, তাহাতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঘোড়া আবার সন্তরণে রত হইত।

পানির নীচে টিলা থাকা অবশ্য অস্বাভাবিক কথা নহে, কিন্তু আবশ্যক মাত্রই টিলা প্রকাশ পাওয়া এবং ষাট হাজার ঘোড়া সম্পূর্ণ নিরাপদে ও শান্তিতে পার হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারকে সমষ্টিগতভাবে অবলোকন করিলে যে কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাকে ইসলামের কারামত বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। আর যাহাদের বিচার-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এবং যাহারা সত্য ঘটনাকে কাটিয়া ছাটিয়া মানানসই করিতে অভ্যস্ত তাহাদের কথা ভিন্ন।

লোভহীনতার অপূর্ব আদর্শ ঃ

পারস্য রাজধানী মাদায়েনের পতন ঘটিয়াছে। মুসলমানগণ বিজয়ীবেশে রাজধানী অধিকার করিয়াছেন। যুদ্ধের ইতিবৃত্ত ঐতিহাসিকদের বর্ণনীয়। আমরা কেবল মালে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের প্রতি মুসলিম যোদ্ধাদের অনাসক্তির যে অভাবনীয় আদর্শ ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বর্ণনা করিব। ইহাতে একথা প্রকাশ পাইবে যে, মুসলমানদের জেহাদ ধন লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তৎসঙ্গে বর্তমান কালের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ নিজেদের অবস্থা সেকালের মুসলমানদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পাইবেন।

পারস্য-যুদ্ধে মুসলমানগণ যত অধিক মালে গনীমত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপূর্বে আর কোন যুদ্ধেই তত প্রাপ্ত হন নাই। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অগণিত আসবাবপত্র এবং সম্রাটের খাস দরবারের মণি-মুক্তা খচিত ফরশ তন্মধ্যে অন্যতম। এই ফরশ বহু মূল্যবান ছিল এবং কেবল প্রমোদ মজলিসের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। ইহাতে পারস্য শিল্পের অতুলনীয় কলা-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। গনীমতের মাল সম্পর্কে ব্যবস্থা এই ছিল যে, উহার এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। সমস্ত যোদ্ধার অনুমতি গ্রহণকরত সেনাপতি সা'দ (রাঃ) প্রাচীন কীর্তি হিসাবে উক্ত ফরশটি এবং আরও বহুবিধ মূল্যবান জিনিস মদীনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরে খলীফার আদেশে ফরশটিও খণ্ড খণ্ড করত বণ্টন করা হইয়াছিল। দৈর্ঘ্য প্রস্থে অর্ধ হস্ত পরিমাণ খণ্ড হযরত আলী (রাঃ)-এর অংশে আসিয়াছিল, ইহার মূল্য হইয়াছিল বিশ হাজার দেরহাম।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর হযরত সা'দ (রাঃ) আমর ইবনে মোকরেন নামক এক ব্যক্তির হাতে সমস্ত যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের রক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। সৈন্যগণ যেখানে যেই দ্রব্য প্রাপ্ত হইত তাহাই আনিয়া আমরের নিকট জমা দিত। পারসিকগণ পলায়নকালে অনেক দ্রব্য পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ফেলিয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা কোন দ্রব্য আত্মসাৎ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানের তেজ এতই প্রখর ছিল যে, তাহার তৃণমত অপহরণ অথবা আত্মসাৎ করার কল্পনাও করেন নাই।

নাহরওয়ানের পুলের উপর দিয়া কয়েকজন পারসিক একটি বাক্স বোঝাই খচ্চর তাড়াতাড়ি হাকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। কতিপয় মুসলমান সৈন্য দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, অবশ্যই ইহাতে কোন বিশেষ মূল্যবান জিনিস আছে। তাহা আয়ত্তকরত মাল রক্ষক আমরের হাতে অর্পণ করা হইল। খুলিয়া দেখা গেল, বাক্সের ভিতর সম্রাট কেসরার জরি-জওয়াহেরাত নির্মিত রাজ-মুকুট রহিয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যক্তি মণি-মুক্তা পূর্ণ একটি বাক্স আনিয়া আমরের হাতে দিল। আমর ও তাঁহার সহকর্মীরা অনুমান করিলেন, সমুদয় লব্ধ দ্রব্যের চেয়ে এই বাক্সটির মূল্য অধিক হইবে। আমর লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই ডিব্বা হইতে কিছু রাখ নাই তো?' লোকটি শপথ সহকারে বলিল, 'আমি কিছুই রাখি নাই। যদি এ রকম ইচ্ছাই হইত এবং আল্লাহ্‌র ভয় না হইত, তবে এই ডিব্বা আপনার নিকট দেওয়ারই কি আবশ্যক ছিল? আমি ইহা রাখিয়া গোপন করিলে কাহারও জানিবার উপায় ছিল না।'

আমর লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, 'আমি নিজের নামও প্রকাশ করিব না। হয়তো আপনারা আমার প্রশংসা করিয়া বেড়াইবেন। আমি প্রশংসার জন্য এই কাজ করি নাই।' এই কথা বলিয়াই লোকটি সেখান হইতে প্রস্থান করিল। সেনাপতি হযরত সা'দ এই ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই, এই সৈন্যদল বিশ্বাসী ও আমানতদার। তাহারা বিশ্বাসী বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিতেছেন। এই রকম বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় স্পষ্টরূপেই বুঝা যায় যে, ছল, জুয়াচুরি, লোভ-লালসা এবং দুনিয়ার মহব্বত এই সমস্ত যোদ্ধাদিগকে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বলেন—

وَالَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَااطَّلَعْنَا عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِ الْقَادِسِيَّةِ اَنَّهٗ يُرِيْدُ الدُّنْيَا ○

'আল্লাহ্‌র শপথ, কাদসিয়া বিজয়ী যোদ্ধাদের মধ্যে এমন একজনও দেখি নাই, যে ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে জেহাদ করিয়াছিল।'

ইসলামের বিধান মতে যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য পৃথক রাখিয়া বাকী মাল ষাট হাজার যোদ্ধার মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বণ্টনের অনুপযুক্ত এবং অতি মূল্যবান দ্রব্যাদি অবিভক্তই ছিল। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক যোদ্ধার অংশে বার হাজার দেরহাম পড়িয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায়, কত অধিক মাল পারস্যের যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভাবিবার বিষয়, পারসিকগণ ঘাটে-মাঠে, বনে-জঙ্গলে যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছিল, মূল্যবান দ্রব্যাদি ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। মুসলমানগণও যথাতথায় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপাবস্থায় মুসলিম সৈন্যের পক্ষে মূল্যবান দ্রব্যাদি আত্মসাৎ ও গোপন করা অত্যন্ত সহজ ছিল, কিন্তু সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও ষাট হাজার সৈন্যের কেহই একটি কানা কড়ি পর্যন্ত অপচয় বা অপহরণ করে নাই। ইহা অসম্ভব দেখাইলেও ঐতিহাসিক সত্য। সৈন্যদের বিশ্বস্ততার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বয়ং সেনাপতি সা'দ তাহাদের আমানতদারীর সাক্ষ্য দিতেছেন। অপিচ হযরত জাবের শপথ করিয়া বলিতেছেন, সৈন্যদের একজনও দুনিয়ার লালসায় লিপ্ত ছিল না। এমতাবস্থায় আমাদের সন্দেহের আর কি কারণ থাকিতে পারে?

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, ইসলামের প্রচার কোন্ আদর্শের উপর হইয়াছিল এবং কি রকম লোকদের দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা বলিয়াছি, প্রচারকদের ধার্মিকতা এবং আচার ব্যবহার এ রকম ছিল, যাহা দেখিয়া বিধর্মীদের মনে ইসলামের সত্যতার প্রতি আস্থা স্থাপিত হইত। অনেক সময় তাহাদের চেহারা দেখিয়াও সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। দুনিয়ার ইতিহাস, প্রচারকদের এমন নমুনা অন্যত্র দেখাইতে যে সক্ষম হইবে না একথা আমরা উচ্চকণ্ঠে দাবী করিয়া বলিতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, উপরোক্ত ষাট হাজার যোদ্ধার সকলেই সাহাবী ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে সাহাবীর সংখ্যা আনুমানিক ৩/৪ হাজারের বেশী হইবে না। বাকী সমস্ত লোক তাবেয়ী ছিলেন; অর্থাৎ, তাঁহারা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে দেখেন নাই। কেবল সাহাবা কেরামের সংস্রব গুণে তাঁহাদের ধর্মনিষ্ঠতা অনুপমের ভাব ধারণ করিয়াছিল। সাহাবাগণ যে উপযুক্ত প্রচারক ও শিক্ষকের আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে একথাও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল।

যতকাল মুসলমানগণ ধর্মনিষ্ঠতার উপর এ রকম দৃঢ়পদ ছিলেন, ততকাল তাঁহাদের অবনতির কোন লক্ষণই দেখা দেয় নাই। আবার যখনই তাঁহাদের ধর্মপরায়ণতা শিথিল হইয়া আসিল, তখন হইতেই তাহাদের উন্নতি ব্যাহত হইয়া পড়িল। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রচার কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের উপর নির্ভর করে নাই। আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, মুসলিমজাতি ধর্মের উপর বহাল থাকিলেই তাহাদের উন্নতি হইবে; নতুবা অন্য জাতিকে তাহাদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। ঐ শুনুন—

اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُـوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

'তোমরা যদি মুখ ফিরাও, তবে তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে রাখা হইবে; তাঁহারা আর তোমাদের মত (অবাধ্য) হইবে না'। যাহা প্রকৃত ইসলাম—তাহা কখনও দমিত হইবে না, হইতে পারে না। বিপথে চালিত হওয়াতে মুসলমানদের পতন হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন সম্প্রদায়কে ইসলামের সেবকরূপে গড়িয়া তোলেন। উদ্ধৃত আয়াতে একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মুসলমানগণ যখনই ইসলামী বিধান পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখনই তাহারা বিপদে পতিত হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহার একটি নমুনাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

সারদিনিয়া বিজয় ও মুসলমানদের বিপদ ঃ

রোম সাগরে ক্রীট দ্বীপের পরে সারদিনিয়া দ্বীপ অবস্থিত। স্বনাম ধন্য স্পেনবিজেতা সেনাপতি মূসা এক মুসলিম বাহিনীকে সারদিনিয়া দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। সামান্য যুদ্ধের পর দ্বীপ মুসলমানদের অধিকারে আসিল; খৃষ্টান বাসিন্দাগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। পলায়নকালে তাহারা বহু মূল্যবান তৈজস পত্রাদি পানিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আর কিছু আসবাব একটি গীর্জার ভিতরেও লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ফলকথা, মুসলমানগণ এই সময় অগণিত গণীমতের মাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যোদ্ধাদের নৈতিক অবস্থা দুর্বল থাকায় তাদের দ্বারা অনেক জিনিস অপহৃত হইয়াছিল।

জনৈক মুসলমান গোসলের জন্য নদীতে অবতরণ করিয়াছিল, কোন কঠিন পদার্থ তাহার পায়ে লাগিলে তুলিয়া দেখিল যে, একটি রৌপ্য পাত্র। খোঁজ পাইয়া বহুলোক নদীতলে হাতড়াইয়া অনেক জিনিস বাহির করিল এবং যে যাহা পাইল আত্মসাৎ করিতে লাগিল।

আর এক ব্যক্তি গীর্জার ভিতরে প্রবেশ করিল। ছাদের উপর একটি কবুতর ছিল। লোকটি কবুতরকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িল। কবুতর তো রক্ষা পাইল; কিন্তু কয়েকটি ছোট ছোট পাথরের টুকরা এবং তৎসঙ্গে কিছু স্বর্ণ-মুদ্রা মাটিতে পড়িল। উপস্থিত সকলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এখানে প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা রক্ষিত আছে। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত মুদ্রা বাহির করা হইল এবং যে যাহা পাইল লইয়া গেল; দলপতির নিকট এক কপর্দকও পৌঁছিল না।

www.nagorikpathagar.org

এইভাবে গনীমতের মাল বহু পরিমাণে অপহৃত হইল। সৈন্যগণ অপহরণের নানাবিধ উপায় বাহির করিয়াছিল। যথা, একটি বিড়াল মারিয়া উহার ভিতরে স্বর্ণ-মুদ্রা পূর্ণকরত উহার গলায় রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। সকলে ভাবিল, মরা বিড়াল ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চুরি করা হইতেছে। ইসলামের বিধান মতে গনীমতের মাল আত্মসাৎ বা অপহরণ করা জঘন্য পাপের মধ্যে গণ্য। মুজাহেদগণ নিজেদের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়া ইসলামের সেবা করিয়াছিল, একথা সত্য, কিন্তু তাহারা যে অমার্জনীয় পাপে নিজেদের জীবনকে কলুষিত করিয়াছিল, উহার ফলও অতিশীঘ্রই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছিল।

সারদিনিয়া বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী জাহাজারোহণে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। তাহারা যুদ্ধলব্ধ মালের অপব্যবহার করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা এখন মূর্তিমানরূপে দেখা দিল। বান নাই, বাত্যা নাই, নির্বিঘ্নে জাহাজ চলিয়াছে। এমন সময় আকাশ ভেদ করিয়া গভীর গর্জনে শব্দ হইল 'তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত কর।' অমনি দেখিতে দেখিতে আরোহীসহ সমুদয় জাহাজ সমুদ্র সলিলে চিরতরে সমাহিত হইয়া গেল।

এস্থলে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যকীয় মনে করি। যাহাতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে, ইহাতে একথাও বুঝা যাইবে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির মূল উৎস কোথায় তাহা বিধর্মীরাও ভালভাবে জানিত।

রোম সম্রাটের পত্র ঃ

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে রোমের খৃষ্টান সম্রাট বাগদাদের খলীফার নামে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রটি আরবী কবিতায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রে খৃষ্টরাজ আত্মশ্লাঘা প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে খৃষ্টানরা যে মুসলিম রাজ্যসমূহ অধিকার করিয়া লইবে, একথার হুমকি দিয়াছিলেন। পত্র এইভাবে আরম্ভ করা হইয়াছিল ঃ—

مِنَ الْمَلِكِ الطُّهْرِ الْمَسِيْحِيِّ رِسَالَةً   اِلٰى قَائِمٍ بِالْمُلْكِ مِنْ اٰلِ هَاشِمِ

'এই পত্র খৃষ্টীয় পাক বাদশাহের পক্ষ হইতে হাশেমী খলীফার নামে লিখিত হইল।' আত্ম প্রশংসা সমাপ্তির পর রোম সম্রাট লিখিতেছেন—

اَلَا شَمِّرُوْا يَآ اَهْلَ بَغْدَادَ وَيْلَكُمْ   فَمُلْكُكُمْ مُسْتَضْعَفٌ غَيْرُ دَآئِمِ

'হে বাগদাদবাসিগণ, তোমাদের সর্বনাশ হউক! তোমরা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হও; যেহেতু তোমাদের রাজত্ব দুর্বল এবং ক্ষণস্থায়ী।'

فَعُوْدُوْا اِلَٰى اَرْضِ الْحِجَازِ اَذِلَّةً   وَخَلُّوْا بِلَادَ الرُّوْمِ اَهْلَ الْمَكَارِمِ

'তোমরা অপমাণিতভাবে হেজাযে ফিরিয়া যাও এবং মর্যাদাবান রোমবাসীদের রাজ্যসমূহ পরিত্যাগ কর।' কবিতার শেষাংশে ছিল—

مَلَكْنَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ جَارَ قَوِيُّكُمْ   وَعَامَلْتُمْ بِالْمُنْكَرَاتِ الْعَظَآئِمِ

'যখন তোমাদের মধ্যকার সবলগণ দুর্বলদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে এবং তোমরা জঘন্য পাপসমূহে লিপ্ত হইয়াছ, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিব।'

قُضَاتُكُمْ بَاعُوْا جِهَارًا قَضَائَهُمْ   كَبَيْعِ ابْنِ يَعْقُوْبَ بِبَخْسٍ دَرَاهِمِ

www.nagorikpathagar.org

'তোমাদের বিচারকগণ এমন প্রকাশ্যে তাহাদের বিচার ঘুষের টাকায় বিক্রয় করিতেছে; যেমন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ সামান্য কয়েক দেরহামে বিক্রীত হইয়াছিলেন।'

سَاَفْتَحُ اَرْضَ الشَّرْقِ طُرًّا وَّمَغْرِبًا   وَاَنْشُرُ دِيْنَ الصَّلْبِ نَشْرَ الْعَمَائِمِ

'অত্যল্পকাল মধ্যেই আমি পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত দেশ জয় করিব এবং সর্বত্র খৃষ্টধর্ম প্রচারিত করিব।'

পত্রের সারাংশ পাঠকগণ পাঠ করিলেন। এক্ষণে ইহার উত্তর শ্রবণ করুন! খলীফার আদেশে তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম ও সাহিত্যিক কেফাল মরোজী ইহার উত্তর লিপিবদ্ধ করিলেন। মূল পত্রটি যেমন ভাষার দিক দিয়া প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল, উত্তরও তেমনি অনুপম হইয়াছিল।

কেফাল মরোজী পত্রের প্রত্যেক কথারই যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন। আমরা যেমন এস্থলে সম্পূর্ণ পত্র উদ্ধৃত করি নাই, তদ্রূপ উত্তরেরও কেবল আবশ্যকীয় অংশ লিপিবদ্ধ করিব। উত্তরদাতা বলেনঃ

وَقَالَ مَسِيْحِيٌّ وَلَيْسَ كَذَاكُمُ   اَخُوْ قِسْوَةٍ لَاَيَحْتَذِىْ فِعْلَ رَاحِمِ

'পত্র লেখক নিজকে মসীহী (খৃষ্টান) বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। কঠিন হৃদয় ব্যক্তিকে কখনও দয়াবানের অনুগামী বলা চলে না।'

অর্থাৎ, হযরত ঈসা মসীহ্ অত্যন্ত দয়াশীল ও বিনয়ী ছিলেন, পত্র লেখকের মত বৃথা আস্ফালনকারী দাম্ভিক ব্যক্তি মসীহী হওয়ার দাবী করিতে পারে না।

لَيْسَ مَسِيْحِيًّا جَهُوْلاً مُثَلِّثًا   يَقُوْلُ لِعِيْسٰى جَلَّ عَنْ وَصْفِ اٰدَمِ

'ত্রিত্ববাদী জাহেল কখনও মসীহী হইতে পারে না; যে হযরত ঈসাকে মানব জগতের ঊর্ধ্বে—খোদার আসনে সমাসীন বলিয়া মনে করে।'

এইভাবে খৃষ্টান পত্র লেখকের প্রত্যেক কথার দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পত্র লেখক নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতে মুসলমানদের প্রতি যে বড় দোষারোপ আনয়ন করিয়াছিল, উহার উত্তরই যুক্তিপূর্ণ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় হইয়াছিল। দোষারোপ এই ছিল যে, মুসলমান বিচারকগণ ঘুষখোর ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছে, মুসলমানদের ধর্মাচরণ শিথিল হইয়া পাপ পথে চালিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের পরাজয় অনিবার্য। লেখক কিন্তু বুঝিতেও পারে নাই যে, একথা দ্বারাই প্রকারান্তরে ইসলাম ধর্মের সত্যতা স্বীকার করা হইতেছে। ইহার উত্তরে কেফাল মরোজী লিখিতেছেন—

وَقُلْتُمْ مَّلَكْنَاكُمْ بِجَوْرِ قُضَاتِكُمْ   وَبَيْعِهِمْ اَحْكَامَهُمْ بِالدَّرَاهِمِ

وَفِىْ ذَاكَ اِقْرَارٌ بِصِحَّةِ دِيْنِنَا   وَاَنَّا ظَلَمْنَا فَاُبْتُلِيْنَا بِظَالِمِ

অর্থাৎ, 'তোমরা লিখিয়াছ যে, আমাদের কাযীগণ অত্যাচার ও ঘুষখোর হওয়ায় তোমরা আমাদের উপর আধিপত্য পাইয়াছ। একথার অর্থ এই হয় যে, আমরা যতকাল সত্য পথে ছিলাম ততকাল তোমরা পদানত ছিলে। ইহাতে প্রকারান্তরে একথাই স্বীকার করা হইল যে, আমাদের ধর্ম সত্য। আমরা সত্য ধর্ম আংশিক ত্যাগ করিয়া বিপথগামী হওয়াতেই তোমাদের মত অত্যাচারীর কবলে পতিত হইয়াছি।'

www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত পত্র এবং উহার উত্তর দ্বারা মোটামুটিভাবে একথা বুঝা গেল যে, বিপক্ষ সপক্ষ নির্বিশেষে সকলেই ইহা অবগত ছিল যে, ইসলামের উন্নতি ও প্রচার কেবল উহার সৌন্দর্য এবং মুসলমানদের নিয়তের বিশুদ্ধতার উপরেই ন্যস্ত ছিল। রোমের বাদশাহও একথাই লিখিয়াছেন, খলীফার পক্ষ হইতে একথা স্বীকার করিয়াই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

ইসলাম প্রচারের পরিপন্থী বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে উপরোক্ত দুইটি ঘটনা বিবৃত হইল। এক্ষণে আমরা মূল বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

কায়রোওয়ান শহরের পত্তন ও
হাজার হাজার লোকের ইসলাম গ্রহণঃ

কায়রোওয়ান পশ্চিম আফ্রিকার একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইহাতে বহু কাল আফ্রিকার রাজধানী থাকার কারণে ইহার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৫০ হিজরী সনে সাহাবাদের পবিত্র হাতে এই শহরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার ভিত্তি স্থাপনের গোড়ায় যে অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল এবং যাহা দেখিয়া হাজার হাজার বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

স্বনামধন্য খলীফা হযরত মুআবিয়া স্বীয় রাজত্ব কালে ওকবা ইবনে নাফে' (রাঃ) নামক ব্যক্তিকে আফ্রিকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওকবা (রাঃ) পশ্চিম আফ্রিকার বহু স্থান অধিকারে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বার্বার সম্প্রদায়ের অনেক গোত্র ইসলাম গ্রহণে ওকবার সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোন স্বতন্ত্র ছাউনি না থাকায় যখনই শাসনকর্তা কোন স্থান জয় করত মিসরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, সঙ্গেসঙ্গেই তথাকার বিধর্মী অধিবাসীরা এবং তৎসঙ্গে নবদীক্ষিত বার্বারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিত এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিত। রাজপ্রতিনিধি ওকবা এই অবস্থা দৃষ্টে পশ্চিম আফ্রিকায় একটি ছাউনি নির্মাণকরত পশ্চিম আফ্রিকাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করিলেন।

হযরত ওকবা (রাঃ) ছাউনির জন্য যেই স্থানটি নির্বাচিত করিলেন, তাহা ঘন বৃক্ষরাজিপূর্ণ বিজন অরণ্য এবং বহুবিধ হিংস্র জন্তু ও বিষধর সর্পের আবাসস্থল ছিল। এ রকম ভয়াবহ অরণ্যে মানুষের বসবাস তো দূরের কথা ইহা অতিক্রম করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সমস্ত কাজই আল্লাহ্‌র রহমতের ও সাহায্যের উপর ন্যস্ত ছিল, বাহ্যিক উপকরণের উপরে নহে।

মুসলমান জনসাধারণ রাজপ্রতিনিধি ওকবা (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, 'আপনি এমন এক বিজন বনে সৈন্যবাস নির্মাণ করিতে চাহিতেছেন, যেখানে মানুষের বসবাস কিছুতেই সম্ভব নহে।'

হযরত ওকবা (রাঃ) সেখানে সৈন্যবাস নির্মাণের উপকারিতা ব্যক্তকরত কহিলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই আমাদের সৎকাজে সাহায্য করিবেন। হিংস্র জন্তুর ভয়ে পরিকল্পনা ত্যাগের কোনই আবশ্যক নাই।'

সৈন্যদলে আঠার জন সাহাবী ছিলেন। ওকবা (রাঃ) সাহাবিগণকে সঙ্গে লইয়া বনপ্রান্তে যাইয়া খাড়া হইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিলেনঃ

اَيَّتُهَا الْحَشَرَاتُ وَالسِّبَاعُ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعُوْا فَاِنَّا نَازِلُوْنَ فَاِنْ وَجَدْنَا بَعْدُ قَتَلْنَاهُ ○

www.nagorikpathagar.org

'হে হিংস্র জন্তু এবং বিষাক্ত জীবগণ! আমরা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আসহাব। আমরা এই জায়গায় বাসস্থান প্রস্তুত করিতে চাহি, সুতরাং তোমরা সত্বর এস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাও। সাবধান, অতঃপর তোমাদিগকে এখানে দেখিতে পাইলে মারিয়া ফেলিব।'

দেশের জনসাধারণ বন্য জীবের প্রতি এই ঘোষণাবাণী শুনিতে একত্রিত হইল। তাহারা বুঝিতেই পারিল না যে, ইতর প্রাণীর উপর মানুষের কর্তৃত্ব কিরূপে চলিতে পারে? বন্য জীবেরা এই আদেশের মর্ম কি বুঝিবে? আর বুঝিলেই বা কেন এরূপ সতর্কবাণীতে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিবে? কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, দেখিতে দেখিতে জন্তু-জগতে যেন পলায়নের সাড়া পড়িয়া গেল। তাহারা দলে দলে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি নিজেদের শাবকদিগকে লইয়া যাত্রা করিল। সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি বিষাক্ত জীবগণ বাচ্চাগুলিকে পিঠের উপর চাপাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দলের পর দল বন্য জীব চলিতেছে, অদূরে দাঁড়াইয়া দর্শকগণ তামাশা দেখিতেছে। আর সত্য সত্যই কোন অজানিত শক্তির প্রভাবে হিংস্র জন্তুরা নিজেদের চিরাচরিত হিংসাবৃত্তি বর্জন করিয়াছে। মানুষও হিংস্র জন্তুর প্রতি ভয় ও বিজাতীয় হিংসা ভুলিয়া গিয়াছে। কি চমৎকার দৃশ্য! ইহা অসম্ভব এবং অপ্রাকৃতিক হইলেও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। যুগের পর যুগ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুসলমানদের এই অভাবনীয় অলৌকিক এবং সত্য সনাতন ইসলাম ধর্মের খোদায়ীশক্তির অপূর্ব কাহিনী এখনও ইতিহাসের পাতায় সোনালী অক্ষরে জ্বলজ্বল করিতেছে।

বার্বার জাতি যাহারা এই জঙ্গলের ভয়াবহতা ভালভাবে জানিত, তাহারা এই লোকাতীত ঘটনা দেখার পর আর ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে কি সন্দেহ করিতে পারে? এই ঘটনা চাক্ষুষকরত সহস্র সহস্র বার্বারী তৎক্ষণাৎ স্বেচ্ছায় সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া পরকালের পথ সুগম করিল।

সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত অলৌকিক ও ঐতিহাসিক ঘটনায় কেবল এ রকম লোকেরাই অবিশ্বাস করিতে পারে, যাহারা ইতিহাসের মূলনীতি সম্বন্ধে অবগত নহে, অথবা যাহাদের মনে ইতিহাসের মর্যাদা নাই। জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানদের ইতিহাস-সৌধ যেরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ আর জগতের কোন ইতিহাস আছে কি? দুনিয়ার জ্ঞান-সমুদ্র সেচন করুন; দর্শন বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যার সমালোচনা করুন; কিন্তু কোথাও একথার সন্ধান পাইবেন না যে, ওকবা (রাঃ) কর্তৃক উচ্চারিত বাক্যগুলির মধ্যে এমন কি শক্তি থাকিতে পারে, যাহাতে বন্য জন্তুগণ স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একথার তথ্য কেবল তাঁহারাই বলিতে পারেন, যাঁহারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার পারস্পরিক সম্পর্ক, খালেক ও মখ্‌লুকের 'তাআল্লুক' বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহাদের একথা জানা আছে যে, সমস্ত সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ্‌র কুদরত ও অসীম ক্ষমতার অধীন, আর যাঁহারা একথাও অবগত আছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিকে সর্বদিক হইতে কর্তন করত কেবল খোদা তা'আলার দিকে নিবদ্ধ রাখার কারণে তাঁহাদের দো'আ ও আরাধনা আল্লাহ্‌র আদেশে সত্বর পূর্ণ হইত।

ইসলামের এই অপরূপ ক্ষমতা এবং মুসলমানদের এমন অভাবনীয় ধর্মবল ও চরিত্র মাধুর্য অবলোকন করার পরও কি কেহ ইসলাম প্রচারের সঙ্গে তরবারির সম্পর্ক অন্বেষণ করিতে প্রস্তুত হইবেন? আমরা জিজ্ঞাসা করি, জঙ্গলের অসংখ্য ইতর প্রাণীর উপরও কি তরবারির আতঙ্ক কার্যকরী হইয়াছিল? আর যে সহস্র সহস্র লোক এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও কি তরবারির ভয়ে মুসলমান হইয়াছিল?

www.nagorikpathagar.org

'মা-উল ফারাস' বা অশ্ব-নির্ঝরিণী ঃ

হযরত ওকবা (রাঃ)-এর আর একটি কারামত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। একবার তিনি সৈন্যসহ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে একদিন এমন এক স্থানে অবতরণ করিলেন, যেখানে পানির নাম নিশানাও ছিল না। পিপাসায় মুসলিম সেনাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল ; সকলে সেনানায়ক ওকবা (রাঃ)-এর নিকট সমবেত হইয়া ফরিয়াদ আরম্ভ করিল। ওকবা বুঝিলেন, যিনি অকূল পাথারে কূল দেন, যিনি বনে-জঙ্গলে, গহনে-কান্তারে, জলে-স্থলে সর্বত্র নিঃসহায়ের সহায় হন, তাঁহার দরবারে আরয করা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। হযরত ওকবা কায়মনোবাক্যে রহ্‌মান রহীমের নিকট মুনাজাত করিতে লাগিলেন। মুনাজাত সমাপ্ত হইতে না হইতে নির্ঝরিণী ফুটিয়া পানি বাহির হইল। পানির খবর শুনামাত্র চতুর্দিক হইতে সৈন্যদল ছুটিয়া আসিল। নিজেরাও প্রাণ ভরিয়া জলপান করিল, চতুষ্পদ জন্তুদিগকেও পান করাইল। এই ঝরণা ঘোড়ার পায়ের নিম্ন হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'মা-উল ফারাস' বা অশ্ব-নির্ঝরিণী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

অশ্ব-পদাঘাতে মৃত্তিকাতল হইতে ঝর্ণা বহির্গত হওয়া বাহ্য দৃষ্টিতে একটা সাধারণ ঘটনার মত দেখাইলেও যাঁহারা ধর্মের মাহাত্ম্য এবং ধার্মিকের খোদাদত্ত লোকাতীত শক্তির তাৎপর্য বুঝেন, তাঁহাদের নিকট নিশ্চয়ই ইহা ইসলাম ধর্ম ও সাহাবায়ে কেরামের মস্তবড় কারামতের মধ্যে গণ্য।

'ইয়াওমুল আবাকের' বা গো-দিবস ঃ

মুসলমানগণের প্রতি যে সমস্ত দৈব সাহায্য প্রকাশ লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে 'ইয়াওমুল আবাকের' অন্যতম। এই ঘটনা পাঠে কেহই একথায় আর সন্দেহ বাক্য আনয়ন করিতে পারিবে না যে, পদে পদে ইসলামের সেবকবৃন্দের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য দেখা দিত।

কাদসিয়া যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ একস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এই যুদ্ধের পূর্বে সেনাপতি সা'দ (রাঃ) আসেম ইবনে আমরকে মীসান নামক স্থান জয় করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আসেম গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে তথাকার অধিবাসীরা দুর্গদ্বার বন্ধকরত ভিতরে নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে মুসলমানগণ রসদের অভাবে নিতান্ত দুরবস্থায় নিপতিত হইল। দুগ্ধ এবং মাংস পাওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। এরূপাবস্থায় বিদেশাগত সৈন্যদলের পক্ষে যে রকম কঠিন সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাহা অনুমান করা মোটেই দুষ্কর নহে।

আসেম ইবনে আমর (রাঃ) বহু চেষ্টায়ও খাদ্যোপযোগী কোন প্রকার চতুষ্পদ জন্তুর সন্ধান করিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে একদিন এক ব্যক্তিকে জঙ্গলের নিকট একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসেম (রাঃ) তাহাকে রাখাল সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে, তুমি কি গৃহপালিত পশুর সন্ধান বলিতে পার ?' লোকটি সত্যই রাখাল ছিল। সেই জনপদের সমস্ত পশু জঙ্গলে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহাকে উহাদের রাখাল নিযুক্ত করা হইয়াছিল। লোকটি সত্য গোপন পূর্বক কহিল, 'আমি কোন পশুর খবরই রাখি না।' একথার সঙ্গেসঙ্গেই ঝোপের ভিতর হইতে পরিষ্কার আরবী ভাষায় কেহ বলিতে লাগিল ঃ

كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ هَانَحْنُ ○

'আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যাকথা বলিতেছে, আমরা এখানে আছি।' —কামেল

www.nagorikpathagar.org

এই শব্দ শুনিয়া হযরত আসেম (রাঃ) জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন কি! ঝোপের ভিতরে ভিতরে গরু ও ছাগলের পাল লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। একটি বলদ মানুষের ভাষায় চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'আমরা এখানে আছি।'

তখন সমস্ত পশু বাহির করিয়া আনা হইল। ফলে দুধ ও গোশ্‌তের অভাবে মুসলমানদের যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল।

ইতর প্রাণীর মানুষের ভাষায় কথা বলা, সেচ্ছায় নিজেদের জীবনোৎসর্গ করত মানুষের উদর পূর্তির ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই অভাবনীয় ও চমকপ্রদ ঘটনা। ইরাকের দুর্দান্ত মুসলিম শাসনকর্তা হাজ্জাজের দরবারে এই ঘটনার আলোচনা হইলে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী কতিপয় লোককে আনয়ন-পূর্বক ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তাহারা সকলেই এক বাক্যে সাক্ষ্য দিল যে, আমরা নিজেরাই পশুর কথা শুনিয়াছি এবং স্বচক্ষে জীবগুলিকে দেখিয়াছি।

হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকেরা এই আশ্চর্য ঘটনা দৃষ্টে কি ধারণা করিয়াছিল? তাহারা কি ভাবিয়াছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্য করিতেছেন?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, লোকদের ধারণা এ রকমই ছিল।'

হাজ্জাজ পুনরায় বলিলেন, 'লোকদের এই ধারণা তো তবেই হইতে পারিত, যদি সে সময়কার সমস্ত মুসলমান পরহেযগার ও খোদাভক্ত হইত।'

তাহারা কহিল, 'আমরা তো সেই মুসলমানদের আন্তরিক অবস্থার খবর বলিতে পারি না, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে এমন বোধ হইত যে, তাঁহাদের কেহই পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দুনিয়া হইতে পূর্ণরূপে অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহই কাপুরুষ ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী ছিলেন না।'

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে একথার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, মুসলমানদের উন্নতি ও জয়লাভ উল্লিখিত গুণাবলীর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, এই সমস্ত নৈতিক গুণাবলীর কল্যাণে তাঁহারা আকাশ চুম্বি দুর্গচূড়ার সঙ্গেসঙ্গে মানুষের অন্তর রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেন।

উল্লিখিত অলৌকিক ব্যাপার হইতে আমরা এই শিক্ষাও পাইতে পারি যে, যখন মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশের অনুগামী হয়, যখন এক আল্লাহ্ ব্যতীত তাহা-দের আর কোন মকসূদ না থাকে, তখন দুনিয়ার সমস্ত জিনিসই তাহাদের তাবেদার হইয়া যায়।

এই মোবারক ও স্মরণীয় পবিত্র দিন 'ইয়াওমুল আবাকের' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনা যে 'গায়েবী মদদের নিশানা, একথায় সন্দেহ করার উপায় নাই। অবশ্য কেহ হয়তো মূল ঘটনা সম্পর্কে তর্ক আনয়ন করিতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি তাবারী এবং ইব্‌নুল আসির প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ নিজেদের পুস্তকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক হিসাবে তাবারীর মর্যাদা কত দূর, তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন। এরূপ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার উপর কিরূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে? ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হওয়া ছাড়া মুখে মুখেও এই ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একথার তত্ত্ব লইতে চাহিলে অনেকেই ইহার সাক্ষ্য দিয়াছিল। বস্তুতঃ যাহারা আম্বিয়াগণের (আঃ) মো'জেযার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদের নিকট সাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত কারামত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। এ রকম ঘটনার উল্লেখ সহীহ্ বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফেও হইয়াছে। একটি হাদীস শুনুন—

www.nagorikpathagar.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّسُوْقُ بَقَرَةً اِذْاَعْيِى فَرَكِبَهَا فَقَالَتْ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا فَقَالَ النَّاسُ اَبَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَاِنِّىْ اٰمَنْ بِهٖ — الخ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, (কোন যমানায়) এক ব্যক্তি একটি গরু লইয়া কোথাও যাইতেছিল, পথে তাহার ক্লান্তি বোধ হওয়ায় সে গরুটির উপর চড়িয়া বসিল। গরু বলিতে লাগিল, 'ওহে, আমরা এই কাজের জন্য (অর্থাৎ, আরোহণের জন্য) সৃজিত হই নাই।' হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট এই আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনিয়া শ্রোতাগণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হুযূর! গরুও কি কথা বলিতে পারে?' তখন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, 'আমি তো একথার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছি।'

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি প্রামাণিক হাদীসের কিতাবে এই ঘটনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘটনাটি ইয়াওমুল আবাকেরের ঘটনার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এ রকম আরও বহু ঘটনার উল্লেখ হাদীসের কিতাবে আছে।

উস্তুনে হান্নানা ঃ

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অভ্যাস ছিল, খোত্বার সময় মসজিদে অবস্থিত একটি শুষ্ক খর্জুর স্তম্ভে হেলান দিয়া খাড়া হইতেন। মিম্বর তৈয়ার হওয়ার পর তিনি স্তম্ভ পরিত্যাগকরত মিম্বরের উপর উপবেশন করিয়া খোত্বা দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন স্তম্ভটি সশব্দে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। এমন কি তাহা ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। রাসূলে মকবূল (দঃ) স্তম্ভের ক্রন্দন শুনিয়া মিম্বর হইতে অবতরণপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রন্দনরত শিশু যেমন মায়ের কোলে উঠিয়া হিচকিসহ ক্রন্দন সমাপ্ত করে, তেমনি স্তম্ভটি হিচকি লইতে লইতে কান্না শেষ করিল।

ভাবিবার বিষয় নির্জীব কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্র পবিত্র সংস্পর্শে কেবল যে প্রাণের নিদর্শনই প্রকাশ পাইয়াছিল এমন নহে, প্রেমিক যেমন প্রিয়জনের অদর্শনে বিরহে কাতর হইয়া পড়ে, স্তম্ভটিও হযরত (দঃ)-এর বিরহে তদ্রূপ সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ্র সংস্পর্শে একটি নগণ্য জড় পদার্থের যদি এ রকম অবস্থা হইতে পারে, তবে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর অবস্থা কত দূর উন্নত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে।

সাহাবাগণ দিবারাত্র হযরত (দঃ)-এর নিকট হাজির থাকিয়া তাঁহার পবিত্র শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার নূরানী ফয়েয দ্বারা উপকৃত হইতেন। সুতরাং তাঁহাদের জন্য ইতর প্রাণী নিজেদের জীবন উৎসর্গ করাতে তেমন কি আশ্চর্যের বিষয় থাকিতে পারে?

খর্জুর স্তম্ভের ক্রন্দন বিষয়ক ঘটনাও পরিষ্কার ভাষায় সহীহ্ হাদীসসমূহে বিবৃত হইয়াছে যে, তাহাতে ঘোরপ্যাচের কোনই অবকাশ নাই। অবশ্য কেহ যদি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতাকে প্রাকৃতিক নিয়মের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধকরত অপ্রাকৃতিক বলিয়া বর্ণিত ঘটনাগুলিতে অবিশ্বাস করিতে চাহে, তবে উহা ভিন্ন কথা। কিন্তু তাহাদিগকেও বলিব যে, আল্লাহ্র ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়া কখনও সমীচীন নহে। আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিকে যাহারা সীমাবদ্ধ মনে করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোরআনে পাকে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

'তাহারা উপযুক্তরূপে আল্লাহ্‌র পরিচয়ই পায় নাই। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুঠার ভিতরে এবং সমস্ত আসমান দক্ষিণ হস্তে লেপ্টান থাকিবে।'

উল্লিখিত খর্জুর স্তম্ভের ঘটনাকে 'উস্‌তুনে হান্নানা'র মো'জেযা বলা হয়। এই মো'জেযাকে মাওলানা রূমী (রঃ) পার্সী কবিতায় চমৎকারভাবে লিখিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য কবিতাগুলি অনুবাদসহ এস্থলে উদ্ধৃত হইল ঃ

استن حنانه از هجر رسول — ناله میزد همچو ارباب عقول

درمیان مجلس وعظ آں حناں — کز وے آگه گشت هم پیر و جواں

'উস্‌তুনে হান্নানা (ক্রন্দনকারী স্তম্ভ) রাসূলের বিরহে ওয়াযের মজলিসে এমন উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়াছিল যে, উপস্থিত বৃদ্ধ-যুবক সকলেই তাহা শুনিতে পাইয়াছিল।'

در تحیر مانده اصحاب رسول — کزچه می نالد ستوں بعرض و طول

'রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আসহাবগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, এই লম্বা চওড়া স্তম্ভটি কেন কাঁদিতেছে!'

گفت پیغمبر چه خواهی اے ستوں — گفت جانم از فراقت گشت خوں

পয়গম্বর (দঃ) বলিলেন, 'ওহে স্তম্ভ! তুমি কি চাও, কেন কাঁদিতেছ?' স্তম্ভ কহিল, 'আপনার বিরহে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে।'

مسندت من بودم از من تاختی — بر سر ممبر تو مسند ساختی

'আমি আপনার হেলান দেওয়ার জায়গা ছিলাম, আপনি এখন আমাকে পরিত্যাগকরত মিম্বরের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছেন।' (ইহাই আমার শোকের কারণ।)

پس رسولش گفت کائے نیکو درخت — اے شده با سر تو همراز بخت

گر همی خواهی ترا نخلے کنند — شرقی و غربی ز تو میوه چنند

یادراں عالم ترا سروے کند — تا تروتازه بمانی تا ابد

'অর্থাৎ, তখন রাসূল (দঃ) স্তম্ভটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কাষ্ঠ খণ্ড! তুমি কি পৃথিবীতে এমন একটি বৃক্ষ হইতে চাও যে, সমগ্র পৃথিবীর লোকেরা তোমার ফল আহরণ করিবে, নাকি তুমি পরকালের চিরস্থায়ী বৃক্ষজীবন লাভ করিতে চাও?'

گفت آں خواهم که دائم شد بقاش — بشنو اے غافل کم از چوبے مباش

'স্তম্ভ কহিল, আমি পরকালের চিরস্থায়ী জীবনই কামনা করি।' অতঃপর মাওলানা রূমী নসীহতস্বরূপ বলেন, 'হে গাফ্‌লতে পতিত মানব, তুচ্ছ কাষ্ঠ খণ্ডও যখন ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর পরকালের অফুরন্ত জীবনকে প্রাধান্য দিল, তখন তোমরা মানুষ হইয়াও কাঠের চেয়ে অধম হইতে যাওয়া কিরূপে শোভনীয় হইতে পারে?'

www.nagorikpathagar.org

মো'জেযা সম্পর্কে সূক্ষ্মতত্ত্বঃ

কেহ হয়তো বলিতে পারে, আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সমস্ত পয়গম্বরের চেয়ে বড় ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মো'জেযার তুলনায় অন্যান্য পয়গম্বরের অনেক বড় বড় মো'জেযা ছিল। যথা, হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করিয়া দেখাইতেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি সাপের আকৃতি ধারণ করিয়াছিল ইত্যাদি। আমরা এস্থলে একথা প্রতীয়মান করিতে প্রয়াস পাইব যে, আমাদের পয়গম্বর যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তাঁহার মো'জেযাও সকল পয়গম্বরের মো'জেযার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই আলোচনা দ্বারা তাৎপর্য অবগত হওয়ায় মুসলমানদের ঈমানও তাজা হইবে, তৎসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বও দিবাকরসম সুপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব (রঃ) স্বরচিত এক কিতাবে এ বিষয়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা উহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি। মাওলানা কাসেম (রঃ) লিখিতেছেন—

হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি অজগর সর্পের আকার ধারণ করিয়াছিল, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দো'আয় মুর্দা জীবন লাভ করিয়াছিল এবং তিনি মাটি দ্বারা পক্ষীর মূর্তি প্রস্তুতকরত তাহাকে জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পৃষ্ঠদেশের সংস্পর্শে অনেক দিনের পুরাতন শুষ্ক খর্জুর স্তম্ভ অপূর্ব জীবন লাভে হযরত (দঃ)-এর বিরহে এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় যে আল্লাহ্র নাম-কালাম পাঠ হইত, তাহা বন্ধ হওয়ার দুঃখে সে উচ্চরবে ক্রন্দন করিয়াছিল। এমন কি সে কাঁদিতে কাঁদিতে ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

ভাবিয়া দেখুন, হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু তাহা সরিসৃপ জীবের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াই প্রাণলাভ করিয়াছিল। হযরত ঈসা (আঃ) যে, পক্ষীর মো'জেযা দেখাইতেন তাহাতেও প্রথমে মাটি দ্বারা পক্ষীর মূর্তি বানান হইত, তৎপরে উহাতে প্রাণ আসিত। প্রাণ এবং জীবাকৃতির মধ্যে অবশ্যই কতকটা নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলিম বাহিনী কর্তৃক হেম্স শহর অবরোধঃ

মুসলমানদের প্রতি খোদা তা'আলার করুণা ও সাহায্য কোন অবস্থা বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; যখন যেইরূপ আবশ্যক হইত তখন সেই রকম সাহায্যই আসিত। ফলে অমুসলমান মহলে ক্রমশঃ এই বিশ্বাস জন্মিত যে, নিশ্চয়ই মুসলমানগণ সত্যপথে আছেন। এস্থলে এই ধরনের আর একটি ঘটনা বিবৃত হইতেছে।

সিরিয়া যুদ্ধে লিপ্ত মুসলিম সেনানায়ক আবু ওবায়দা (রাঃ) দামেশ্কের সন্ধি সমাপ্ত করার পর শাম -দেশের অন্যতম শহর হেম্স অবরোধ করিয়াছেন। হেমস্‌বাসিগণ রোম সম্রাট কায়সরের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার আশায় ছিল, কিন্তু কার্যতঃ তাহাও নিষ্ফল হইল। তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পর স্থির করিল যে, এখন যুদ্ধ করার কোনই আবশ্যক নাই। শীতকাল আগতপ্রায়। শাম-দেশের দারুণ শীত আরব যোদ্ধগণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। একে তো তাহারা শীত ভোগে অভ্যস্ত নহে; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের নিকট শীত যাপনের উপযোগী বস্ত্রাদিরও নিতান্ত অভাব। সুতরাং শীতের প্রকোপ দেখা দিতেই তাহাদের হাত-পা ফাটিতে আরম্ভ হইবে। তখন হয় তাহাদিগকে আরবে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আর না হয় নিউমোনিয়া ইত্যাদির আক্রমণে এখানেই প্রাণ হারাইতে হইবে।

হেম্সবাসীরা নিশ্চিত মনে দিন যাপন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শীতরূপ অপরাজেয় সৈন্য সর্বত্র নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু হেম্সের অধিবাসীরা যাহা ভাবিয়াছিল, কাজে

www.nagorikpathagar.org

হইল উহার বিপরীত। হেম্‌সবাসীদের পা শীত নিবারণোপযোগী জুতা এবং পশমী মোজার ভিতরে থাকিয়াও ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের অনেকের অঙ্গুলি খসিয়া পড়িল। আরব সৈন্যগণ কিন্তু আরবের সাধারণ সেণ্ডেল পায়ে মোজাহীন অবস্থায় আরামে রহিলেন; তাহাদের কাহারও পায়ের সামান্য ক্ষতিও হইল না।

এখন শীতকাল কাটিয়া বসন্ত দেখা দিয়াছে। হেম্‌সের বাসিন্দারা দেখিল, এখনও মুসলমানগণ পূর্ণোদ্যমে অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যকার এক বৃদ্ধ ব্যক্তি কহিল, 'হে হেম্‌সবাসীরা, তোমরা কিছুতেই মুসলমানদের সঙ্গে আঁটিতে পারিবে না। আমার মতে এখন তাহাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলাই উত্তম।' কেহই বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করিল না। আর এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একদিন তাহাদিগকে কহিতে লাগিল, 'তোমরা শীতকালের প্রতীক্ষায় ছিলে তাহাও কাটিয়া গেল, এখন আর কোন্ ভরসায় রহিয়াছ? যদি তোমরা নিজেদের মঙ্গল চাও, তবে শীঘ্রই তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণপূর্বক স্বদেশকে রক্ষা কর। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মুসলমানদের প্রতি যে সর্ববিধ সাহায্য আসিতেছে, একথায় আর কোনই সন্দেহ নাই।' দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না।

ইহার পর একদিন মুসলমানগণ দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং মিলিত কণ্ঠে তকবীর ধ্বনি করিলেন; হেম্‌স শহরে তকবীর ধ্বনির সঙ্গেসঙ্গে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। অধিবাসীরা ভীত সন্ত্রস্তভাবে পরামর্শদাতা বৃদ্ধগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আমরা আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের রক্ষার উপায় বলিয়া দিন।' বৃদ্ধগণ বিরক্তি সহকারে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পুনরায় যখন তকবীর ধ্বনি হইল, তখন আবার ভূমিকম্প দেখা দিল। এবার সত্যসত্যই অট্টালিকাসমূহ ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইল। দেশবাসী এক সঙ্গে উল্লিখিত প্রবীণ লোকদের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে পরামর্শ চাহিল। এইবার তাহারা বলিল, 'যদি রক্ষা পাইতে চাও, তবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানদের সাথে সন্ধি কর। ইহা ছাড়া মুক্তির আর কোনই উপায় নাই।'

অনন্তর তাহারা সকলে দুর্গ প্রাচীরের উপরে উঠিয়া মুসলিম দলপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া সন্ধির প্রস্তাব জানাইল। মুসলমানগণ বুঝিতেই পারিলেন না যে, বিপক্ষ কি কারণে সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছে। মুসলমানদের পক্ষ হইতে সন্ধি-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কোনই কারণ ছিল না। তাঁহারা তো সর্বদাই শান্তি কামনা করিতেন। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাঁহাদিগকে রক্তপাতে লিপ্ত হইতে হইত। তাঁহারা সানন্দে বিপক্ষের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষের বাক্যালাপের পর সন্ধিপত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল।

উল্লিখিত ঘটনা আলোচনায় একথা বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, বিধর্মীদের মধ্যে যে সমস্ত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক ছিল, তাহারা সকলেই একথার প্রতি আস্থাবান হইয়া পড়িয়াছিল যে, মুসলমানদের প্রতি পদে পদে গায়েবী মদদ হইয়া থাকে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিশ্বাসের বীজ স্থাপিত হইয়াছিল। কালে সেই বীজই অঙ্কুরিত, বর্ধিত, পুষ্পিত, ফলিত হইয়াছিল। ইহা যে ইসলাম প্রচারের একটা শ্রেষ্ঠ উপকরণ তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

—■ সমাপ্ত ■—

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার : ঢাকা